ফিক্‌হী বিশ্বকোষ-১

ফিক্‌হে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

ডঃ মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী

ফিক্‌হী বিশ্বকোষ-১

ফিক্‌হে হযরত আবু বকর

(রাদিয়াল্লাহু আনহু)

ডঃ মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী

ভাষান্তর ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৬১

১ম প্রকাশ
জিলহাজ্জ ১৪২১
চৈত্র ১৪০৭
মার্চ ২০০১

বিনিময় ঃ ১৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

FIQUEHE ABU BAKAR (R) by Doct. Mohammad Rawas Quala'zih. Translated by Mohammad Khalilur Rahaman Momin. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 14 0.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত রাসূলে আকবুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন ঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

আল্লাহ যার

কল্যাণ চান তাকে

দীনি ইল্‌মের গভীর জ্ঞান দান করেন।

—বুখারী, মুসলিম।

লেখকের অভিব্যক্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ـ

[১] আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি মক্কায় ১৩ বছর ধরে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং তাঁর ওপর আল কুরআন অবতীর্ণের ধারাও অব্যাহত ছিলো। যদি আমরা আল কুরআনে সেসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি যা মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছিলো তাহলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই সেগুলোর সম্পর্ক ছিলো আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, আত্মার পরিশুদ্ধি, রূহের উন্নতি এবং এ ধরনের বিষয়ের সাথে। যেমন—সত্যের ওপর অটল থাকা, সত্য পথে থাকার ফলে বাতিলের নির্যাতন ও যুল্‌মে সবর করা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالْعَصْرِ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

"কালের শপথ ! নিঃসন্দেহে সকল মানুষ ধ্বংসের মুখোমুখী, তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে সৎকাজ করেছে এবং পরস্পর হকের উপদেশ দিয়েছে এবং সৎপথে অটল অনড় থাকার ব্যাপারে একে অন্যকে ধৈর্য্যের পরামর্শ দিয়েছে।"–(সূরা আল আসর ঃ ১-৩)

অতপর তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। যেন সেখানে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যার সাহায্যে ইসলামী আকীদাকে হিফাযত করা যাবে এবং শরঈ বিধান কার্যত প্রয়োগ হবে। মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত করলেন। ঐ সমস্ত বিধান অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলো যা মানুষের পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন—একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে কিরূপ সম্পর্ক রাখবে, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে, পররাষ্ট্র নীতি কি হবে ইত্যাদি।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয় বিধানগুলো কুরআনী আয়াতের অবয়বে অবতীর্ণ হতো, তিনি আল্লাহর ইচ্ছেনুযায়ী সেসব আয়াতের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ভাষ্য প্রদান করতেন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাতেন।

[২] এদিকে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন সে সমস্ত আয়াত ও ভাষ্য স্মৃতিতে গেঁথে নিতেন। এ কাজে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

[২.১] আল কুরআন এবং যাঁর ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো তাঁর ভাষায় (অর্থাৎ আরবী ভাষায়) তাঁরা পারদর্শি ছিলেন। সেই ভাষার ব্যকরণ, উচ্চারণ, অর্থ, তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

[২.২] দ্রুত কোনো বিষয় অনুধাবন করার শক্তি প্রকৃতিই তাদেরকে দিয়ে রেখেছিলো। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিথ্যে চাকচিক্য তাদের এ গুণটির কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি। কম বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে কোনো মানুষ তাদের কাতারে গিয়ে শামিল হতে পারতো না। তাদের পারস্পরিক মেলামেশার বন্ধন ছিলো অকৃত্রিম ও অত্যন্ত সুদৃঢ়। ফলে তাদের মেধা ও মনন পূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছিলো।

[২.৩] দীনের সঠিক বুঝ ও পরিচয়ের জন্য তাদের অন্তরে সত্যের স্পন্দন বিদ্যমান ছিলো।

[২.৪] দীনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে তাদের অনুপম নিষ্ঠা বা ইখলাস।

[২.৫] হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য লাভ করার কারণে তিনি যে কথাটি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই তারা সেই কথাটিকে কণ্ঠস্থ এবং হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এমন কি তার চোখ ও ভ্রূ নড়াচড়ার তাৎপর্য পর্যন্ত তারা সেইভাবে বুঝতে পারতেন, যেভাবে মুখ নিঃসৃত বাক্য বুঝে থাকতেন।

[২.৬] নবুওয়তী নূরের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি। এ উপস্থিতি আত্মার এমন এক অবস্থার নাম যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু তা প্রকাশের জন্য যে আলংকারিক শব্দ ব্যবহার করা হয় তার প্রভাব হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়। যা শুধু অনুভব করা যায় কিন্তু প্রকাশ করা যায় না।

[২.৭] আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধি-বিধান, নিয়ম-পদ্ধতি মূলনীতি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও সুন্নাত আমলী জেন্দেগীতে প্রয়োগ, ইল্‌মকে শুধু উজ্জ্বল করে না বরং তাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয় এবং সেজন্য নতুন দিগন্তের অনুসন্ধান করে। অনেক সময় অর্জিত জ্ঞান বিস্তারিত ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তখন তা অনুধাবনের জন্য স্বয়ং রাসূলের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে।

৩. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি থেকেও সাহাবায়ে কিরাম দীন সম্পর্কে সহযোগিতা পেয়েছেন। যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যবহারিক রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁরা দেখেই বুঝতে পারতেন, এ আয়াতের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা এরূপ। যেসব পদ্ধতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দীন বুঝিয়েছেন তার কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

[৩.১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন তখন থেমে থেমে এবং ধীরে ধীরে বলতেন। যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা গুণতে চাইতো তবে তা সে গুণতে পারতো। বিরতি দিয়ে দিয়ে বক্তব্য রাখায় শ্রোতাগণ বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে একজন মধ্যম মানের মেধার অধিকারী কিংবা তারচেয়ে কম মেধার অধিকারী ব্যক্তির পক্ষেও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়ে যায়।

[৩.২] রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কোনো কথাকে শ্রোতাদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে চাইতেন তাহলে তা একাধিকবার বলতেন। যেমন যখন কুরআন মজীদের এ আয়াত ... وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ [আর তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী কাফিরদের মুকাবেলার জন্য ঘোড়া ও উপকরণ প্রস্তুত রাখ।] অবতীর্ণ হয় তখন তিনি

বললেন—"জেনে রেখো, 'কুওয়ত' শব্দের তাৎপর্য তীর চালনা, 'কুওয়ত' শব্দের তাৎপর্য তীর চালনা, 'কুওয়ত' শব্দের তাৎপর্য তীর চালনা।" তদ্রূপ যখন তিনি সাহাবাদের নিকট কবীরাহ্ গুনাহ্‌র বর্ণনা প্রসঙ্গে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়ার কথা উল্লেখ করতেন তখন শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল করাতে গিয়ে বারবার বলতেন—জেনে রেখো মিথ্যে ভাষণ ও মিথ্যে সাক্ষ্য, মিথ্যে ভাষণ ও মিথ্যে সাক্ষ্য।" এ ধরনের কথা শোনে সাহাবা কিরাম কম্পিত হয়ে যেতেন। অনেকে মনে মনে এমনও বলতেন—'আহা ! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।

[৩.৩] যদি সাহাবা কিরামের কাছে এমন কোনো বিষয় পেশ করতেন যা অনুধাবন করতে তাদের কষ্ট হবে বলে মনে করতেন তখন বোধগম্য কোনো জিনিসের উপমা দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। যেমন—একবার পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে বসেছিলেন, তখন বললেন—"তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে দেখবে যেভাবে আজ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো।"

[৩.৪] অনেক সময় তিনি রেখাচিত্রের মাধ্যমেও বর্ণনাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। যেমন —'একবার তিনি বালুর ওপর একটি সরলরেখা অংকন করলেন এবং বললেন—এটিই আল্লাহ্‌র রাস্তা।'

তারপর সেই সরল রেখাকে কেন্দ্র করে আরো কিছু আঁকাবাঁকা রেখা অংকন করে বললেন —'এগুলো শয়তানের রাস্তা।' অতপর তিনি আল কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। .... اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ [এ আমার সরল পথ, এ পথে চলো, অন্য কোনো পথে চলো না, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।]

এ থেকে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হচ্ছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে কলমে শেখানো ছাত্র।

৪. উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা খুব সহজেই বুঝা যায় যে, পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্য কেন সাহাবা কিরামকে আদর্শ করা হয়েছে। তাদের পদাংক অনুসরণকারীদের জন্য কেন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ ..... ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনদেরকে উত্তম মানুষ (خير الناس) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ خَيْرُ ..... اَلْقَرْنِ قَرْنِىْ "আমার সময়ের লোক অর্থাৎ সাহাবাগণ উত্তম, তারপর আগমনকারী ব্যক্তিগণ, তারপর আগমনকারী ব্যক্তিগণ উত্তম।"

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে রিওয়ায়েত করেছেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা উত্তম লোক তারাইতো পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তাঁদের প্রদর্শিত রাস্তাই সঠিক রাস্তা। কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নেই, তাঁদের রাস্তা ছেড়ে অন্য কারো রাস্তা অবলম্বন করা। সাহাবা কিরাম (রা) নিজেরাও তাদের ব্যাপারে একথাটিকে সঠিক মনে করতেন। যেমন—হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন —যে ব্যক্তি কারো অনুসরণ করতে চায় তার উচিত আল্লাহ্‌র রাসূলের সাহাবীদেরকে অনুসরণ

করা। কেননা সমস্ত উম্মতের মধ্যে তাঁদের অন্তর অধিকতর পবিত্র, তাদের ইল্‌ম সবচেয়ে গভীর, তাদের মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা সবচেয়ে কম এবং নেকী সবচেয়ে বেশী। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর নবীর সাথী এবং দীনের সাহায্যকারী হিসেবে বাছাই করে নিয়েছেন। তাই তাদের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাদের পদাংক অনুসরণে চলো।"

একবার খারেজীদের একটি দল সাহাবা হযরত জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলতে লাগলো—"আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করছি।" হযরত জুনদুব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বলে ওঠলেন—"তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ডাকছো ?" "হাঁ"—তারা জবাব দিল। হযরত জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু একই প্রশ্ন আবার করলেন। উত্তরে তারা একই কথা বললো। তখন তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন—"খবিশের দল ! তোমরা কি আমাদের [অর্থাৎ সাহাবা কিরামের] পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথের সন্ধান করছো ? আমাদের অনুসরণ ছেড়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হচ্ছো ? বেরিয়ে যাও এখান থেকে!!"

সাহাবা কিরামের মর্যাদার ব্যাপারে তাবেঈনগণও এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। ইমাম ইব্‌রাহীম নখঈ একবার বললেন—"কোন ব্যক্তি বা দলের গুনাহ্‌গার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে তার আমল সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিপরীত।"

আমির শা'বী বলেছেন—"সাহাবা কিরামের আমল এবং কাজকে অনুসরণ করো, এতে যদি দুনিয়ার সব মানুষ তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কথাবার্তার অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করো। যদিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তোমাদের সামনে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপন করে।" তিনি আরো বলেন–"সাহাবাদের পক্ষ থেকে লোকেরা যেসব কথা তোমাদের কাছে পৌঁছোয় সেগুলো গ্রহণ করো, আর যে কথা তারা নিজেদের মন থেকে বলে তা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করো।"

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন (গবেষক ইমামগণ) এর দৃষ্টিভঙ্গিও এরূপই ছিলো। ইমাম আওযায়ী বলেছেন ঃ "সাহাবা কিরামের পথে অনড় থাকো, তাঁরা যেখানে থেমেছে তুমিও সেখানে থেমে যাও। যে পথে সাহাবায়ে কিরাম চলেছেন তোমরা সেই পথেই চলবে। কেননা সে রাস্তায় চলার আবকাশ তোমাদের জন্য ততটুকুই আছে যতটুকু তাদের জন্য ছিলো। যে কথার প্রবক্তা তাঁরা ছিলেন—তোমরাও সেই কথার প্রবক্তা হয়ে যাও। যা থেকে তারা বিরত থাকতেন তা থেকে তোমরাও বিরত থাকো। তোমাদের পথে যে কল্যাণ রয়েছে তা শুধু তোমাদের জন্য নয়, তাঁদের জন্যও। কারণ তাদের মাধ্যমেই তোমরা এ পথের সন্ধান পেয়েছো। নেকীর এমন কোনো রাস্তা থাকতে পারে না, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিলো আর তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন। কাজেই তাঁরা এ সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তাঁর থেকে ফায়েজ ও বরকত হাসিল করেছেন। যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্ করেছেন। .... مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ [মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে আছে (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম) তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং ঈমানদারদের প্রতি সহমর্মী।]

৫. এজন্য শরীআহ্ ও তার বিধি-বিধানের ব্যাপারে সাহাবা কিরামের চিন্তা ও গবেষণার গণ্ডির বাইরে যাওয়াকে বিদআত বলা হয়, যা কোনো মতেই বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা

(রহ) ও অন্যান্য ইমামগণ এ কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—যদি এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ একটি সময় পর্যন্ত বান্দাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিলো। কেউ এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না, পরবর্তীতে তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এতে শুধু আল্লাহ্‌র হিদায়াতকেই অপূর্ণাঙ্গ মনে করা হয় না বরং দীনের পূর্ণতার ব্যাপারেও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম জাসসাস রাযী (রহ) বলেন—"যদি কোনো নির্দেশ সলফে সালেহীন এবং ফকীহ্‌দের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় তাহলে আমি মনে করি তা কোনো নির্দেশই নয়।[১]

এ জন্য সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে মনে করতে হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাদের কারো না কারো মতের মধ্যে অবশ্যই আছে। তার বাইরে কিছু থাকতে পারে না। এখন একজন গবেষকের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে তাদের মতের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে চিহ্নিত করা। গবেষক অনুসন্ধানের পর যদি সফল হন কিংবা বিফল হন উভয় অবস্থায়ই তিনি সওয়াবের অধিকারী হবেন।

সাইয়েদ ইবনুল মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে—হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, "আমি আমার প্রতিপালকের কাছে সাহাবাদের মতানৈক্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম যা আমার পরে প্রকাশিত হবে। তখন ওহী এলো—হে নবী ! আমার নিকট তোমার সঙ্গীদের মর্যাদা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। যদিও তা একটির চেয়ে অপরটি বড়ো কিন্তু সবগুলোই আলোকিত। কাজেই যদি কেউ তাদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করে সে সঠিক পথ পাবে।" ইমাম সুয়ূতী এ বর্ণনাটি জামে সগীরে সংকলন করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—"আমার সাথীরা নক্ষত্রের মত, তোমরা যারই অনুসরণ করবে হিদায়াত পাবে।"[২] এ দু'টো হাদীস যদিও সনদের দিক থেকে দুর্বল [জয়ীফ] কিন্তু আরো প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যদি সাহাবাদের মতানৈক্যের ধরন এমন হয়, একদিকে খুলাফা-ই-রাশিদীন থাকে তাহলে অন্য দলের চেয়ে খুলাফা-ই-রাশিদীনের মতকে মেনে নেয়া উত্তম। ইমাম তিরমিযি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস সংকলন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে—"তোমরা আমার সুন্নাত (পথ) অনুসরণ করো এবং আমার পরে খুলাফা-ই-রাশিদীনের সুন্নাতের (পথের) ওপর চলবে, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং তার ওপর অটল থাকবে। দীনের মধ্যে নতুন নতুন কথা ও কাজ উদ্ভাবন থেকে বিরত থাকবে কেননা দীনে প্রত্যেক নতুন কথাই বিদআত আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

আর যদি খুলাফা-ই-রাশিদীনের মধ্যে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর হয় তবে অধিকাংশ যে মতের ওপর থাকেন তার অনুসরণ করা উচিত। যদি উভয় পক্ষে দু'জন করে থাকেন তাহলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের অনুসরণ করা ভালো। হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসেছিলাম। তিনি বললেন ঃ "আমি জানি না কতদিন তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকবো, আমার পরে আবু বকর, ওমরের অনুসরণ করবে, আর আম্মারের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা এবং ইবনু মাসউদ যা বলেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া উচিত।" ইমাম তিরমিযি এ হাদীসটি মানাকিবে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিরোনামে,

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের-২৮৫ পৃষ্ঠায়, ইমাম হাকিম মুসতাদারাকের ২য় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় সংকলন করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"যদি লোকে আবু বকর ও ওমরের কথা শোনে তাহলে তারা হিদায়াতের পথে থাকবে।"

সাহাবাদের মধ্যে যারা ফকীহ্ ছিলেন তারাও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেসব ব্যাপারে একমত হতেন তার বিরোধিতা করতেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনু ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদের কাছে কোনো মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তা যদি কুরআন সুন্নাহ্‌য় পাওয়া যেত তিনি তাই বলে দিতেন, নইলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতকে অনুসরণ করতেন। অবশ্য তিনি নিজেও মাঝে মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে মাসয়ালা দিতেন।

যদি কোনো মাসয়ালা নিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়, তাহলে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত অনুযায়ী চলা উত্তম। এ হচ্ছে ইমাম ইবনু কাইয়েমের অভিমত। তিনি লিখেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো অভিমত আমার জানামতে এমন নেই যা নস (نص)-এর পরপন্থী। আর তাঁর এমন কোনো ফতোয়াও নেই যার ভিত দুর্বল। তাঁর খিলাফত নবুওয়তী খিলাফত ছিলো এতো এক স্বতসিদ্ধ ব্যাপার।[৩]

৬. ইবনু কাইয়িম যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। এ ব্যাপারে আমি আর কোনো ব্যাখ্যা দিতে চাই না। হাঁ, এমন একটি মাসয়ালা আছে, যে সম্পর্কে কথা বলার অবকাশ থেকে যায়। তা হচ্ছে—আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া প্রসঙ্গ, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে মতের প্রবক্তা ছিলেন। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর বিপরীত মত প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসীন কর্তৃক সংকলিত 'মুরতাদের শাস্তি অধ্যায়' হযরত আকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি রিওয়ায়েত সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কিছু অমুসলিম অপরাধীকে নিয়ে আসা হলো। শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেয়া হয়, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা জানতে পেরে বললেন—আমি কখনো এ ধরনের নির্দেশ দিতাম না। কারণ—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—"আগুনে পুড়িয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র জন্যই সাজে।" কাজেই আমি তাদেরকে হত্যা করে দিতাম। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"যে মুরতাদ [দীন পরিত্যাগকারী] হয়ে যাবে তাকে হত্যা করে দাও।"

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীস সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এক অভিযানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, কুরাইশের অমুক দু' ব্যক্তিকে ধরতে পারলে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। আমি যখন অভিযানে রওয়ানা দিলাম তখন তিনি ডেকে বললেন—আমি তোমাকে অমুক অমুক ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু

একমাত্র আল্লাহ্‌ই আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন। যদি তাদের দু'জনকে পাও হত্যা করে দেবে।[৪]

সুনানু আবী দাউদে সহীহ্ সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একবার এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ তিনি ইস্তিঞ্জার জন্য বাইরে গেলেন। এমন সময় আমি দুটো বাচ্চাসহ একটি পাখী দেখতে পেলাম। আমি গিয়ে পাখীর বাচ্চা দুটো নিয়ে এলাম। মা পাখীটি এসে আমার মাথার উপর চক্কর মারতে লাগলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এসে বললেন —"বাচ্চা ধরে এনে তাকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।"

অতপর তিনি সেই জায়গা দেখলেন যেখানে অনেক পিপড়া থাকায় আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বললেন—"আগুন কে লাগিয়েছে?" বললাম—"আমরা লাগিয়েছি।" তিনি বললেন—"আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া কারো জন্য শোভা পায় না, শুধু তাঁর জন্যই শোভা পায় যে আগুন সৃষ্টি করেছেন।"[৫]

এ মাসয়ালার ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা তাঁর কল্যাণমূলক চিন্তারই প্রমাণ। বড়ো বড়ো সাহাবাদের সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন। যারা সর্বদা আমর বিল মারূফ এবং কল্যাণমূলক চিন্তা-ভাবনা করার পরামর্শই তাকে দিতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সত্যপ্রিয়তার জন্য খ্যাত ছিলেন এবং সত্যকে যিনি ভালোভাবে চিনেছিলেন।

৭. এখন আমরা এমন কিছু মাসয়ালার আলোচনা করছি যেখানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে নিজের মত সংশোধন করে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতকে মেনে নিয়েছেন।

[৭.১] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এমন এক ব্যক্তি চুরি করে ধরা পড়ে ইতোপূর্বে চুরির কারণে যার এক হাত এবং এক পা কাটা হয়েছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে শাস্তি স্বরূপ অন্য পা' কেটে দেয়ার ইচ্ছে করলেন এবং হাত রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেন সে ঐ হাত দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন এই বলে যে, "এটি ইসলামী আইনের পরিপন্থী।" শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তার হাত কেটে দিন।" অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—"ইসলামের আইন হচ্ছে তার হাত কেটে দেয়া।" তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।"[৬]

[৭.২] যখন আসাদ ও গাতফান গোত্রের সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রতিনিধি এলো তখন তিনি তাদেরকে দু'টোর যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে বললেন—হয় তারা এমন এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে যার পরিণতি নির্বাসন অথবা অপমানজনক কোনো সন্ধির প্রস্তুতি তারা নেবে। তারা জিজ্ঞেস করলো—"হে রাসূলের খলীফা! প্রথম কথা তো আমরা বুঝতে পেরেছি কিন্তু দ্বিতীয় কথার (অপমানকর সন্ধি) তাৎপর্য কী?" তিনি উত্তর দিলেন—"তোমাদের অস্ত্র তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে

নিরস্ত্র করে দেয়া হবে। তোমাদেরকে দিয়ে উটের রাখালী করানো হবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দেন যাতে তোমরা ক্ষমা পেতে পারো। আমাদের যেসব সম্পদ তোমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলো ফেরত দেবে ঠিকই, তবে তোমাদের যেসব সম্পদ আমাদের হাতে এসেছে তা ফেরত দেবো না। সেই সাথে একথার স্বীকৃতিও তোমাদেরকে দিতে হবে যে, আমাদের পক্ষ থেকে যারা নিহত হয়েছে তারা জান্নাতী এবং তোমাদের পক্ষ থেকে যারা নিহত হয়েছে তারা জাহান্নামী। তাছাড়া আমাদের যারা নিহত হয়েছে সেজন্য তোমাদেরকে রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে কিন্তু আমরা তোমাদের বেলায় তা করবো না।" যখন হযরত ওমর এ ঘটনা শোনলেন, তখন একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললেন—"আমাদের নিহত লোকদের জন্য কেন রক্তপণ নেব ? তারা তো আল্লাহ্‌র পথের শহীদ। শহীদের কোনো রক্তপণ নেয়া হয় না।"[৭] একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—"ওমর ঠিক বলেছেন।"

[৭.৩] একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাতের উট বণ্টনের জন্য এক জায়গায় গেলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন—এখানে যেন আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউ না আসে। এক মহিলা তার স্বামীকে বললো—"এ লাগামটি নিয়ে আপনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যান, আল্লাহ্ হয়তো আমাদেরকে একটি উটের ব্যবস্থা করে দেবেন।" সে ব্যক্তি সেখানে পৌছুলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখে রেগে গেলেন এবং বললেন—"আমাদের থেকে অনুমতি না নিয়ে তুমি এখানে কেন এসেছো ?" একথা বলে তার হাত থেকে উটের লাগাম নিয়ে তার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। উট বণ্টন শেষ হওয়ার পর ঐ লোকটিকে ডেকে এনে বললেন—"তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। [অর্থাৎ যেভাবে আমি তোমাকে মেরেছি সেভাবে তুমি আমাকে মারো]" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ "না, আল্লাহ্‌র কসম এ প্রতিশোধ নেয়া যাবে না, একে আইনের মর্যাদা দেবেন না।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসন চালাতে এরূপ অবস্থার মুখোমুখি হলে এ ধরনের ভর্ৎসনা করা যেতে পারে। তবে কাজটি যে বাড়াবাড়ি হয়েছে এ উপলব্ধিও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। এজন্য তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে আমার জন্য কে যিম্মাদার হবে ?" একথার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন—"ঐ ব্যক্তিকে খুশী করে দিন।" তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাকরকে নির্দেশ দিলেন, "হাওদা সহ তাকে একটি উট, একটি চাদর এবং নগদ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দাও।" এভাবে তিনি ঐ লোকটিকে খুশী করে দিলেন।[৮]

[৭.৪] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উয়ায়না ইবনু হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি জায়গীর দান করেন এবং সে জন্য একটি দলিলও লিখে দেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উয়ায়না রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—"আমার মনে হয় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি পছন্দ করবেন না, যদি তুমি এ দলিল তাকে দেখাতে তবে ভাল হতো।" অতপর উয়ায়না রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে দলিলটি দেখালেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দলিলটি পড়ে বললেন—"আচ্ছা ! সমস্ত এলাকা শুধু তোমার, এতে অন্যদের কোনো অংশ নেই !!" একথা বলে তিনি দলিলটি ছিড়ে ফেললেন। হযরত উয়ায়না রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তারপর বললেন—"আমাকে আরেকটি দলিল লিখে দিন।" হযরত আবু বকর (রা) বললেন—"উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তার পুনরাবৃত্তি কখনো করবো না।"৯

[৭.৫] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি জমি জায়গীর দেন। এজন্য একটি দলিল লিখে বিশেষ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পাঠান। তার মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামও ছিলো। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দলিল নিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে সীল মেরে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি সীল মারতে অস্বীকার করেন এবং বলেন—এ জায়গীরে শুধু তোমার একার নাম কেন, অন্যদের কেন এ জমিতে শরীক করা হলো না?" একথা শুনে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগান্বিত হয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলতে লাগলেন—"আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বুঝতে পারি না, খলীফা কে, আপনি না ওমর?" তিনি বললেন—"খলীফা তো আমিই কিন্তু ওমরের প্রকৃতি একটু শক্ত।"১০

[৭.৬] অনাবাদী সরকারী জমি কারো মালিকানায় দিতে হলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবহিত ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সরকারী জমি দীর্ঘদিনের জন্য কাউকে ইজারা দেয়া যাবে না। তাছাড়া এমন লোককেও জমি দেয়া যাবে না, যে অনাবাদী ফেলে রাখবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে বিনা দ্বিধায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিমত পোষণ করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনাবাদী সরকারী জমি কাউকে ইজারা দিলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানাতেন না। কারণ, তিনি তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে ভালো করেই অবহিত ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একখণ্ড জমি জায়গীর দিলেন। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনো তার কাজগপত্র তৈরী করা শেষ করতে পারেননি। ইত্যবসরে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে এসে পৌঁছুলেন। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবাইয়ের হাত থেকে কাগজটি ছোঁ মেরে নিয়ে কাপড়ের কোচে লুকিয়ে রাখলেন। ঘটনাটি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুধাবন করতে পারলেন। বললেন—"মনে হয় আপনি কোন কাজে লিপ্ত আছেন।" হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন—"হাঁ।" তারপর কাগজটি বের করে অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করলেন।১১

[৮.] ওপরের আলোচনা থেকে কেউ এ ধারণা পোষণ করে বসবেন না যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতের পতুল ছিলেন। তিনি যা চাইতেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝি তাই করতেন। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। বরং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভেবেচিন্তে কাজ করতেন। অনেক সময় তা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের অনুকূলে যেত আবার অনেক সময় প্রতিকূলেও যেত। নিচে আমরা এমন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই যেখানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ও মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

[৮.১] ইতিহাস সাক্ষী, যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন হযরত ওমর দ্বিমত পোষণ করে বলেছিলেন—

আপনি তাদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করতে চান অথচ তারা কালিমা তাইয়্যিবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-স্বীকার করে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন —আমাদের ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ পর্যন্ত সে সাক্ষ্য না দেবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'। একথার সাক্ষ্য দিলে তার জানমাল আমাদের থেকে নিরাপদ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর একথায় কোনো কর্ণপাত না করে বরং বললেন ঃ "তুমিতো জাহেলী যুগে শক্তিশালী ছিলে এখন ইসলাম গ্রহণের পর দুর্বল হয়ে গেছ।" তারপর তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিলেন—"আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করবো যারা নামায ও যাকাতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়। আল্লাহ্‌র কসম ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় যাকাত বাবদ ছাগলের বাচ্চা প্রদান করতো এমন একটি ছাগলের বাচ্চাও যদি কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করে আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো।"

[৮.২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর যখন খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয় তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি এখন আপনার পুরো সময় মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করবেন এবং আপনার ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নেবেন। বিনিময়ে আপনি এবং আপনার পরিবারের জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন। তবে তার ধরন ও পরিমাণ অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শভিত্তিক এমন হতে পারে যে, শীত-গ্রীষ্মের জন্য এক জোড়া করে কাপড়, সফরের জন্য একটি বাহন, আপনার পরিবারের জন্য সেই পরিমাণ ভাতা যে পরিমাণ অর্থ আপনি খলীফা হওয়ার পূর্বে তাদের জন্য খরচ করতেন। ছাগলের অর্ধাংশ (মাথা ও ভূড়ি-এর অন্তর্ভূক্ত হবে না)। একথা শোনে তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন —"আমার ভয় হয় সম্ভবত এ মাল থেকে খরচ করার কোনো (ন্যায়সংগত) সুযোগ আমার নেই।" কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যা হোক তিনি তাঁর খিলাফতকালে সর্বসাকুল্যে আট হাজার দিরহাম মাত্র বাইতুলমাল থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু যখন তাঁর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এলো তখন (ওসিয়ত হিসেবে) বললেন —"আমি ওমরকে বলেছিলাম এ মাল থেকে খরচ করার অধিকার আমার নেই কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ী হলো যার কারণে আমাকে বাইতুলমাল থেকে ভাতা গ্রহণ করতে হয়েছে। যখন আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব তখন আমার সম্পদ থেকে আট হাজার দিরহাম বাইতুলমালে জমা করে দেবে।"

যখন তাঁর ওফাতের পর উল্লেখিত দিরহাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জমা দেয়া হলো তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠলেন—"আল্লাহ্ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর রহম করুন। তিনি তাঁর উত্তরসূরীদেরকে এক মহাবিপদে ফেলে দিলেন।"[১২] অর্থাৎ তার উত্তরসূরীদের সেই পথে চলা সহজ কাজ ছিলো না।

[৮.৩] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন রাজকোষ থেকে যে ভাতা বা অনুদান দেয়া হয় তা সকল মুসলমানের জন্য সমান হওয়া উচিত। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে দ্বিমত পোষণ করতেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন—এ ব্যাপারে কি আনসার ও মুহাজিরগণও অন্যদের সমান হয়ে যাবে ? আনসার ও মুহাজিরদেরকে একটু প্রাধান্য দেয়া উচিত। কারণ, তারা ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করে বরং বলে দিলেন—"তাদের সওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকাই

ভাল। যেখানে অর্থনীতির প্রশ্ন জড়িত সেখানে কাউকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতা রক্ষা করে চলাই উত্তম।"[১৩]

একথা তো সর্বজন বিদিত যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে ভাতা ও অনুদানে প্রাধান্যের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

[৮.৪] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবান ইবনু সাঈদ ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহ্‌রাইনের গভর্নর করে পাঠাতে চাইলেন কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গণ্যমান্য সাহাবাদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন, কাকে বাহ্‌রাইন পাঠানো যায়। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন—হযরত আ'লা ইবনু হাজরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানে গভর্নর করে পাঠানো হোক। কারণ—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও তিনি সেখানকার গভর্নর ছিলেন। সে জায়গার অবস্থা সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল। তাছাড়া লোকজনও তাঁকে ভালো করে জানে। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—আবান ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহ্‌রাইনের গভর্নর হিসেবে যেতে বাধ্য করা হোক। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথার প্রতিবাদ করে বললেন—তাকে বাধ্য করা সম্ভব নয়, যিনি একথা বলে ফেলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কারো অধিনস্থ হয়ে কাজ করবেন না। অতপর তিনি হযরত আ'লা ইবনু হাজরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর করে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিলেন।[১৪]

[৯.] আবার আমরা হাফিয ইবনু কাইয়িমের কথার দিকে ফিরে যাচ্ছি। তিনি লিখেছেন ঃ যদি খুলাফা-ই রাশিদীনের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয় এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিকে থাকেন তাহলে তাদের বক্তব্য মানা উচিত। আর যদি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে মতবিরোধ হয় তবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে এটিও জরুরী হয়ে পড়ে যে, সে সব মাসয়ালার সীমা নির্ধারণ করা জরুরী, যেখানে এ দু'জন মনীষী একমত হয়েছেন এবং যেখানে একমত হতে পারেননি। আমি এ দু'জন জলীলুল কদর সাহাবার ফিকহী মতামত গভীর মনোনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করেছি এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, কতিপয় মাসয়ালা ছাড়া সমস্ত মাসয়ালার ব্যাপারেই ঐ দু'জন মহাত্মা ঐকমত্য ছিলেন। যেসব মাসয়ালা নিয়ে তারা দ্বিমত পোষণ করেছেন সে মাসয়ালাগুলো নিম্নরূপ ঃ

[৯.১] **আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি**—অত্যাচারীকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়াকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৈধ মনে করতেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একে বৈধ মনে করতেন না।

[৯.২] **সরকারী জমি জায়গীর দেয়া**—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সরকারী জমি দীর্ঘ মেয়াদী সময়ের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে জায়গীর দেয়ার পক্ষে ছিলেন কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জায়গীর দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন তবে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য দেয়ার বিরোধী ছিলেন।

[৯.৩] সকালের আযান—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফযরের আযান ওয়াক্ত হওয়ার পর দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই আযান দেয়াতেন।

[৯.৪] ভাইয়ের উপস্থিতিতে দাদার মিরাছ—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ারিসদের মধ্যে দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত গণ্য করতেন এবং দাদার উপস্থিতিতে বোন ভাইদেরকে কোন অংশ প্রদান করতেন না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার প্রথম দিকে এ মতের ওপর ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি দাদার সাথে ভাই বোনদের জন্যও এক-ষষ্ঠাংশ অংশ বরাদ্দ করেন। তার কিছুদিন পর ভাইবোনকে এক-তৃতীয়াংশ অংশ প্রদান করা শুরু করেন। অবশ্য শেষ দিকে গিয়ে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের দিকেই ফিরে এসেছিলেন কিন্তু তিনি তা বাস্তবায়ন করার পূর্বেই শাহাদাত বরণ করেন।

[৯.৫] যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করার পক্ষে ছিলেন পক্ষান্তরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি ছিলো ভিন্ন ধরনের। তিনি কিছু লোককে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিছু লোককে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে ছেড়ে দিয়েছেন আবার অনেককে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা মুসলমানদের বড়ো ধরনের লাভের দিকটি বিবেচনায় রাখতেন।

[৯.৬] খলীফাতুল মুসলিমুন থেকে বদলা নেয়া—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথার প্রবক্তা ছিলেন নেতা যদি কাউকে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন এবং সেখানে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তবে ঐ ব্যক্তিকে বদলা নেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করতেন বদলা নেয়ার সুযোগ না দিয়ে তাকে অন্য কোনোভাবে রাজী করানো উচিত।

[৯.৭] সরকারী পদ গ্রহণের জন্য বাধ্য করা—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সরকারী পদ গ্রহণে কাউকে বাধ্য করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণার্থে এরূপ করা বৈধ মনে করতেন।

[৯.৮] বাইতুলমাল থেকে খলীফার ভাতা গ্রহণ—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বাইতুলমাল থেকে কিছু গ্রহণ করতে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বাইতুলমাল থেকে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন তা ফেরত দেয়ার জন্য ওসিয়ত করে যান। এ ব্যাপারে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যেহেতু খলীফা রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণের জন্য তার সমস্ত সময়, মেধা ও শ্রম নিয়োগ করেন সেহেতু তাঁর নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা বাইতুলমাল থেকে গ্রহণ করতে পারেন।

[৯.৯] যাকাত বন্টনে 'মুয়াল্লিফাতুল কুলূব'-এর সাহায্য—যারা ইসলাম বিদ্বেষী তাদের বিরোধিতাকে কমানোর জন্য অথবা এমন লোক যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ইসলামের পথে অবিচল থাকার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতের সম্পদ থেকে তাদেরকে ভাতা বা অনুদান দিতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ

ধারাটি অব্যাহত রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খিলাফতকালে এই বলে এ খাতকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলাম এখন বলিষ্ঠতা অর্জন করেছে কাজেই কারো মনোরঞ্জনের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

[৯.১০] কান কাটার দিয়াত—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, কান কাটার বিনিময়ে দিয়াত (রক্তপণ) হিসেবে ১৫টি উট দেয়। তাঁর দলিল ছিলো—কানের বাইরের অংশ না থাকলেও শোনতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না এবং শারীরিক কোনো দুর্বলতার সৃষ্টি হয় না। প্রকাশ্য ত্রুটিটুকুও চুল দিয়ে অথবা পাগড়ী দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। পক্ষান্তরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতির কারণে দিয়াতের সাধারণ নীতিমালাকে সামনে রাখতেন। এজন্য তিনি এ ধরনের অপরাধের বিনিময়ে অর্ধেক দিয়াতের প্রবক্তা ছিলেন।

[৯.১১] মাদকদ্রব্য সেবনের শাস্তি—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদক দ্রব্য সেবনকারীদেরকে চল্লিশ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন অথচ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে জন্য ৮০ ঘা বেত মারার শাস্তি প্রয়োগ করেছেন।

[৯.১২] উম্মুওয়ালাদ [এমন বাঁদী যার গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মগ্রহণ করে]-এর মুক্তি—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন উম্মু ওয়ালাদ তখনই মুক্ত হয়ে যাবে যখন মনিব তাকে মুক্ত করে দেবে। এ জন্য মনিব ইচ্ছে করলে তাকে বিক্রি করেও দিতে পারেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো উম্মু ওয়ালাদের গর্ভ থেকে তার মনিবের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে সে স্বাধীন হয়ে যায়। তাকে বিক্রি করা যাবে না।

[৯.১৩] ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া ও গোলামের যাকাত গ্রহণ করতেন না কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা গ্রহণ করেছেন।

[৯.১৪] বিচারালয়ের মধ্যে গালমন্দ করা—বিচারকের দরবারে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে জন্য কোনো শাস্তি দেননি। তবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের কাজকে বেয়াদবি মনে করতেন।(এবং বেয়াদবির শাস্তি দিতেন)।

[৯.১৫] তাহাজ্জুদ নামাযের পর বিত্‌র পুনরায় আদায় করা—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শোয়ার পূর্বে বিত্‌র পড়ে নিতেন। রাতে ওঠে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিত্‌র পড়তেন না। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিত্‌র পড়ে ঘুমিয়ে আবার তাহাজ্জুদ পড়েও পুনরায় এক রাকায়াত বিত্‌র নামায আদায় করতেন।

[৯.১৬] জানাযা নামায পড়ানোর হক কার বেশী ?—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন জানাযা নামায পড়াবার বেশী অধিকার মুসলিম নেতার। পক্ষান্তরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন এ-অধিকার সবচেয়ে বেশী মাইয়িতের অভিভাবকের।

[৯.১৭] এক শব্দে তিন তালাক প্রদান—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত হচ্ছে, এক শব্দে তিন তালাক প্রদান করলে [অর্থাৎ 'তোমাকে তিন তালাক' বললে] মাত্র এক তালাক কার্যকরী হবে। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ক্ষেত্রে তিন তালাক কার্যকরী বলে মনে করতেন।

[৯.১৮] উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যেসব রিওয়ায়েত আছে তাতে বুঝা যায় তিনি পুরুষের উরুকে সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না। পক্ষান্তরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উরুকে সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন।

[৯.১৯] লিওয়াতাতের [সমকামিতার] শাস্তি—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে প্রস্তাব করলেন, লিওয়াতাতের শাস্তি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া নির্দিষ্ট করা হোক। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবনা মেনে লিওয়াতাতের শাস্তি আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যু দণ্ডের নির্দেশ জারী করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের অপরাধীদের বেত্রাঘাত ও সামাজিকভাবে তাদেরকে বয়কটের শাস্তি প্রদান করার পক্ষপাতি ছিলেন।

[৯.২০] কুরআন মজীদের মুফাচ্ছাল সূরাসমূহের মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদা—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন আল কুরআনের মুফাচ্ছাল সূরাসমূহে তিনটি সিজদার আয়াত আছে। পক্ষান্তরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন সেখানে কোনো সিজদার আয়াত নেই।

[৯.২১] সন্তানদের মধ্যে উপহার প্রদানে পার্থক্য করা—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একাধিক সন্তানের মধ্যে উপহার বন্টনে সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করতেন না, কাউকে বেশী এবং কাউকে কম দেয়া জায়েয মনে করতেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটিকে জায়েয মনে করতেন না।

এ হচ্ছে সেইসব মাসয়ালা যেখানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিমত পোষণ করেছেন। এছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত মাসয়ালায় [যা আমি 'ফিক্‌হে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সংকলন করেছি] এ দু' মনীষী ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

বিনীত

ডঃ মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী
অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অভ্ পেট্রোলিয়াম,
জাহ্‌রান সৌদি আরব।

তথ্যসূত্র

১. আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০।

২. জামি' বয়ানুল ইল্‌ম ২য় খণ্ড, পৃঃ-৯১।

৩. আ'লামুল মাওকাঈন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১১৯।

৪. ফতহুল বারী [সহীহ আল বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ], ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১০৪, ১০৫।

৫. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-২৬৭৫।

৬. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৭৪ ; আল মুহাল্লী ; ১১শ খণ্ড, পৃ-২৫৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬৪ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৪১ ; তাফসীরে কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭২।

৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৯; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-১৯৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩৫।

৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।

৯. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৭৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০ ; তাফসীরে তাবারী, ১৪শ খণ্ড, পৃ-৩১৫।

১০. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৭৬।

১১. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯১৩।

১২. সাফওয়াতুস সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৭ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-১০৫ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৬৮ ; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৯৫, ৫৯৯, ৬০২।

১৩. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪১৬ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৬৩ ; কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭১৪ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫২১, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৩।

১৪. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০।

অনুবাদকের কথা

১. ইসলামী জীবন বিধানের প্রধান উৎস দু'টো। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব বা কুরআনুল হাকীম অন্যটি সুন্নাতে রাসূল বা হাদীস। আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে—হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল মূলত আল্লাহ্‌র কিতাব বা আল কুরআনের ভাষ্য। হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআন বুঝার কথা কল্পনাও করা যায় না। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে—'তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও' নামায কিভাবে কায়েম করতে হবে অথবা যাকাত কিভাবে দিতে হবে তার বিস্তারিত কোনো রূপরেখা পেশ করা হয়নি। সুন্নাতে রাসূলে আমরা দেখতে পাই নামায বলতে ওযু করে নির্দিষ্ট সময়ে কিবলামুখী হয়ে বুকে অথবা নাভির নিচে হাত বেধে সানা, সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়া, রুকূ' করা সিজদা করা, তাশাহুদ পড়া, দরূদ শরীফ পড়া তারপর দুআ মাছুরা পড়ে নামায শেষ করার পরিপূর্ণ বিবরণ। তদ্রূপ ন্যূনতম কতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে এবং সম্পদের মোট কত অংশ প্রদান করতে হবে তাও হাদীসের মাধ্যমে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি।

২. আল কুরআন অবতীর্ণ ও তার ভাষ্য প্রদানের সময় যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন তারা হচ্ছেন সম্মানিত সাহাবাগণ। আল্লাহ্‌র কথা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্য তাদের মাধ্যমেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাছাড়া তারা আবার হাদীসের ভাষ্যও প্রদান করেছেন। অনেক সময় কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা নতুন কোনো সমস্যার সমাধানও পেশ করেছেন। সেগুলোকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে ইজমা ও কিয়াসের উদ্ভব হয়েছে। যা ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে পরিচিত।

৩. সাহাবাদের যে কোনো ধরনের ভাষ্যই হোক তা মূলত কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ব্যাপারে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আবার ইমাম ও মুজতাহিদগণ ও ইসলামী আইন ও বিধান সংক্রান্ত অনেক ভাষ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে—ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইসলামী আইন ও বিধান সংক্রান্ত ভাষ্যগুলো যেখানে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ্ বুঝার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করবো, সেখানে তা না করে বরং সেই ভাষ্যকেই অকাট্য মনে করে আমল করা শুরু করে দিয়েছি। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ইমামদের গবেষণা ও রায় যেখানে কুরআন হাদীসের সাথে তুলনা করে কিংবা যাচাই করে মানা প্রয়োজন সেখানে কুরআন হাদীসের সাথে যাচাই তো দূরের কথা এক ইমামের গবেষণা অন্য ইমামের গবেষণার সাথে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনও আমরা মনে করি না। তাছাড়া সে সুযোগও আমাদের নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক ইমামই তার গবেষণার রায় দেয়ার পর বলেছেন—'এটি আমার গবেষণা বা অনুসন্ধানের ফলাফল। এ রায় বা ফলাফল যদি কোনো সহীহ্ হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত হয় তাহলে সেই হাদীসের বক্তব্যই হবে আমার রায় বা বক্তব্য।' অথচ আজ আমরা যারা সেই মহান ইমামদের অনুসরণ করছি তারা একথা প্রায় ভুলেই বসেছি। মনে করি আমাদের ইমাম যেসব রায় দিয়েছেন সবই সঠিক এবং নির্ভুল।

৪. একজন সাধারণ লোক কিংবা একজন আলিম যতো সহজে বলতে পারেন এ মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা সাহেবের অভিমত এই, ইমাম শাফিঈ সাহেবের রায় এই এবং ইমাম মালিক সাহেবের সিদ্ধান্ত এই, ততো সহজে বলতে পারেন না যে, এ মাসয়ালার ব্যাপারে অমুক সাহাবার রায় এই এবং অমুক সাহাবার রায় এরূপ। কারণ, ইমামদের ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যেভাবে জানতে পারি সাহাবাদের ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি সেভাবে জানার সুযোগ ও উপকরণ আমাদের কাছে নেই। এমন কি যেসব ফিক্‌হী গ্রন্থ পাওয়া যায় সেখানেও সাহাবাদের মতামত বিস্তারিতভাবে জানা যায় না।

৫. বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গবেষক, জাহ্‌রান পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটির (সৌদী আরব) প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী [যিনি কুয়েত থেকে প্রকাশিত—ফিক্‌হী বিশ্বকোষ (৪০ খণ্ডে) সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য] সাহাবা ও তাবিঈনদের ফিক্‌হী রায়গুলোকে সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে চলছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন—

"ফিক্‌হী ইসলামীর সংকলন ও সম্পাদনার সময় আমার ভেতর ইচ্ছে জাগলো এমন একটি ফিক্‌হী বিশ্বকোষ সংকলনের, যেখানে ইসলামী ফিক্‌হের যাবতীয় ইজতিহাদ ও রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যদিও কাজটি অসম্ভব নয়, তাই বলে খুব সহজ সাধ্যও ছিলো না। কারণ—সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবিঈনে ইযাম এবং ইমামদের ইজতিহাদী রায়গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে সংকলন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহের ফিক্‌হগুলোও আধুনিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে কোনো সংকলন বের করা হয়নি। অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হী বিশ্বকোষের ইমারত তৈরী করতে হলে এ দু'টো জিনিস ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে।

এ মহান কাজের দায়িত্ব নিতে এ পর্যন্ত না কোনো রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে না কোনো সংস্থা। এমনকি কোনো ব্যক্তিও এগিয়ে আসেননি। তাদের ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফায়দা ওঠানোর জন্য ভিত্তির ইট ছাড়াই ইমারত নির্মাণ শুরু করে দেয়া। এহেন প্রতিকূল অবস্থায়ও বুকে সাহস সঞ্চয় করে সালফে সালিহীনদের ফিক্‌হী রায় সংক্রান্ত বিশ্বকোষ সংকলন ও সম্পাদনার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু লেখনী ধরার পূর্বে সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবিঈন (রহ) এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ইজতিহাদ ও রায়গুলোকে একত্রিত করার কাজ শুরু করে দিলাম। একত্রিত করার যে কাজটি আজ পর্যন্ত কেউই করেননি। বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে সেই মহান কাজটি আমি সম্পূর্ণ করেছি। ------- এখন আমি শুধু সালফে সালিহীনদের ফিক্‌হী বিশ্বকোষ রচনা কাজে নিয়োজিত থাকবো।"

এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। যা পর্যায়ক্রমে পাঠকদের হাতে পৌঁছুবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলো হচ্ছে—

১. ফিক্‌হে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. ফিক্‌হে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. ফিক্‌হে হযরত ওসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. ফিক্‌হে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু
৫. ফিক্‌হে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

লেখকের এ মহান খিদমতকে বাংলা ভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য গ্রন্থগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এ মহান কাজে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে ইসলামী বই পুস্তক প্রকাশনা জগতের নক্ষত্র স্বরূপ আধুনিক প্রকাশনী। সবগুলো খণ্ডকেই পর্যায়ক্রমে অনুবাদ ও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৬. সংকলকের ইল্‌মী মান ও পাণ্ডিত্যে গ্রন্থখানা হয়ে ওঠেছে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ মহান গ্রন্থটি অনুবাদের কাজ সহজ ছিলো না। তবু আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশা নিয়ে এ কাজে হাত দিয়েছি। জানি না এতে কতটুকু সফল হয়েছি। তবে অনুবাদে মূল বিষয়ের ভাব ও বক্তব্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। গ্রন্থটি অনুবাদে আমি প্রতিনিয়ত যাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তাদের মধ্যে—আধুনিক প্রকাশনীর সাবেক পরিচালক মরহুম আবদুল গাফ্‌ফার ভাই, প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন ভাই এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ ভাই। আর যারা অনুবাদে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ও বরেণ্য আলিমে দীন আবদুল মান্নান তালিব ভাই এবং অধ্যক্ষ মাওলানা মোজ্জাম্মেল হক সাহেব অন্যতম। আল্লাহ্‌ যেন তাদের প্রত্যেককে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

৭. এবার অনুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা।

[৭.১] মূল গ্রন্থ যেহেতু আরবী ভাষায় তাই বিষয়বস্তুর শিরোনামও আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো। বাংলা ভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিয়েছি। এতে মূল গ্রন্থের সাথে অনুবাদ গ্রন্থের মানের কোনো হেরফের হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

[৭.২] এখানে পাঠককে একটি কথা মনে রাখতে হবে, এ সিরিজের প্রতিটি পুস্তক ইসলামী আইনের উৎসের মর্যাদা রাখে। তাই আমরা অন্যান্য ফিক্‌হী গ্রন্থে মাসয়ালার যে বিন্যাস দেখতে পাই এখানে তার ব্যতিক্রম। যেমন সাধারণ ফিক্‌হী গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ওযুর সময় নাকে পানি দিতে হবে এবং কুলি করতে হবে।' কিন্তু এসব গ্রন্থে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবাগণ ওযু করেছেন। আবার বলা যায় 'জাহেলী যুগের কুপ্রথার অনুসরণ ইসলামে জায়েয নেই।' এটি হচ্ছে মূল মাসয়ালা। কিন্তু দেখা যায় ফিক্‌হে আবু বকরে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক মহিলা কথা না বলে হাজ্জ করার মানত করেছিলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কথপোকথনের মাধ্যমে জানতে পেরে তাকে বারণ করেছেন। আবার দেখা যায় ওযু ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে দু'টো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, অন্যগুলো সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হলো না। এর কারণ হচ্ছে—যে সাহাবার মতামতকে ধারণ করে ফিক্‌হী গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়েছে, ঐ সাহাবা থেকে হয়তো সেই দু'টো বিষয়েই তার মতামত পাওয়া গেছে। অন্য খণ্ডে হয়তো অন্য সাহাবা থেকে সেই বিষয়ে ভিন্নমত

পাওয়া যাবে কিংবা আরো বেশী মতামত পাওয়া যাবে। সবগুলো খণ্ডকে যখন এক সাথে রাখা হবে তখন দেখা যাবে প্রতিটি বিষয়েরই পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা আমাদের কাছে চলে এসেছে।

[৭.৩] ইখতিলাফী মাসয়ালার ব্যাপারে যেটিকে অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করা হয়েছে শুধু সেইটির নোট দেয়া হয়েছে। সবগুলোর নোট দেয়া হয়নি। কারণ দু'টো। অনুবাদক কর্তৃক বেশী টীকা সংযোজন করলে মূল কিতাবের গুরুত্ব হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত—ফিক্‌হী মাসয়ালায় সাহাবাদের মধ্যেও অনেক ব্যাপারে মতবিরোধ হতো কিন্তু তা নিয়ে কখনো তারা বাড়াবাড়ি করেননি সে কথাটি সুস্পষ্ট করার জন্য। তবে কিছু আরবী শব্দের পরিচিতি মূলক ব্যাখ্যা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজন করা হয়েছে। অবশ্য অনুবাদকের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মূল লেখক ও অনুবাদকের কথাকে পাঠকগণ গুলিয়ে না ফেলেন।

[৭.৪] যেহেতু মূল পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত তাই একটি মাসয়ালা আরবীতে একাধিক শিরোনামভুক্ত হয়েছে। এক জায়গায় সেই মাসায়ালাটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু অন্য জায়গায় শুধু রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। যেমন—ইবিল বা উট। এটি বিভিন্ন মাসয়ালার সাথে জড়িত। যাকাতের মাসয়ালার সাথেও উটের প্রসঙ্গটি এসে যায় আবার হাজ্জের কুরবানীর মাসয়ালাও উটের কুরবানী প্রসঙ্গটি চলে আসে, আবার দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধের দিয়াত বা জরিমানা হিসেবেও উটের কথা চলে আসে। তাই ইবিল শিরোনামে বিস্তারিত আলোচন না করে কোথায় কোথায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তার নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়েছে। আরো অনেক মাসয়ালার ব্যাপারেই এরূপ করা হয়েছে। আমার মনে হয় এরূপ করায় পাঠকদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশী হয়েছে। আশা করি পুস্তকটি পড়লেই পাঠকগণ আমার সাথে একমত হবেন।

[৭.৫] পাঠকদের দেখমতে অনুরোধ কোথাও যদি আপনারা অনুবাদকে দুর্বোধ্য মনে করেন কিংবা কোনো ভুলত্রুটি আপনাদের দৃষ্টিতে পড়ে যায় মেহেরবাণী করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এ বিশ্বকোষের সংকলক, প্রকাশক ও পাঠক প্রত্যেকের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জাযায়ে খায়ের কামনা করছি এবং আমার এ অনুবাদ কর্মটিকে ভুলত্রুটি মাফ করে কবুল করার জন্য বিশ্ব চরাচরের মালিক ও প্রতিপালকের সমীপে নতশিরে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমীন।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০
০৭-০৯-৯৯ ঈসায়ী

শিরোনাম বিন্যাস

আ

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
০ আওরাতুন [عورة] -লজ্জাস্থান, সতর	৩৫
০ আক্বমুন [عقم] -বন্ধ্যাত্ব	৩৫
০ আতা [عطاء] -অনুদান, ভাতা	৩৫
০ আ'তীয়াহ্ [عطية] -দান	৩৫
০ আনআম [انعام]-গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু	৩৫
০ আবুন [اب] -পিতা	৩৬
০ আমানাহ্ [امانه] -আমানত	৩৬
০ আ'যল [عزل] -জরায়ুতে বীর্য পৌঁছুতে বাধা দেয়া	৩৬
০ আযহিয়াহ্ [اضحية] -কুরবানী	৩৬
০ আযান [اذان] -আযান, ঘোষণা	৩৭
০ আরদুন [ارض] -জমি, পৃথিবী, মাটি	৩৭
০ আর্‌শ [ارش] -জরিমানা	৩৮
০ আ'রাফাহ [عرف] -আ'রাফাত	৩৮
০ আস্‌র [عصر] -আসর নামায, দিনের শেষ ভাগ	৩৮
০ আসির [اسر]-বন্দী করা, কয়েদ করা	৩৮

ই

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
০ ইক্‌তা' [اقطاع] -জায়গীর	৪০
০ ইকতিনায [اكتناز] -গুদামজাত করা	৪০
০ ইক্‌রার [اقرار] -স্বীকারোক্তি	৪১
০ ইক্‌রাহ্ [اكراه] -অবৈধ বলপ্রয়োগ	৪১
০ ইকামাত [اقامة]-নামাযে দাঁড়ানোর ঘোষণা	৪২
০ ইছবাত [اثبات]-প্রমাণ উপস্থাপন করা	৪২
০ ইজারাহ্ [اجارة] -ইজারা, ভাড়া	৪২
০ ইত্‌লাফ [اتلاف] -বিনষ্ট করে দেয়া	৪৩
০ ই'ত্‌রাহ্ [عترة] -সন্তান, আত্মীয়স্বজন	৪৪
০ ই'তিকাফ [اعتكاف] -ইতিকাফ	৪৫
০ ইদ্দাতুন [عدة] -ইদ্দত, হিসেব করা	৪৫
০ ইনজাব [انجاب] -সন্তান জন্মদান করা	৪৫
০ ইফতার [افطار] -রোযা ভাঙ্গা	৪৫
০ ইফরাদ [افراد] -কেবল হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাধা, একাকী হওয়া	৪৬
০ ইফলাস [افلاس] -দেওলিয়া হওয়া	৪৬
০ ইবন [ابن]-ছেলে	৪৬
০ ইবিল [ابل] -উট	৪৬
০ ইমামাহ্ [عمامة] -পাগড়ী	৪৬
০ ই'মামাত [مامة] -খিলাফত, ইমামত	৪৬
০ ইমারাত [امارة] -নেতৃত্ব, ইখতিয়ার	৪৬
০ ইযতিবা' [اضطباع] -হাজ্জের এক বিশেষ কাজ	৫৬
০ ইয়াদুন [يد] -হাত	৫৬
০ ইয়ামীন [يمين] -শপথ	৫৭
০ ইরছ্ [ارث] -মীরাস/উত্তরাধিকার	৫৮
০ ইরদাফ [ارداف] -বাহনের পিছনে বসিয়ে নেয়া	৬৪
০ ইল্‌ম [علم] -জ্ঞান	৬৫
০ ইস্‌তিকায়াহ্ [استقاءة]-ইচ্ছেকৃত বমি করা	৬৫
০ ইস্‌তিবরা [استبراء] -পবিত্র করা	৬৫
০ ইস্‌তিতাবাহ [استتابة]-তাওবা করার আহ্বান জানানো	৬৫
০ ইস্‌তিস্‌কা [استسقاء]-বৃষ্টি প্রার্থনা করা	৬৫
০ ইস্‌তিহ্‌কাক [استحقاق]-অধিকার হওয়া	৬৫
০ ইস্‌তিহ্‌লাল [استهلال]-নবজাতকের শব্দ, চাঁদ দেখা	৬৫
০ ইসলাম [اسلام]-ইসলাম, আত্মসমর্পণ	৬৫
০ ই'সার [اعسار] -অসচ্ছলতা	৬৭
০ ইহ্‌ইয়াউল মাওয়াত [احياء الموات] - অনাবাদী জমি আবাদ করা	৬৭
০ ইহ্‌তিবা [احتباء] -হাঁটু মুড়ে বসা	৬৯
০ ইহ্‌তিবাস [احتباس] বেধে নেয়া	৬৯
০ ইহ্‌রাম [احرام] -ইহ্‌রাম বাধা	৬৯
০ ইহ্‌সান [احصان]-বৈবাহিক বন্ধনভুক্ত করা	৬৯

ঈ

০ ঈদ [عيد] -ঈদ ৭৪

উ

০ উম্মুন [ام] -মা ৭৫
০ উযুন [اذن] -কান ৭৫

ও

০ ওকুবাহ্ [عقوبة] -শাস্তি ৭৬
০ ওদীয়াহ্ [وديعة] -গচ্ছিত রাখা ৭৬
০ ওসিয়্যাহ্ [وصية] -ওসিয়ত ৭৬
০ ওযর [عذر] -ওযর আপত্তি ৭৮
০ ওযু [وضوء] -ওযু ৭৮
০ ওয়াক্‌ফ [وقف] -ওয়াক্‌ফ ৭৯
০ ওয়াকালাহ্ [وكالة] -প্রতিনিধিত্ব, দায়িত্ব অর্পণ করা ৮০
০ ওয়াতরুন [وتر] -বিত্‌র নামায ৮০
০ ওয়াতিয়্যুন [وطى]-সহবাস, যৌন মিলন ৮০
০ ওয়ালাদ [ولد] -সন্তান ৮০
০ ওয়ালা' [ولاء] -মালিকানা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ৮০
০ ওয়াশমন [وشم] -উল্কি আঁকা ৮১

ক

০ কাওয়াদ [قود] -প্রতিশোধ গ্রহণ ৮২
০ কাতউন [قطع] -কেটে ফেলা, পৃথক করা ৮৩
০ কাত্‌ল [قتل] -হত্যা ৮৩
০ কা'বাহ্ [كعبة] -কা'বা ঘর ৮৩
০ কাফ্‌ফারাহ্ [كفارة]-প্রতিকার, কাফ্‌ফারা ৮৩
০ কাফান [كفن] -কাফন ৮৩
০ কাফায়াত [كفاءة] -সমতা ৮৩
০ ক্বাবয [قبض] -আয়ত্বে নেয়া, হাতের মুঠোয় ধারণ করা ৮৪
০ ক্বাযা [قضاء] -ফায়সালা করা ৮৪
০ ক্বাসামাহ্ [قسامة]-পরস্পর শপথ করা ৮৬
০ ক্বাযফ [قذف] -ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ৮৬
০ ক্বারয [قرض] -ঋণ, কর্জ ৮৭
০ কালবুন [كلب] -কুকুর ৮৭
০ কালাম [كلام] -কথাবার্তা ৮৭
০ কিতাবিয়্যু [كتابى] -আহ্‌লে কিতাব ৮৮
০ ক্বিরান [قران] -একত্রিত করা, কিরান হাজ্জ ৮৮
০ কিরাবাহ্ [قرابة] -আত্মীয়তা ৮৮
০ ক্বিসমাহ্ [قسمة] -অংশ, বণ্টনযোগ্য বস্তু ৮৮
০ ক্বিসাস [قصاص] -প্রতিশোধ, কিসাস ৮৯
০ কুউ'দ [قعود] -বসা ৮৯
০ কুনূত [قنوت] -কুনূত ৮৯
০ কুফর [كفر] -কুফরী ৮৯
০ কুবলাহ্ [قبلة] -চুমো ৯০
০ কুরআন [قران] -কুরআন মজীদ ৯০
০ কুরাইশ [قريش] -কুরাইশ গোত্র ৯১
০ কুরু [قروء] -হায়েয ৯১

খ

০ খুত্‌বাহ্ [خطبة] -বক্তৃতা, খুত্‌বা ৯৩
০ খুফ্‌ফুন [خف] -মোজা ৯৩
০ খিমার [خمار] -ওড়না ৯৩
০ খিযাব [خضاب] -রঙানো, খিযাব লাগানো ৯৩
০ খিয়ানাত [خيانة] -খিয়ানত ৯৩
০ খাইলুন [خيل] -ঘোড়া ৯৩
০ খাতাম [خاتم] -আংটি ৯৩
০ খামর [خمر] -মাদক দ্রব্য ৯৪
০ খালওয়াহ্ [خلوة] -নিভৃতস্থান, একাকিত্ব ৯৪

গ

- গানাম [غنم] -ছাগল, ভেড়া ৯৬
- গানীমাত [غنيمة] -গানিমাত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ৯৬
- গিনা [غناء] -গান, সংগীত ৯৮
- গুসল [غسل] -গোসল ৯৮
- গুলূল [غلول] -গানিমাতের সম্পদ চুরি করা ৯৮

ছ

- ছাদয়ুন [ثدى] -স্তন ১০০

জ

- জাদ্দুন [جد] -দাদা ১০১
- জাদ্দাতুন [جدة] -দাদী/নানী ১০১
- জিনাইয়াহ্ [جناية] -অপরাধ ১০১
- জানীন [جنين] -গর্ভস্থ সন্তান ১০৬
- জায়িফাহ্ [جائفة] -গভীর ক্ষত ১০৬
- জাল্‌দ [جلد] -চাবুক/বেত ১০৬
- জিযিয়াহ্ [جزية] -জিযিয়া ১০৬
- জিহাদ [جهاد] -জিহাদ ১০৬
- জুমুআহ্ [جمعة] -জুমআ' ১১০
- জুয়ারুন [جوار] -প্রতিবেশী ১১১

ত

- ত'আতুন [طاعة] -আনুগত্য ১১৩
- ত'আমুন [طعام] -খাদ্য ১১৩
- তাওবাহ্ [توبة] -তাওবা ১১৪
- তাওয়াফ [طواف]-চক্রাকারে ঘুরা, তাওয়াফ করা ১১৪
- তাকবীর [تكبير] -তাকবীর, 'আল্লাহু আকবার' বলা ১১৪
- তাক্বীল [تقبيل] -চুমো দেয়া ১১৫
- তাখলীল [تخليل] -খেলাল করা ১১৫
- তাখাল্লু [تخلى] -মলমূত্র ত্যাগ করতে যাওয়া ১১৫
- তাখান্নুছ [تخنس] -নপুংসক হওয়া ১১৫
- তাগরীব [تغريب] -নির্বাসন, দেশান্তর ১১৬
- তাজাস্‌সুস [تجسس] -গোপন অনুসন্ধান/গোয়েন্দাগিরি ১১৬
- তাদাবী [تداوى] -চিকিৎসা করা ১১৬
- তানফীল [تنفيل]-অতিরিক্ত দেয়া, পুরস্কার ১১৬
- তানমিয়াহ্ [تنمية] -বাড়ানো ১১৭
- তাবার্‌রু [تبرع] -দান ১১৭
- তামছীল [تمثيل] -বিকলাঙ্গ করা ১১৭
- তামাত্তু' [تمتع] -কল্যাণ লাভ করা, তামাত্তু' হাজ্জ ১১৭
- তামীমাহ্ [تميمة] -তা'বীজ ১১৭
- তা'যিয়াহ [تعزيه] -সান্ত্বনা প্রদান ১১৮
- তাযাইয়্যুন [تزين] -সৌন্দর্য চর্চা ১১৮
- তা'যীর [تعزير] -শাস্তি প্রদান ১১৮
- তায়ামুন [تيامن] -ডান দিক থেকে শুরু করা ১১৯
- তালবিয়াহ্ [تلبيه] -তালবিয়া ১১৯
- তালাক [طلاق] -তালাক ১২০
- তাহাল্লুল [تحلل] -খুলে ফেলা, হালাল করে নেয়া ১২১
- তাহার্‌রিউন [تحرى] -অনুমান করা, ১২১
- তিজারাহ [تجارة] -ব্যবসা-বাণিজ্য ১২১
- তিফলুন [طفل] -শিশু ১২১
- তিলওয়াত [تلاوة]-তিলাওয়াত,আবৃত্তি ১২১
- ত্বীব [طيب] -সুগন্ধি ১২১

দ

- দাইন [دين] -ঋণ ১২৩
- দাফান [دفن] -দাফন করা ১২৩
- দামুন [دم] -রক্ত ১২৩
- দিয়াত [دية] -দিয়াত বা রক্তপণ ১২৩
- দু'আ [دعاء] -দু'আ, প্রার্থনা ১২৩
- দুবুর [دبر] -নিতম্ব ১২৩

ন

- নাওয়াহ্ [نواح] -বিলাপ, শোকগাঁথা ১২৪
- নাফল [نفل] -নফল, অতিরিক্ত ১২৪
- নাফকাহ্ [نفقة]-খোরপোষ, ভরণ-পাষণ ১২৪
- নাফিলাহ্ [نافلة] -নফল, অতিরিক্ত ১২৫
- নাযর [نذر]-মানত করা,ভেট প্রদান ১২৫
- নার [نار] -আগুন ১২৫
- নাসাব [نسب] -বংশ পরিচয়, পিতার দিকের আত্মীয়-স্বজন ১২৫
- নাসীহাহ্ [نصيحة] -উপদেশ, কল্যাণ কামনা ১২৬
- নিকাহ্ [نكاح] -বিয়ে ১২৬
- নিসাব [نصاب] -নিসাব ১২৭
- নুকূদ [نقود] -নগদ অর্থ, সোনা রূপা ১২৭

ফ

- ফাই [فيء] -ফাই ১২৯
- ফাকরুন [فقر] -দারিদ্র ১২৯
- ফাখযুন [فخذ] -রান, উরু ১৩০
- ফাতিহাহ্ [فاتحة] -সূরা ফাতিহা, মুখবন্ধ ১৩০
- ফাজর [فجر] -সকাল ১৩০
- ফারাইয্ [فرائض] -উত্তরাধিকার আইন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন ১৩০
- ফিতনাহ্ [فتنة]-পরীক্ষা, বিপদ, বিপর্যয় ১৩০
- ফিদ্দাহ্ [فضة] -রূপা ১৩০

ব

- বায়' [بيع] -ক্রয়-বিক্রয় ১৩১
- বাইতুল মাল [بيت المال]-ট্রেজারী ১৩২
- বাইয়াহ্ [بيعة] -বাইয়াত ১৩৩
- বাকারাহ্ [بقرة] -গরু ১৩৪
- বাগইয়ুন [بغى] -বিদ্রোহ ১৩৪
- বিস্‌মিল্লাহ্ [بسملة]-বিস্‌মিল্লাহ্ বলা ১৩৪
- বাদ্‌ভুন [بدو] -বেদুঈন ১৩৫
- বাদাল [بدل]-পরিবর্তন, আদান-প্রদান ১৩৫
- বাহরুন [بحر] -সমুদ্র ১৩৫
- বিলায়াত [ولاية]-পৃষ্ঠপোষকতা ১৩৫
- বুকা [بكاء] -কান্না, কান্নার আওয়াজ ১৩৫
- বুসাক [بصاق] -থুথু ১৩৬
- বিদ'আহ্ [بدعة] বিদআত ১৩৬
- বিদা [وداع] -বিদায় জানানো ১৩৬

ম

- মাউ'ন [ماء] -পানি ১৩৮
- মাওত [موت] -মৃত্যু ১৩৮
- মাগরিব [مغرب]-মাগরিব নামাযের সময় ১৪১
- মাজুস [مجوس] অগ্নি উপাসক ১৪১
- মারআহ্ [مرأة] -মহিলা ১৪১
- মারাদুন [مرض] -অসুস্থতা ১৪১
- মাশ্‌ইউন [مشى] -পায়ে হেঁটে চলা ১৪১
- মাশিয়াহ্ [ماشية] -গৃহপালিত পশু ১৪১
- মাসহুন [مسح] -মাসেহ করা ১৪১
- মাসজিদ [مسجد] -মসজিদ ১৪২
- মা'সিয়াত [معصية] -অপরাধ, গুনাহ ১৪২

- মিনা [منى]-হাজ্জের এক স্থানের নাম ১৪২
- মাকাসাহ্ [مقاصة] -ফিরিয়ে নেয়া ১৪২
- মাহর [مهر] -মোহর ১৪২
- মুছলাহ্ [مثلة]-নাক কান কেটে বিকলাঙ্গ করা ১৪২
- মুবাশারাত [مباشرة] -যৌন মিলন ১৪৩
- মুযদালিফাহ্ [مزدلفة]-মুযদালিফা ১৪৩
- মুযারাআহ্ [مزارعة] -বর্গাচাষ ১৪৩
- মুযিহাহ্ [موضحة] -গুরুতর জখম ১৪৪
- মুস্‌হাফ [مصحف]-কুরআন মজীদ ১৪৪
- মুয়াল্লিফাতুল কুলূব [مؤلفة قلوبهم] - হৃদয় আকৃষ্ট করা ১৪৪

য

- যবাহ্ [ذبح] -যবেহ করা ১৪৫
- যাওজ [زوج] -স্বামী ১৪৫
- যাওজাহ্ [زوجة] -স্ত্রী ১৪৫
- যাকাত [زكاة] -যাকাত ১৪৫
- যাকাতুল ফিতর [زكاة الفطر]-ফিত্‌রা ১৫০
- যামান [ضمان] -জামিন হওয়া, ক্ষতিপূরণ প্রদান ১৫১
- যার্‌ব [ضرب] -প্রহার করা ১৫১
- যাহাব [ذهب] -সোনা ১৫১
- যিকরুল্লাহি তাআলা [ذكر الله تعالى] - আল্লাহ্‌র স্মরণ, যিকির ১৫১
- যিনা [زنا] -ব্যভিচার ১৫১
- যিনাত [زينة] -সৌন্দর্য ১৫৩
- যিম্মাহ্ [ذمة] -নিরাপত্তা, যিম্মাদারী ১৫৩
- যুফ্‌রুন [ظفر] -নখ ১৫৪
- যুল্‌ম [ظلم] -অত্যাচার, যুল্‌ম ১৫৪
- যুহরন [ظهر] -দুপুর, যোহর নামায ১৫৪
- যুহা [ضحى] -দিনের প্রথম প্রহর ১৫৪

র

- রমল [رمل] -তাওয়াফের সময় কাধ উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলা ১৫৬
- রমাদান [رمضان] -রমযান ১৫৬
- রমি [رمى] -নিক্ষেপ করা ১৫৬
- রাজআত [رجعة]-তালাক প্রত্যাহার কর ১৫৬
- রাদ্ [رد] -পুনরাবৃত্তি ১৫৬
- রা'সুন [رأس] -মাথা ১৫৬
- রাহ্‌বাহ [رهبة] -সন্ন্যাস ব্রত ১৫৬
- রাহিম [رحم] -আত্মীয়তা ১৫৭
- রিক্‌কুন [رق] -দাসত্ব ১৫৭
- রিজলুন [رجل] -পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ১৫৯
- রিদ্দাহ্ [ردة] -ফিরে যাওয়া, পরিত্যাগ করা ১৫৯
- রিবা [ربا] -অতিরিক্ত ১৬২
- রুইয়া [رؤيا] -স্বপ্ন ১৬৩
- রুকইয়াহ্ [رقية]-তাবীয, ঝাড়ফুঁক ১৬৪
- রুকূ' [ركوع] -রুকূ' ১৬৪

ল

- লাত্বমুন [لطم] -চপেটাঘাত, থাপ্পর ১৬৬
- লা'ন [لعن] -অভিশাপ দেয়া ১৬৬
- লিওয়াতাত [لواطة]-সমকামিতা, পুং মৈথুন ১৬৬
- লিবাস [لباس] -পোশাক পরিচ্ছদ ১৬৭
- লিসান [لسان] -জিহ্বা ১৬৭
- লিহ্‌য়াহ্ [لحية] -দাড়ি ১৬৭
- লুআব [لعاب] -লালা, থু থু ১৬৭

শ

- শাকুন [شك] -সন্দেহ ১৬৮
- শাজাহ্ [شجة] -মাথায় আঘাত ১৬৮
- শাতাম [شتم] -গালি দেয়া ১৬৮
- শাফাতুন [شفة] -ঠোঁট ১৬৮
- শা'রুন [شعر] -চুল ১৬৮
- শালাল [شلل] -প্যারালাইসিস ১৬৯

○ শাহাদাত [شهادة] -সাক্ষ্য ১৬৯
○ শি'রুন [شعر] -কবিতা ১৭০
○ শুক্‌রুন [شكر] -শোকর করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ১৭১
○ শূরা [شورى] -পরামর্শ সভা, উপদেষ্টা পরিষদ ১৭০

স

○ সগীরুন [صغير] -অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে ১৭৪
○ সরফ [صرف] -আবর্তন, ব্যয় করা ১৭৪
○ সাইদুন [صيد] -শিকার ১৭৪
○ সাওম [صوم] -চরে বেড়ানো ১৭৪
○ সাতর [ستر] -সতর, গোপন করা ১৭৪
○ সাফার [سفر] -সফর, ভ্রমণ ১৭৪
○ সাবিয়্যুন [سبى] -কয়েদী বানানো ১৭৫
○ সবিয়্যুন [صبى] -শিশু ১৭৬
○ সাব্বুন [سب] -গালি দেয়া ১৭৬
○ সামার [سمر] -রাত জেগে কথাবার্তা বলা ১৭৭
○ সায়িমাহ্ [سائمة] -চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো গবাদি পশু ১৭৭
○ সারিকাহ্ [سرقة] -চুরি করা ১৭৮
○ সালবুন [سلب] -ছিনিয়ে নেয়া ১৮১
○ সালাত [صلاة] -রাসূল (সা)-এর ওপর দরূদ পাঠ ১৮১
○ সালাত [صلاة] -সালাত, নামায ১৮২
○ সালাম [سلام] -সালাম, সম্ভাষণ ১৯২
○ সাহাবাহ্ [صحابة] -সাহাবা, সাথী ১৯৩
○ সিদাক [صداق] -মোহরানা ১৯৩
○ সিবগুন [صبغ] -রঙ ১৯৩
○ সিয়াম [صيام] -রোযা, সিয়াম, বিরত থাকা ১৯৩
○ সিয়াল [صيال] -আক্রমণ ১৯৫
○ সিয়াসাত [سياسة] -রাজনীতি, কার্যপ্রণালী ১৯৫
○ সিরাইয়াহ্ [سراية] -অনুপ্রবেশ, সংক্রমণ ১৯৫
○ সিলাহুন [سلاح] -অস্ত্র, হাতিয়ার ১৯৬
○ সুকরুন [سكر] -নেশা ১৯৬
○ সুজূদ [سجود] -সিজদা ১৯৬
○ সুন্নাহ্ [سنة] -সুন্নাত, হাদীসে রাসূল ১৯৬
○ সুবাহ্ [صبح] -সকাল, ভোর বেলা ১৯৬
○ সুল্‌ব [صلب] -মেরুদণ্ড ১৯৭
○ সুলহ্ [صلح] -সন্ধি, আপোষচুক্তি ১৯৭
○ সুহূর [سحور] -সাহ্‌রী খাওয়া ১৯৭

হ

○ হদ [حد] -শরীয়াহ্ নির্দিষ্ট শাস্তি ২০২
○ হুযন [حزن] -চিন্তা, শোক ২০৪
○ হল্‌ফ [حلف] -শপথ, অঙ্গীকার ২০৪
○ হাইওয়ান [حيوان] -জন্তু, হিংস্র পশু ২০৪
○ হাজ্জ [حج] -হাজ্জ ২০৫
○ হাজ্‌ব [حجب] -বাধা সৃষ্টি করা ২০৯
○ হাজর [حجر] -বিরত রাখা ২০৯
○ হাজামাহ্ [حجامة] -শিঙ্গা লাগানো ২১০
○ হাদ্‌যুন [هدى] -কুরবানীর পশু ২১০
○ হাদীস [حديث] -হাদীস ২১০
○ হাম্‌ল [حمل] -গর্ভ ২১০
○ হামীল [حميل] -সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করা ২১০
○ হায়েয [حيض] - ঋতুস্রাব ২১১
○ হিজাব [حجاب] -পর্দা ২১১
○ হিদানাহ্ [حضانة] -সন্তান প্রতিপালন ২১১
○ হিবাহ [هبة] -হিবা, দান করা ২১২
○ হিমা [حمى] -সরকারী চারণ ভূমি ২১৪
○ হিরয্ [حرز] -সংরক্ষিত জায়গা ২১৪
○ হিয়াযাহ [حيازة] -করায়ত্ত করা ২১৫

আ

আওরাতুন [عورة]—লজ্জাস্থান, সতর

জুয়াইর ইবনু আল হুয়াইরাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—'আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুযদালিফায় কাযাহ পাহাড়ে দাঁড়ানো দেখেছি। তিনি লোকদেরকে বলছিলেন—'হে লোক সকল ! তোমরা সাবধান হয়ে যাও।' ঐ সময় আমার দৃষ্টি তাঁর উরুর ওপর পড়লো, সেখান থেকে কাপড় সরে গিয়েছিলো।[১]

আমার [লেখক] মতে যদি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞাতসারে তাঁর উরুর কাপড় সরে গিয়ে থাকে তাহলে একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তিনি উরুকে সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না। আর যদি এটি তাঁর অজ্ঞাতে ঘটে থাকে তাহলে এ থেকে শরঈ কোনো বিধান প্রমাণিত হবে না।

অমুসলিম মহিলা থেকে মুসলিম মহিলাদের সতর ঢেকে রাখা।-[দেখুন, 'হিজাব' শিরোনাম]

আক্বমুন [عقم]—বন্ধ্যাত্ব

বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করার অপরাধ এবং তার শাস্তি।-[দেখুন 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

আতা [عطاء]—অনুদান, ভাতা

'রাষ্ট্র প্রধান [বা ইমাম] কোনো মুসলমানকে রাজস্ব আয় [জিযিয়া, খারাজ, ওশর প্রভৃতি] থেকে যে অংশ নির্দিষ্ট করে দেন, তাকে 'আতা' বলে।

০ আমীরুল মু'মিনীনের ভাতা।-[দেখুন, 'ইমারাত্' শিরোনাম]

০ জনসাধারণকে ভাতা প্রদান এবং সমতা রক্ষা করা।-[দেখুন, 'ফাই' শিরোনাম]

০ গানিমাতের মাল থেকে যে চুরি করে তাকে অনুদান থেকে বঞ্চিত করা।-[দেখুন, 'গুলূল' শিরোনাম]

আ'তীয়াহ্ [عطية]—দান

কোনো বিনিময় গ্রহণ ব্যতিরেকে কাউকে কোনো জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়াকে 'আতীয়াহ্' বলে।

যদি আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াব প্রাপ্তির আশায় আতীয়াহ্ স্বরূপ যা দেয়া হয় তা 'সাদকা' হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি (সওয়াবের নিয়তে দান না করে) আতীয়া গ্রহণকারীর নৈকট্য অর্জনের জন্য তা প্রদান করা হয়, তাহলে তা 'হিবা' হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি কোনো নিয়ত না থাকে, তবু তা 'হিবা'-র পর্যায়ে পড়বে।-[আরো দেখুন-'হিবা' শিরোনাম]

আনআম [أنعام]—গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু

গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত সম্পর্কে।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

আবুন [اب]—পিতা

যদি সন্তানের সম্পদ থেকে পিতার কিছু নেয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি ততটুকুই নিতে পারেন যতটুকু নিলে তার মৌলিক প্রয়োজন মিটে যায়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিতে পারবেন না। একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলো, 'আমার পিতা আমার সব সম্পত্তি শেষ করে দিতে চান।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতাকে ডেকে বলে দিলেন—'তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী নাও।' তিনি উত্তর দিলেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন—'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।' একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'একথার অর্থ, পিতা তাঁর সন্তানের সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাতে পারেন। কাজেই তোমারও সেই কথায় রাজী হওয়া উচিত, যে কথায় আল্লাহ রাজী থাকেন।

১. সন্তানের জন্য পিতার ব্যয়।[২]–[বিস্তারিত দেখুন 'নাফকাহ্' শিরোনাম]

২. পিতার এ অধিকার আছে, ছেলের বউকে তালাক দেয়ার জন্য ছেলেকে বলা।-[দেখুন, 'তালাক' শিরোনাম]

৩. পিতা তার পুত্রের সাথে এমন বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া যে ব্যাপারে শরঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।-[দেখুন, 'তালাক' শিরোনাম]

৪. পিতার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান প্রতিপালন।-[দেখুন, হিদানাহ্ শিরোনাম]

৫. পিতার ইন্তিকালের পর দাদা পিতার মত অংশীদার হওয়া।-[দেখুন, 'ইর্‌ছ' শিরোনাম]

আমানাহ্ [امانة]—আমানত

(বিস্তারিত জানার জন্য 'ওদীয়াহ' শিরোনাম দেখুন)

আ'যল [عزل]—জরায়ুতে বীর্য পৌঁছুতে বাধা দেয়া

পুরুষের বীর্যকে মহিলাদের জরায়ুতে পৌঁছুতে বাধা প্রদান করাকে 'আ'যল' বলে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আযল'-কে মাকরূহ মনে করতেন।[৩] কারণ আযলের উদ্দেশ্য সন্তান জন্মগ্রহণ কমিয়ে আনা কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এর বিপরীত। কারণ, ইসলাম অধিক সন্তানের জন্য উৎসাহিত করেছে।

আবু বকর (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—'আযল' করলেও গোসল ফরয হয়।[৪]

আযহিয়াহ্ [اضحية]—কুরবানী

১. সংজ্ঞা

'আযহিয়াহ' এমন পশুকে বলা হয় যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য আইয়ামে নহর বা যিলহাজ্জ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখ (সন্ধ্যা পর্যন্ত) যবেহ করা হয়।

২. কুরবানীর বিধান

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় হচ্ছে, যে ব্যক্তি কুরবানী দেয়ার সামর্থ রাখে কুরবানী করা তার জন্য সুন্নাত। ওয়াজিব নয়।[৫] সে জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু (অনেক সময়) কুরবানী থেকে বিরত থাকতেন। লোকেরা যেন এ ধারণা করে না বসে, কুরবানী করা ওয়াজিব। কারণ লোকেরা তাঁর পদাংক অনুসরণ করতেন।

আবু সুরাইহ হুযাইফা ইবনু উসাইদ গিফারী বর্ণনা করেন—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে কুরবানী না করতেও দেখেছি, যাতে লোকেরা তাদের দেখাদেখি কুরবানী করাকে বাধ্যতামূলক মনে না করে বসেন।'[৬]

৩. একটি গরু কিংবা উটে সাত ব্যক্তি অংশীদার হতে পারেন। ইবরাহীম নখঈ (রহ) বলেন—'রাসূলের সাহাবাগণের বক্তব্য হচ্ছে, একটি উট কিংবা গরু সাতজনের জন্য যথেষ্ট।'[৭]

আযান [اذان]—আযান, ঘোষণা।

১. সংজ্ঞা

শরঈ পরিভাষায় নির্দিষ্ট কিছু বাক্যের সাহায্যে নামাযের ঘোষণা দেয়াকে আযান বলে।

২. আযান দীন ইসলামের অন্যতম নিদর্শন

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আযানকে দীনের অন্যতম নিদর্শন মনে করতেন। আযান পরিত্যাগ করার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। বরং কোনো শহর বা জনপদে আযান পরিত্যক্ত হওয়া সেখানকার অধিবাসীদের কুফরীর প্রমাণ। যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন, তখন সেনা অফিসারদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, 'মুরতাদদের গর্দান উড়িয়ে দেবে কিন্তু যে জনপদে তোমরা আযানের আওয়াজ শুনবে সেখানে আক্রমণ করবে না, কারণ আযান ঈমানের আলামত।'[৮]

৩. আযানের সময়

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দেবার জন্য মাত্র একজন মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছিলেন।[৯] জুমআর দিন যখন তিনি খুতবা (বক্তৃতা) দেবার জন্য মিম্বারে বসতেন তখন তার সামনে মুয়াযযিন আযান দিতেন।[১০] সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান দেয়া হতো,[১১] -এর আগে দেয়া হতো না।

৪. ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার আযান

ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার আযান দেয়ার শরঈ কোনো বিধান ছিল না বিধায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী খলীফাগণের সময়ে দু' ঈদের নামাযের জন্য আযান দেয়া হতো না।[১২] –[আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনামের ১১নং প্যারা]

৫. আযানের জন্য পারিশ্রমিক না নেয়া

[দেখুন 'ইজারাহ্' শিরোনামের ৩নং প্যারা]

আরদুন [ارض]—জমি, পৃথিবী, মাটি

১. (পবিত্র) জমিনের ওপর সিজদা করা বিছানা বা চাটাইয়ের ওপর সিজদা করার চেয়ে উত্তম।-[বিস্তারিত জানার জন্য 'সালাত' শিরোনাম দেখুন]

২. অনাবাদি জমি আবাদ করা।-[দেখুন, 'ইহ্‌ইয়াউল্ মাওয়াত' শিরোনাম]

৩. জমি বণ্টন করে দেয়া।-[দেখুন 'মুযারাআহ্' শিরোনাম]

আর্‌শ [ارش]—জরিমানা

হত্যা ছাড়া মানব দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিনিময়ে জরিমানা স্বরূপ দেয় সম্পদকে 'আর্‌শ' বলা হয়।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'জিনাইয়াহ্‌' শিরোনাম]

আ'রাফাহ্‌ [عرف]—আ'রাফাত

০ আ'রাফাতে অবস্থান করা হাজ্জের অংশ।-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

০ আরাফাতের দিন হাজীদের রোযা রাখা মাকরূহ।-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

আস্‌র [عصر]-আসর নামায, দিনের শেষ ভাগ

আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর নামায একত্রে আদায় করা।

-[দেখুন-'হাজ্জ' শিরোনাম]

আসির [اسر]—বন্দী করা, কয়েদ করা।

১. সংজ্ঞা

যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত শত্রুকে বন্দী করা।

২. মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া

সম্ভবত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ মতের অনুসারী ছিলেন যে, যুদ্ধবন্দী মুশরিকদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। মা'মার ইবনু আবদুল করীম বলেন, এক মুশরিক যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখা হয়েছিলো যে, এর মুক্তিপণ হিসেবে এই পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে। জবাবে তিনি লিখেছিলেন, 'তার থেকে মুক্তিপণ নেবে না বরং তাকে হত্যা করো।'[১৩]

একবার তিনি বলেছিলেন, 'যদি তোমরা কোনো মুশরিককে গ্রেফতার করে নাও এবং তার মুক্তিপণ হিসেবে দু' মুদ* দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) লাভ করে থাকো তবু তোমরা তা গ্রহণ করবে না। [বরং তাকে হত্যা করে দেবে।][১৪]

সম্ভবত তিনি এ মাসয়ালার ব্যাপারে কুরআন মজীদের এ আয়াতটিকে অনুসরণ করতেন।

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ

'কোনো নবীর জন্য এটি শোভা পায় না, তার কাছে বন্দী থাকবে অথচ দুশমনদেরকে আচ্ছামত শায়েস্তা করবে না।'

তাছাড়া আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো বিধায় তিনি বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে হত্যা করা সমীচীন মনে করতেন।

যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ পেলেন, মুরতাদ সরদার তলীহাহ্‌ আসাদী বন্দী হয়েছে, তিনি সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠালেন— 'মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাও, কোনো ছাড় দিয়ো না। যদি তোমাদের হাতে এমন মুশরিক ধরা পড়ে, যে কোনো মুসলমানকে হত্যা করেছে তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তি দাও [অর্থাৎ হত্যা করো]। তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আল্লাহর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছে তাদের কেউ বন্দী হলে তাকে হত্যা করো।[১৫]

* পরিমাপের এমন এক পাত্রকে মুদ বলে যা দু' রতলের সমান। এক রতল = ৪০ তোলা।

তথ্যসূত্র

১. আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২১৫।
২. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৮১ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫৭৭।
৩. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫৬৭; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৩।
৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫৬৭)
৫. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬১৮।
৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৮১ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৯ ; কাশফুল গুমাহ্, ১ম খণ্ড পৃ-২৩১।
৭. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৬।
৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৫৯ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৮৩।
৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫।
১০. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৭ ; ফতহুলবারী [শরহে সহীহু বুখারীর, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৪।
১১. আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১১৯।
১২. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৫।
১৩. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-১৩০ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৪৫।
১৪. কিতাবুল খারাজ, পৃ-২৩৩।
১৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৮।

ই

ইক্‌তা' [اقطاع]—জায়গীর

যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে মালে গানিমাত হিসাবে প্রাপ্ত জমি থেকে কোনো জমি প্রদান করেন, যে জমির আর কোনো মালিক নেই, তাকে ইক্‌তা বলে।-[দেখুন, 'ইহ্‌ইয়াউল মাওয়াত' শিরোনাম]

ইকতিনায [اكتناز]—গুদামজাত করা

১. সংজ্ঞা

সম্পদ আবর্তিত হওয়ার ধারাকে অসৎ উদ্দেশ্যে বন্ধ করাকে ইকতিনায বলে।

২. ইকতিনাযের বিধান

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পদ ইকতিনাযের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সম্পদের স্বাভাবিক আবর্তনে বাধা সৃষ্টি করাকে তিনি কোনো মতেই জায়েয মনে করতেন না। ইবনু সামুরা বলেন—আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলের মৃত্যুর সময় তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে বার বার বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো। তার রুহ্ কবজ হওয়ার পর আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আপনার ছেলেকে বারবার বালিশের দিকে তাকাতে দেখেছি (এর কারণ কি ?) বালিশ ওঠানোর পর দেখা গেল তার নিচে পাঁচ ছ'টি দীনার। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বার বার হাত কচলে আফসোস করে বলতে লাগলেন—'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি বুঝতে পারি না, বালিশের নিচে এগুলো রাখার অবকাশ তোমার কীভাবে হয়েছে।'[১]

এ আচরণের মাধ্যমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মূলত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই! যে ব্যক্তি এমনভাবে সম্পদ জমা করবে যার ফলে, এক দীনার আরেক দীনারকে স্পর্শ করবে এবং এক দিরহাম আরেক দিরহামকে স্পর্শ করবে তার চামড়া খুলে ফেলা হবে এবং সেখানে প্রত্যেকটি দীনার ও দিরহাম পৃথক পৃথকভাবে রাখা হবে।*

---

* ইবনু কাসীর يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكبرى بها جباههم এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন—এ হাদীসটি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনু মারদুইয়া মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মারফু রিওয়ায়েত করা তার ঠিক হয়নি। আমার [গ্রন্থকার] বক্তব্য হচ্ছে—ইবনু আবী শাইবা তাঁর গ্রন্থ মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবায় এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে রিওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তা হযরত ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদিও সনদে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য কোনো বর্ণনাকারী যবিতা [ضابطه] না হলেও অনেক সময় যবিতার পর্যায়ে গণ্য হয়।-লেখক

ইক্বরার [اقرار]—স্বীকারোক্তি

১. সংজ্ঞা

কোনো মুকাল্লফ* এর দায়িত্বে কোনো অধিকারের স্বীকারোক্তি বা অঙ্গীকারকে 'ইক্বরার' বলে।

২. ইক্বরারের সংখ্যা

প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তার অপরাধ স্বীকার করে, তখন চারবার স্বীকারোক্তি ছাড়া তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আমি সাহাবাদের কোনো মতবিরোধ পাইনি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবা) মায়িজের চারবার স্বীকারোক্তি নেয়ার পর পাথর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করেছিলেন।

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ বা অধিকারের স্বীকারোক্তি করে, যেমন-চুরি কিংবা ঋণ। তাহলে এসব ক্ষেত্রে একবার স্বীকারোক্তি করাই যথেষ্ট। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে—শুধু স্বীকারোক্তির ওপর তিনি এক চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন, চোরাই মাল উপস্থিত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি।[২]

৩. স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা

কেউ যদি তার ওপর কোনো 'হদ' অর্থাৎ আল্লাহর হক এর স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তা প্রত্যাহার করার অবকাশ তার আছে। আদালতের উচিত প্রত্যাহার কাজে তাকে সহযোগিতা করা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চোরকে চুরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন—'তুমি কি চুরি করেছো ?' তারপর নিজেই বলে দিতেন— 'তুমি বলো চুরি করিনি।'[৩] কিন্তু স্বীকারকারী যদি কোনো সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে কেবল স্বীকারোক্তির বলেই তার সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং তা আদায় করা জরুরী হয়ে পড়বে। এখানে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কোনো অবকাশ থাকবে না।

ইকরাহ [إكراه]—অবৈধ বলপ্রয়োগ

১. সংজ্ঞা

কাউকে মানুষকে অন্যায়ভাবে কোনো কাজ করতে কিংবা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বাধ্য করাকে 'ইকরাহ' বলে।

২. ইকরাহ্'র পরিণতি

[২.১] কোন কাজ করতে কিংবা কোনো কথা বলতে কাউকে বাধ্য করা হলে সে কাজ কিংবা কথার জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। বাধ্য হয়ে কোনো কথা বললে তার জন্য যে তাকে দায়ী করা যাবে না তার প্রমাণ হচ্ছে—জবরদস্তিমূলক তালাক কার্যকর না হওয়া। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবা সহ অন্যান্য সাহাবাগণ এ ব্যাপারে একমত। কোনো সাহাবা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪]

---

* বয়সপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান লোক যার জন্য—প্রত্যার্পণযোগ্য সমস্ত যিম্মাদারী পুরো করা অপরিহার্য, তাকে আরবীতে মুকাল্লফ বলে।

কৃত কাজ, যেমন যিনা ইত্যাদি থেকে তার দায় দায়িত্ব শেষ হওয়া। এ ব্যাপারে নাফি' যে রিওয়ায়েত করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। নাফি' বলেন—এক ব্যক্তি কোনো এক গোত্রের লোকদেরকে খাওয়ায় এবং সেই গোত্রের এক মহিলাকে ধর্ষণ করে। যখন এ মামলা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উত্থাপিত হলো, তিনি অভিযুক্তের ওপর হদ জারী করে বেত্রাঘাত করলেন এবং এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। কিন্তু সেই মহিলাকে কিছুই বললেন না।[৫] কারণ, তাকে বাধ্য করা হয়েছিলো। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন, আমার এক মেহমান আমার বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, এজন্য তাকে (অর্থাৎ আমার বোনকে) বাধ্য করা হয়েছে। তিনি মেহমানকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন। মেহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলো। তাকে যিনার শাস্তি দিয়ে 'ফাদাক' এলাকায় এক বছরের নির্বাসন দিলেন। কিন্তু সেই মহিলাকে বেত্রাঘাতও করলেন না কিংবা নির্বাসনও দিলেন না। কারণ—তাকে এ কাজে বাধ্য করা হয়েছিলো। অবশ্য পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই মহিলাকে উক্ত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেন এবং রাতযাপনের ব্যবস্থা করেন।[৬]–[আরো জানতে হলে দেখুন, 'যিনা' শিরোনাম]

[২.২] খলীফা কোনো ব্যক্তিকে তার প্রশাসনের অধীনে কোনো দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন না।-[দেখুন, 'ইমারাত' শিরোনাম]

ইকামাত [اقامة]—নামাযে দাঁড়ানোর ঘোষণা

০ নামাযের জামায়াতের জন্য 'ইকামাত' বলা।

০ ঈদের জামায়াতের জন্য 'ইকামাত' প্রয়োজন নেই।-[দেখুন, 'স্যালাত' শিরোনাম]

ইছবাত [اثبات]—প্রমাণ উপস্থাপন করা

আদালতে কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করাকে ফিক্‌হী পরিভাষায় 'ইছবাত' বলে।

ইছবাতের নিয়ম হচ্ছে বিবাদীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেয়া এবং বাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য উপস্থিত করা। বিবাদী থেকে হলফ নেয়া বাদীর সাক্ষ্যের সাথে সাথে তার কাছ থেকে শপথও নেয়া। আদালতের নিজস্ব অনুসন্ধান এবং মজবুত উপকরণের উপস্থিতি।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'কাযা' শিরোনাম]

ইছবাতের উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাপারে আমরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতামত পাই আবার কিছু ব্যাপারে তাঁর কোনো মতামত (কাওল) পাওয়া যায় না।

ইজারাহ্ [اجارة]—ইজারা, ভাড়া

১. ফিক্‌হী পরিভাষায় ইজারা হচ্ছে—কোনো নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু থেকে এমনভাবে কল্যাণ লাভ করা যাতে মূল বস্তুটি অক্ষুণ্ন থাকে। এবং সেই কল্যাণ শরীআহ্ সম্মত হয়। তা যেন লাভ উপযোগী ও সুনির্দিষ্ট হয় এবং তা থেকে কল্যাণ লাভ উদ্দেশ্য হয়।

২. উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইজারা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিনিময় বা ভাড়া নির্দিষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন।

কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু খাদ্য ও পোশাকের বিনিময়ে কারো থেকে শ্রম নেয়া বৈধ মনে করতেন। যদিও খাদ্য ও কাপড় কোনোটির পরিমাণ নির্দিষ্ট না হয়। তিনি নিজেও ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করেছেন।[৭] দাই কর্তৃক দুধ পান করানোর বিনিময় গ্রহণের ব্যাপারটির ওপর সম্ভবত তিনি কিয়াস করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুছেন। ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে দাই থেকে দুধ পান করানোর ব্যাপারটি স্বয়ং আল্লাহ্ ফায়সালা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

"যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বাচ্চার পিতার।"–(সূরা আন নিসা)

আবার এমনও হতে পারে, তিনি এ মূলনীতি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু ভাত কাপড়ের বিনিময়ে দীর্ঘ আট বছর শুআইব আলাইহিস সালামের কাছে শ্রম প্রদান করেছেন। আর একথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, যতোক্ষণ সুস্পষ্ট নিষেধ পাওয়া না যাবে ততোক্ষণ পূর্ববর্তী নবীদের শরীআহ্ আমাদের জন্যও শরীআহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. একটি কথা সুস্পষ্ট যে, তিনি দীনি বিষয়ে (যেমন—আযান, নামাযের ইমামত প্রভৃতির ক্ষেত্রে) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ দানকে বৈধ মনে করতেন না। ইবনু হাযম (রহ) বলেন—হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—আযান দেয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। কোনো সাহাবা ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি।[৮] ইবনু হাযম (রহ) আল মুহাল্লীর মধ্যে আরো লিখেছেন—সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোট ছেলেমেয়েকে শিক্ষা প্রদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া অপসন্দ করতেন। এমনকি একে তারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে করতেন।[৯]

বণ্টনযোগ্য কোনো বস্তু বণ্টন করে দিয়ে তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জায়েয মনে করতেন না।–[দেখুন, 'কিসমাহ্' শিরোনাম]

ইত্‌লাফ [اتلاف]—বিনষ্ট করে দেয়া

১. সংজ্ঞা

কোনো জিনিসকে এমন অবস্থায় পৌঁছে দেয়া, যা আর ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না। যা থেকে আর কেউ উপকৃত হতে পারে না। তাকে ইতলাফ বলে।

২. ইতলাফের বিধান

কোনো জিনিষের ইতলাফের জন্য নিম্নোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হয়।

[২.১]. ক্ষতিপূরণ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের ক্ষতিপূরণ দাবী করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া অপরিহার্য।

[২.১ক]. ক্ষতিগ্রস্ত জিনিস সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে। চুলের গোছা কিংবা লাশের কোনো ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা এগুলো সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[২.১খ]. মালিকের মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় কোনো বস্তু বিনষ্ট করা হলে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তবে যদি কোনো মুসলমানের কাছে মাদকদ্রব্য থাকে আর তা কোনো মুসলমান কিংবা কোনো খৃস্টান কর্তৃক বিনষ্ট হয় তাহলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। কারণ, মাদকদ্রব্য মুসলমানের কাছে সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। কাজেই তার কোনো মূল্যও নির্ধারণ করা যেতে পারে না।

[২.১গ]. সম্পদ যে বিনষ্ট করবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্ব তার। এ জন্য কোনো পশু যদি কারো সম্পদ নষ্ট করে দেয় তার ক্ষতিপূরণ নেই। কারণ, তার ওপর ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্ব চাপানো যায় না। কিন্তু যদি কোনো শিশু, পাগল অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির দ্বারা নষ্ট হয় তবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। কেননা ক্ষতিপূরণ দেয়ার সামর্থ তাদের আছে। যদিও কিছু অপূর্ণাঙ্গতা তাদের মধ্যে রয়েছে।

[২.১ঘ]. বিনষ্টের পেছনে কিছু কল্যাণও নিহিত থাকে। এজন্য যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত প্রতিপক্ষের অথবা বিদ্রোহীদের হাতে মুসলমানদের কোনো সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে কিংবা যুদ্ধের সময় মুসলমানদের দ্বারা তাদের কোনো সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। কারণ, যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ বা বিদ্রোহীদের দমন করতে না পারলে তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেয়াও সম্ভব নয়। আর কোনোরূপ কল্যাণও লাভ করা যাবে না।

[২.২]. শাস্তি ঃ কখনো কখনো ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সাথে শাস্তিও প্রদান করা হয়। আবার কখনো ক্ষতিপূরণ না নিয়ে শুধু শাস্তি দেয়া হয়। যেমন হত্যা কিংবা কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করার বিনিময়ে হয়ে থাকে। অনেক সময় শুধু ক্ষতিপূরণ নেয়া হয়। যেমন—ভুলে কাউকে হত্যা করে ফেললে কিংবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করে দিলে অথবা সম্পদ বিনষ্ট করা হলে।

৩. সম্পদ অথবা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করার বিনিময়ে অনেক সময় তা'যীর [অনির্দিষ্ট শাস্তি] প্রদান করা।-[দেখুন, 'তা'যীর' ও 'সারিকাহ্' শিরোনাম]

৪. যুদ্ধের সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে পশু-পাখী, ফল-ফসল ও বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা নিষেধ।-[দেখুন, 'জিহাদ' শিরোনাম]

ই'তরাহ্ [عترة]—সন্তান, আত্মীয়স্বজন

মানুষের নিকটতম আত্মীয়কে আরবী ভাষায় 'ইতরাহ্' বলে। এ জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইতরাহ্'।[১০] সামাজিক জীবনে মানুষ সবচেয়ে কাছের আত্মীয়-স্বজনদের দিয়েই উপকৃত হয় এবং সাহায্য লাভ করে থাকে। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যারা তাদের জানমাল তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তারা সবাই তাঁর 'ইতরাহ্'। কেননা তারাই সবচেয়ে বেশী তাঁর উপকার করেছেন এবং সবার আগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাকীফায়ে বানু সা'আদাহ্ [যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনের জন্য আনসার ও মুহাজির সাহাবীবৃন্দ জমায়েত হয়েছিলেন এবং যেখানে সকলের সম্মিলিত রায়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন—অনুবাদক]-এর দিন বলেছিলেন—আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের ইতরাহ্, আমাদের মধ্যে যাদের মাঝে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। ডিম ফুটে যেমন বাচ্চা বের হয় তেমনি তিনি আমাদের মাঝে জন্মগ্রহণ করে আমাদের চারপাশে সারা আরব ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেমন যাতা তার কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে থাকে।[১১]

ই'তিকাফ [اعتكاف]—ইতিকাফ

১. আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির নিমিত্তে মসজিদে অবস্থান করার নাম 'ই'তিকাফ'।

২. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন মসজিদে ই'তিকাফ করতেন তখন তিনি মসজিদে বসেই ওযু করতেন।[১২]

ইদ্দাতুন [عدة]—ইদ্দত, হিসেব করা

১. সংজ্ঞা

কোনো মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামী মারা গেলে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ প্রতীক্ষিত সময়ের নাম 'ইদ্দত'।

২. তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত

[২.১] যখন কোনো পুরুষ ও মহিলার আক্‌দ হয়ে যাওয়ার পর তারা কোনো নির্জন জায়গায় একান্তে মিলিত হয় তখন মোহর পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এরপর যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়, ইদ্দত পালন করা মহিলার ওপর ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)। যৌন মিলন হোক বা না হোক।[১৩]

[২.২] তালাকের ইদ্দত তিন কুরূ' (হায়েয)। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ.

"আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা নিজেকে তিন কুরূ' পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

এ আয়াতে কুরূ' [قُرُوْءٍ] অর্থ হায়েয বা মাসিক।[১৪]

[২.৩] ব্যভিচারী মহিলার জন্য কোনো ইদ্দত নেই। কারণ, ইদ্দত পালন করা হয় বংশধারা সংরক্ষণের জন্য। ব্যভিচারের দ্বারা বংশগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না[১৫] তবু সে অন্যত্র বিয়ে বসতে চাইলে একটি মাসিক পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করে জরায়ু পরিষ্কার করে নেবে।

-[দেখুন, 'যিনা' শিরোনাম]

৩. ইদ্দত পালনরত মহিলা ও স্বামীর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়া।

–(দেখুন–'ইর্‌ছ' শিরোনাম)

ইনজাব [انجاب]—সন্তান জন্মদান করা

কারো বিরুদ্ধে এমন অপরাধ সংঘটিত করা, যার ফলে সে সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে যায় এবং তার ক্ষতিপূরণ।–(দেখুন–'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম)

ইফতার [افطار]—রোযা ভাঙ্গা

১. রমযানে ইফতারের উত্তম সময় কোনটি ?-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

২. ইফতারের সময়।-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

ইফরাদ [افـــــراد]—কেবল হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাধা, একাকী হওয়া

মুফরাদ হাজ্জ করা।-[বিস্তারিত দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

ইফলাস [افلاس]—দেওলিয়া হওয়া

যদি কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় এবং তার ঋণের পরিমাণ সম্পদের চেয়ে বেশী হয়। সমস্ত সম্পদ বিক্রি করেও যদি ঋণ পরিশোধ করা না যায় তাকে 'ইফলাস' বা 'দেওলিয়া হওয়া' বলে।-[দেখুন, 'দাইন' শিরোনাম]

ইবন [اِبن]—ছেলে

[বিস্তারিত জানার জন্য 'ওয়ালাদ' শিরোনাম দেখুন।]

ইবিল [ابل]—উট

১. উটের যাকাত।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

২. কুরবানীর জন্য হেরেমে পাঠানো একটি উট সাতজন অংশীদারের জন্য যথেষ্ট।-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

ঈদুল আযহার কুরবানীর জন্যও একটি উটে সাতজন অংশীদার হতে পারে।-[দেখুন, 'ঈদুল আযহা' শিরোনাম]

৩. দিয়াতের (বা রক্তপণের) বিনিময়ে দেয় উটের সংখ্যা।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

৪. এমন ক্ষত যাতে ক্ষতস্থানের হাড় দৃষ্টিগোচর হয়, তার দিয়াত হিসেবে দেয় উটের পরিমাণ।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

জায়িফাহ্ বা বল্লমের ক্ষত যদি পেটের গভীরে পৌঁছে যায়, তার দিয়াত হিসেবে দেয় উটের পরিমাণ।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

ই'মামাহ্ [عمامة]—পাগড়ি

০ ওযুর সময় পাগড়ির ওপর মাসেহ করা।-[দেখুন, 'ওযু' শিরোনাম]

০ মৃত ব্যক্তিকে পাগড়ী না পরানো প্রসঙ্গে।-[দেখুন-'মাওত' শিরোনাম]

ইমামাত [امامة]—খিলাফত, ইমামত

০ ইমামত অর্থ খিলাফত।-[দেখুন, 'ইমারাত' শিরোনাম]

০ নামাযের ইমামত।-[দেখুন 'সালাত' শিরোনাম]

ইমারাত [امارة]—নেতৃত্ব, ইখতিয়ার

১. ইমারাতের তাৎপর্য

[১.১] হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে নেতৃত্বের সংজ্ঞা হচ্ছে—কোনো ব্যক্তিকে এতটুকু ক্ষমতা অর্পণ করা যার সাহায্যে সে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারে। আর জনসাধারণের দায়িত্ব হচ্ছে-কল্যাণকর কাজকে পূর্ণতার দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্য নেতাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা এবং তাঁর আনুগত্য করা।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমারাতের এ তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য এক স্বল্প শিক্ষিত মহিলাকে একটি উপমা দিয়েছিলেন। সেই মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"নেতা (ইমাম) কাকে বলে ?" তিনি বললেন—"তোমাদের কাওমে সরদার বা সম্ভ্রান্ত কেউ নেই, তোমরা যার অনুসরণ করো এবং যার নির্দেশ মেনে চলো ?" মহিলা উত্তর দিলেন—"কেন থাকবে না।" তিনি বললেন—"ব্যস্ ! এ ধরনের লোকদের মত লোকই হচ্ছে নেতা।"[১৬]

[১.২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে খলীফাতুল্লাহ্ [আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি] বলতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এ কথার সাথে একমত হয়েছিলেন যে, তাকে বড়ো জোর খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ্ [আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতিনিধি] বলা যেতে পারে। কারণ, মানুষ মানুষের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সত্তা চিরন্তনী, তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষীও নন, এজন্য যখন তাঁকে 'খলীফাতুল্লাহ্' বলে ডাকা হতো তখন তিনি বলতেন—'আমি খলীফাতুল্লাহ্' নই বরং 'খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ্' বলে সম্বোধন করলে খুশী হবো।[১৭]

২. খলীফা কুরাইশ বংশীয় হওয়া

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো খিলাফতের দায়িত্ব কুরাইশদের ওপরই থাকা উচিত, তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার [اَلْخِلَافَةُ فِىْ قُرَيْشٍ-খিলাফত কুরাইশদের মধ্যে] ওপর আমল করা হবে। আর একথা তো সর্বজনবিদিত যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু' আনহু মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সামনে এ হাদীস বর্ণনা করে তাদের ভেতরের সমস্ত মতপার্থক্য দূর করে দিয়েছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর ইন্তিকালের পর সৃষ্টি হয়েছিলো। অর্থাৎ তার ইন্তিকালের পর এখন নামায ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে কে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন ? এ হাদীস শুনে আনসারগণ চুপ হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কুরাইশদের ওপর ছেড়ে দিলেন।

একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, খিলাফত কুরাইশদের মধ্যে ততোদিন থাকবে, যতোদিন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—'খিলাফত কুরাইশদের মধ্যে ততোদিন থাকবে যতোদিন তারা আল্লাহ্‌র অনুগত থাকবে এবং তাঁর নির্দেশ পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে।'[১৮]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, খিলাফত নিঃশর্তভাবে কুরাইশদের মধ্যে থাকবে এটা কোনো চূড়ান্ত কথা নয়। শুধু ততোদিনই থাকতে পারে যতোদিন তাদের মধ্যে প্রজাদের ওপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অন্যদের চেয়ে বেশী থাকবে। যদি তারা এতে অপারগ হয়ে যায় অথবা তাদের চেয়ে কেউ বেশী এগিয়ে আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশী যোগ্যতার পরিচয় দেয়, তবে খিলাফত কুরাইশদের থেকে তার কাছে চলে যাবে।

৩. একাধিক খলীফা হওয়া

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা খলীফার সংখ্যাধিক্য এবং তার ভয়াবহতা সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন, এ ধরনের কাজের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আর আল্লাহ্‌র দীনের মধ্যে এর কোনো অবকাশও নেই। একবার তিনি

এক ভাষণে [খুতবায়] বলেছিলেন—এতো জায়েয হতে পারে না যে, মুসলমানের নেতা (খলীফা) দু'জন হবেন। এরূপ হলে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন ধরে যাবে এবং তাদের একতা ধ্বংস হয়ে যাবে। পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবে। সুন্নাতের পথ ছেড়ে তারা বিদআতের পথে পরিচালিত হবে। গোটা সমাজ এক মহা বিপর্যয়ে পতিত হবে, পরিত্রাণের আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকবে না।[১৯]

৪. খলীফার কতিপয় দায়িত্ব কর্তব্য

[৪.১] খিলাফত [নেতৃত্ব] লাভ করার জন্য কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টা করা কিংবা মনে মনে আশা পোষণ করা কোনো মুসলিমের উচিত নয়। এটি এমন এক পদ যেখানে পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যখন একদিকে জনসাধারণ এবং অপরদিকে প্রশাসনের মধ্যে মতবিরোধ বা তিক্ততা সৃষ্টি হয়। তখন প্রশাসকের হাত জনগণকে দমন করার জন্য প্রসারিত হয়ে যায়। হযরত রাফি' তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"একবার আমি এক মুজাহিদ বহিনীতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। যখন আমরা ফিরে এসে যার যার বাড়ীর দিকে রওয়ানা দেবো তখন আমি বললাম। এক ব্যক্তি (অর্থাৎ আমি) আপনার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রইলো, এখন পৃথক হওয়ার পালা, এখনো আপনি ভালো ও কল্যাণের এমন কোনো কথা বললেন না, যা তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আপনি বলুন, তবে বক্তব্য বেশী দীর্ঘ করবেন না যেন আমি ভুলে না যাই।" তিনি বললেন—"আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন ! আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন ! আল্লাহ্ তোমার ওপর বরকত অবতীর্ণ করুন ! আল্লাহ্ তোমার ওপর তাঁর অগণিত বরকত অবতীর্ণ করুন ! ফরয নামায সময় মত আদায় করবে, সানন্দে যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ্য় হাজ্জ করবে। জেনে রেখো হিজরত করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, আর হিজরত করে জিহাদে অংশগ্রহণ করা আরো উত্তম কাজ। আরেকটি কথা স্মরণ রাখবে—কখনো আমীর বা শাসক হবে না।" আমি বললাম—"নামায, রোযা, হাজ্জ, হিজরত এবং জিহাদ সম্পর্কে আপনি চমৎকার কথা বলেছেন এবং আমি তা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি কিন্তু আপনি আমাকে শাসনকর্তা হতে নিষেধ করলেন তা আমার বুঝে এলো না। কেননা আমি মনে করি বর্তমানে—যারা শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারা আপনাদের মধ্যে [অর্থাৎ সাহাবাদের মধ্যে] উত্তম ব্যক্তি।" অতপর তিনি বললেন—তুমি আমাকে বলেছিলে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করতে কিন্তু এখন তোমার প্রশ্নে বক্তব্য বিশদভাবে বলার প্রয়োজন হয়ে দেখা দিচ্ছে। শোন ! এ ইমারাত [নেতৃত্ব] এখনো তোমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু খুব সম্ভব তা কঠিন অবস্থার দিকে যাচ্ছে। ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হবে, ফলে অযোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। তাছাড়া একথাও জেনে রেখো, যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভ করবে তার হিসাব কিয়ামতের দিন সাধারণ লোকের চেয়ে কঠিন এবং দীর্ঘ হবে। আল্লাহ্র কাছে অন্যদের চেয়ে সহজেই সে শাস্তির জন্য ধরা পড়ে যাবে। কেননা ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করার চেয়ে ঈমানদারদের সাথে যুলম করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমানদারদের সাথে যুলম করলো সে যেন আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলো। ঈমানদারগণ হচ্ছেন আল্লাহ্র পাড়া প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর কোনো ছাগল বা উট কিছু হয়ে গেলে সেও তার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করে রাত কাটায় এবং বলতে থাকে আহারে আমার প্রতিবেশীর ছাগল! আহারে আমার প্রতিবেশীর উট!! তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর প্রতিবেশীদের ওপর যুলমের জন্য রেগে যান।[২০]

[৪.২] খলীফার এমন কোনো পোশাক পরা উচিত নয়, যাতে অন্যদের থেকে তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র মনে হয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ তাঁর পরবর্তী খলীফাদের মধ্যে কারো স্বতন্ত্র কোনো পোশাক ছিল না, যাতে অন্যদের চেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়। যয়নব বিনতে মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—হাজ্জে যাচ্ছিলাম, আমার সাথে আরো একজন মহিলা ছিলো। তাবু লাগানোর পর আমি মানত করেছিলাম, কারো সাথে কোনো কথা বলবো না। এক ব্যক্তি আমাদের তাবুর দরযার কাছে এসে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বললেন। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমার সফরসঙ্গী তার সালামের জবাব দিলেন। তিনি বললেন—'তোমার সাথীর কী হয়েছে, তিনি তো সালামের জবাব দিলেন না।' বলা হলো —'তিনি মানত করেছেন, কারো সাথে কোনো কথা বলবেন না।' একথা শুনে তিনি বললেন —'এ ধরনের মানত ছেড়ে দাও এবং কথাবার্তা বলো, এ ধরনের মানত করাতো জাহিলি যুগের কাজ।' একথা শুনে আমি বললাম—'আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি কে?' তিনি বললেন—'আমি মুহাজিরদের একজন।' 'মুহাজিরদের কোন্ গোত্রের লোক'—আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন—'কুরাইশ গোত্রের।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম —'কুরাইশদের কোন্ বংশের লোক?' তিনি বললেন—'তুমি তো কম্বলের লোম বেছে ছাড়বে,* আমি আবু বকর।' একথা শুনে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—'হে আল্লাহ্‌র খলীফা! জাহিলিয়াত থেকে সবে আমরা মুক্তি পেয়েছি, এজন্য এখনো আমরা একে অন্যকে ভয় পাই। এখন আল্লাহ্ আমাদের জন্য ইসলামী শরীআহ্ অবতীর্ণ করে দিয়েছেন যার কারণে চতুর্দিকে শান্তি ও কল্যাণ, যা আপনি দেখছেন। কিন্তু আমাকে বলতে পারেন কি এ শান্তি ও কল্যাণের ধারা কতদিন অব্যাহত থাকবে?' বললেন—'যতদিন তোমাদের দায়িত্বশীলগণ ঠিক থাকবে।' আমি প্রশ্ন করলাম-'নেতা বা দায়িত্বশীল হন কারা?' বললেন—'তোমাদের গোত্রে সরদার নেই, যার কথা মানা হয়?' 'আমি বললাম-কেন থাকবে না!'। তিনি বললেন—ব্যস, নেতা বা দায়িত্বশীলও ঐ ধরনের।"[২১]

আমরা এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট জানতে পারি, ঐ মহিলা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিনতে পারেননি। যদি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো বিশেষ পোশাক পরতেন তাহলে ঐ মহিলা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারতেন।

[৪.৩] খলীফার জন্য জরুরী তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য হচ্ছে—"যাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কোনো দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবকে বাস্তবায়ন না করেন, তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত।"[২২] কারণ, খলীফা যতোক্ষণ সোজা রাস্তার (ইসলামের) ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততোক্ষণ অন্যেরাও সোজা রাস্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যদি খলীফা এদিক সেদিক করেন তবে সাধারণ মানুষও এদিক সেদিক করা শুরু করে দেবে।

এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী শরীআহ্‌র মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তা কতদিন পর্যন্ত ঠিকঠাক মত চলবে?" তিনি উত্তর দিলেন—"তোমরা

* এটি একটি আরবী প্রবাদের বাংলা প্রবাদ অনুবাদ, উর্দুতে বলা হয়—'বাল কা খাল নিকালনা' অর্থাৎ কোনো বিষয়ে চুল-চেড়া জিজ্ঞাসাবাদ।-(অনুবাদক)

ততোদিন ঐ শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতোদিন তোমাদের নেতাগণ তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।"[২৩]

[৪.৪] খলীফা থাকবেন দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ত এবং সাদাসিদা জীবনের অধিকারী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সামনে নিচের কবিতা দু'টো আবৃত্তি করলেন—

[৪.৪ক] দীন বেশে ঘুরে বেড়ান যে শাসক সদা,
তার চেয়ে নম্র ও ভদ্র কে আছে কোথা ?

[৪.৪খ] দেখো তার অনাহারেও সৌন্দর্য অপার
তারাইতো কল্যাণ এই দীন দুনিয়ার।[২৪]

[৪.৫] খলীফার জন্য এটিও প্রয়োজন, তিনি দুর্বলের সঙ্গ দেবেন যাতে সে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এবং মযলুমের ডাকে সাড়া দেবেন, যেন সে তার অধিকার ফিরে পায়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলীফা হওয়ার পর প্রথম ভাষণেই তিনি এ কথার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"তোমাদের দৃষ্টিতে যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল, যতোক্ষণ তার থেকে অধিকার আদায় করে না নেবো, আর যে তোমাদের নিকট দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী যতোক্ষণ তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারবো।"[২৫]

[৪.৬] খলীফার অন্যতম দায়িত্ব, তিনি নিজে সর্বপ্রথম ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণ অনুসারী হবেন। তার পদ কখনো তাকে এ অনুমতি দেয় না যে, আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিতেন। একদিন তিনি একজনকে একটি চড় মেরেছিলেন। পরে তাকে ডেকে বললেন—"তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।" কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে মা'ফ করে দিলেন।[২৬]

একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাতের উট বণ্টনের জন্য গেলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন—অনুমতি ছাড়া কেউ যেন আমাদের কাছে না আসে। এক মহিলা তার স্বামীকে বললো—"যাকাতের উট বণ্টন করা হচ্ছে এ লাগামটি নিয়ে সেখানে যান। আল্লাহ্ হয়তো আপনাকে একটি উটের ব্যবস্থা করে দেবেন।" সেই ব্যক্তি [স্ত্রীর কথা মতো] সেখানে গেলো। দেখলো, তারা দু'জন উটশালায় চলে গেছেন। সেও তাদের সাথে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছন ফিরে তাকে দেখে বললেন—'এখানে আমাদের কাছে কেন এসেছো ?" একথা বলে রেগে গিয়ে তার হাত থেকে লাগাম নিয়ে তাকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন বণ্টন কাজ শেষ তখন তাকে ডেকে এনে তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন—"তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।" একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠলেন—"না, আল্লাহ্‌র কসম ! আপনার থেকে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। আপনি খলীফা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়ম চালু করবেন না।" হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট আমার পক্ষ থেকে কে জামিন হবে ?" তিনি জবাব দিলেন—"আপনি তাকে খুশী করে দিন।" তখন

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন, তাকে হাওদা সহ একটি উট, একটি চাদর এবং ৫টি স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) দিয়ে দাও। এভাবে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করে নিলেন।[২৭]

[৪.৭] খলীফা তাঁর পূর্ববর্তী খলীফার দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কারণ, পূর্বের খলীফা নিজের ওপর যে দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন তা নিজের কারণে নেননি বরং খলীফা হিসেবেই নিয়েছিলেন।

একথার প্রমাণ, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হলো, তখন বাহ্‌রাইন থেকে কিছু সরকারী সম্পদ মদীনায় এসে পৌঁছুলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করে দিলেন—"যার কোনো জিনিস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিম্মায় ছিলো কিংবা তিনি যদি কাউকে কিছু দেবার ওয়াদা করে থাকেন তবে তারা এসে তাদের মাল বুঝে নিতে পারে।" হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন —"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যাদ বাহ্‌রাইন থেকে সরকারী মাল আসে তবে তোমাকে তিন 'মুঠো' ভরে দেবো।" হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন—"যাও পুরোপুরি তিন মুঠো ভরে নিয়ে নাও।" যখন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু তিন 'মুঠো' ভরে নিলেন, দেখা গেল পাঁচশ' দিরহাম হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন—"তাকে পুরোপুরি এক হাজার দিরহাম দিয়ে দাও।" অতপর লোকদের মধ্যে দশ দিরহাম করে অবশিষ্ট মাল বণ্টন করে দিলেন এবং বললেন—এ হচ্ছে সেই ওয়াদা যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে করেছিলেন।[২৮]

[৪.৮] খলীফার সর্বোত্তম হিকমত হচ্ছে নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা। কেননা তাঁর অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ কোনো বড়ো ধরনের অসুবিধায় পড়ে যেতে পারে। কেননা খলীফার প্রতি জনসাধারণের যে অনুরাগ থাকে, তার কোনো প্রতিনিধির ওপর সে রকম নাও থাকতে পারে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কয়েকটি সৈন্য দল গঠন করলেন তখন তিনি তাদের সাথে 'যুল কাচ্ছা' পর্যন্ত গেলেন। যা মদীনা থেকে দু' মারহালা* দূরত্বে অবস্থিত। তাঁর ইচ্ছে ছিলো নিজেই সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে মদীনায় ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাদের বক্তব্য ছিলো আপনার অনুপস্থিতিতে মদীনার জনসাধারণ কষ্ট অনুভব করবেন। পরিশেষে তিনি তাদের কথা মেনে নেন এবং নিজ হাতে ঝাণ্ডা তৈরী করে এগারোজন সেনাপতির হাতে তুলে দেন।[২৯]–[আরো জানার জন্য 'জিহাদ' শিরোনাম দেখুন]

[৪.৯] খলীফা সরকারী কাজের জন্য নিজের সময় ও শ্রমকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করবেন। অন্য কোনো কাজ বা ব্যবসা এ সময় তিনি করতে পারবেন না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরের দিন সকাল বেলা বাজারে যাচ্ছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় যাচ্ছেন ?" জবাব দিলেন—"বাজারে।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন। "আপনার কাধে এমন এক দায়িত্ব এসে চেপেছে যে, আপনাকে আর [ব্যবসার জন্য] বাজারে যেতে দেবে না"—

* ভ্রমণকারীরা যতোদূর ভ্রমণ করে যাত্রা বিরতি করতো তাকে 'মারহালা' বা মনজিল বলা হতো।–(অনুবাদক)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আৎকে ওঠে বললেন—"সুবহানাল্লাহ্ ! এই যিম্মাদারী কি আমার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন থেকেও ফিরিয়ে রাখবে ?" ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—"আমরা আপনার জন্য ন্যায় সঙ্গত ভাতার ব্যবস্থা করে দেবো।"[৩০] যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন নিজের টাকা দিয়ে ব্যবসাও করা যাবে না তখন সমস্ত টাকা পয়সা বাইতুলমালে জমা করে দিলেন এবং বললেন—"আমি এ টাকা দিয়ে ব্যবসা করেছি এবং আমার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছি, যখন আমি তাদের খলীফা হয়েছি তখন তাদের দায়িত্বই আমাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করা থেকে বিরত রাখলো।"

[৪.১০] খলীফার দায়িত্ব–কর্তব্যের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করবেন এবং বিভিন্ন কাজে তাদের সহযোগিতা নেবেন। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

ক. পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসক বা গভর্নরকে তাদের স্বপদে বহাল রাখা। হাঁ, যদি কোনো ফরয আদায়ের বেলায় তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করেন অথবা কোনো খিয়ানত করেন অথবা এ ধরনের নৈতিক অবক্ষয়ে জড়িয়ে পড়েন তাহলে অপসারণ করা যেতে পারে। শুধু পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর কারণে তাদেরকে অপসারণ করা যেতে পারে না। খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনু আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তাঁর তিন চাচা [খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সংবাদ পেয়ে নিজেদের দায়িত্ব ছেড়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে একথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়োগ কৃত কর্মকর্তাদের চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারেন ?[৩১]

খ. সরকারী দায়িত্বে নিয়োগ করার জন্য এমন লোককে তিনি নির্বাচন করবেন যিনি আদল ইনসাফের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ এবং অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে যোগ্যতাসম্পন্ন। তাছাড়া তাঁর ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণেরও মতামত নেয়া উচিত। যাতে তাদের মনোভাব জানা যায়। কারণ খলীফা যদি তার সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর না নেন, তাহলে অনেক সময় তা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। এজন্যই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসুখ যখন বেড়ে গেল তখন প্রথমে হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন, তারপর হযরত ওসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাঈদ ইবনু যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসাইদ ইবনু হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরদেরকে ডেকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। অবশ্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তাদের সবার চেয়ে তিনি বেশী জানতেন। অতপর যখন সকল মনীষীবৃন্দ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন তখন খিলাফতের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করলেন।[৩২] [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন—'শূরা' শিরোনাম] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগের জন্য উত্তম ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তার চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া বৈধ মনে করতেন। এর মধ্যে অবশ্যই কিছু প্রজ্ঞার পরিচয় আছে যা সামনে বর্ণনা করা হবে।–('ইমারাত' শিরোনামের ঘনং প্যারা দ্রষ্টব্য)

গ. তিনি কোনো কাজের জন্য কখন এমন কাউকে নিয়োগ দেবেন না যার অন্তরে সেই কাজের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কারণ, পূর্ব অভিজ্ঞতা এমন একটি ভিত্তি যার কারণে কাজটি সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন—কাকে বাহ্‌রাইনের গভর্নর করে পাঠানো যায় ? হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন—'হযরত আলা ইবনু হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানো হোক। যাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পাঠিয়েছিলেন। যার প্রচেষ্টায় সেখানকার লোক মুসলমান হয়েছে এবং ইসলামী হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তাছাড়া আলা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানকার লোকদেরকে জানেন এবং তারাও তাকে ভালোমত চেনেন। উপরন্তু ভৌগলিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পরামর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন—'আবান ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে। কেননা আবান সেখানকার লোকজনের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' কিন্তু আবান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। এজন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পীড়াপীড়ি করতে চাইলেন না। বললেন—'আমি এমন ব্যক্তিকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাধ্য করবো না যিনি বলে দিয়েছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমি আর কারো অধীনে কাজ করবো না।' এসব কথাবার্তার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন—আলা ইবনু হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহ্‌রাইনের গভর্নর করে পাঠাবেন।[৩৩]

ঘ. তিনি কোনো কাজের জন্য বিশেষ মর্যাদাবান কাউকে নিয়োগ করতেন না। যেন তারা উপহাসের পাত্র হয়ে না দাঁড়ান এবং ব্যবস্থাপনার কোনোরূপ ত্রুটি করে বসেন। কারণ, এরূপ করা হলে লোকেরা বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এটি এমন এক ক্ষতি যা পূরণ করার কোনো উপায় নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার বলা হলো—'হে রাসূলের খলীফা ! আপনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদেরকে কেন প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেন না ?' তিনি প্রতি উত্তরে বললেন—'আমি তাদের মাহাত্ম ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু আমি চাই না তাদের শরীর পার্থিব কাজে ধুলোমলিন করি।'[৩৪]

ঙ. তিনি যখন কাউকে কোনো দায়িত্ব দেবেন তখন তাকে নসীহত করবেন এবং সেই বিষয়ে জরুরী পরামর্শও দেবন। তিনি ইয়াজিদ ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক দায়িত্বে নিয়োগের সময় নিম্নোক্ত হিদায়েত দিয়েছিলেন—

'ইয়াজিদ ! তুমি যুবক। তোমার ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে ভালো কথা বলা হয়। তোমার এ গুণাবলী এখনো তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি তোমাকে পরীক্ষা ও যাচাই করতে চাই। এবং তোমার গোত্রের বাইরে এনে তোমাকে কাজে লাগাতে চাই। আমি দেখবো তুমি কিরূপ যোগ্যতা অর্জন কর এবং নিজের ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যবহার কর। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, যদি তুমি উত্তমভাবে তোমার দায়িত্ব পালন করতে পার তাহলে তোমাকে প্রমোশন দেবো। আর যদি তুমি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করবো। আমি তোমাকে খালিদ ইবনু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত করছি।'.....তারপর তিনি তাকে সেই কাজের ব্যাপারে হিদায়াত দিলেন যে কাজে তাকে পাঠানো হচ্ছিলো।.....তাঁকে আরো বললেন—ইয়াজিদ ! তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে। হতে পারে দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারে

তাদেরকে প্রাধান্য দেবে। তোমার জন্য একথাটিই আমার কাছে সবচেয়ে ভয়ের কারণ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'যাকে মুসলমানদের কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় এবং সে বন্ধুত্বের খাতিরে কাউকে অবৈধভাবে কোনো কাজ দেয়, তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার থেকে কোনো বিনিময়ই গ্রহণ করবেন না। সরাসরি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'

তিনি আরো বললেন—'আমি তোমাকে আবু উবাইদা ইবনু জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ভালো আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। ইসলামে তার মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে তুমি ভালোই অবহিত আছো। তাঁর সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'প্রত্যেক উম্মতের একজন অতিবিশ্বস্ত (আমীন) লোক থাকে, এ উম্মতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে, আবু উবাইদা।'

এজন্য তুমি তার ব্যাপারে সবসময় খেয়াল রাখবে। তাছাড়া মুয়ায ইবনু জাবাল সম্পর্কেও খেয়াল রাখবে। তুমি তো জানো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার ঘনিষ্টতা কিরূপ ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন— 'সে জ্ঞানীদের ইমাম।'

কোনো ফায়সালা করতে হলে তাদের দু'জনের সাথে পরামর্শ করে করবে। এ দু'জন তোমার কল্যাণ কামনা কম করবে না।'

ইয়াজিদ ইবনু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন ঃ 'হে রাসূলের খলীফা ! তাদের সম্পর্কে আপনি যেমন আমাকে নসীহত করলেন, আমার সম্পর্কে তাদের দু'জনকেও একটু নসীহত করবেন।' এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন—'তোমার সম্পর্কে তাদের দু'জনকেও নসীহত করা থেকে বিরত থাকবো না।'[৩৫]

যখন হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিলিস্তিন পাঠানো হলো তখন তার সাথে চলতে চলতে নিম্নোক্ত নসীহত করেছিলেন।

'হে আমর ! নির্জনে ও জনসম্মুখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং তাকে লজ্জা করে চলবে। কেননা তিনি তোমাকে এবং তোমার কার্যাবলীকে দেখছেন। তুমি দেখো, আমি তোমাকে তাদের চেয়ে প্রাধান্য দিচ্ছি যারা তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে তারা তোমার চেয়েও অগ্রগামী। এজন্য করেছি যেন তুমি আখিরাতের জন্য বেশী বেশী কাজ কাজ করে যেও এবং সকল কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখো। তুমি সাথীদের জন্য পিতার মতো অভিভাবক হয়ে যেও। মানুষের গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করো না। যা প্রকাশিত হয় তাকেই যথেষ্ট মনে করো। সর্বদা নিজের কাজে ব্যস্ত থেকো, দুশমনের মুকাবেলায় বীরত্ব প্রদর্শন করবে, কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না। গানিমাতের মাল থেকে কোনো কিছু আত্মসাত করো না। যে এরূপ করবে তাকে শাস্তি দেবে। যখন সাথীদেরকে নসীহত করবে তখন তা সংক্ষেপে বলবে। নিজেকে নিজে সংশোধন করবে, দেখবে প্রজারা সবাই ঠিক আছে।'[৩৬]

[৪.১১] খলীফার জন্য এটিও প্রয়োজন যে, তিনি সমস্যা সংকুল অবস্থায় বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞজনের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।-[আরো দেখুন, 'শূরা' শিরোনাম]

[৪.১২] খলীফা মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে ওলীর চেয়ে বেশী হকদার।-[দেখুন 'সালাত' শিরোনাম]

৫. খলীফার প্রতি উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যখন কেউ খলীফা নিযুক্ত হন তখন তাঁর প্রতি উম্মতের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে যায়। নিচে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

[৫.১] **ভালোবাসা ঃ** ভালোবাসা ঐ জিনিস যার প্রেক্ষিতে কারো আনুগত্যের জন্য মনের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং একে অপরের কল্যাণকামী হিসেবে গড়ে তুলে। আবদুর রাজ্জাক তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন—এক ব্যক্তি তার কতিপয় দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বলতে গিয়ে বললেন—'যতোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পথের সাথে আপনার সম্পর্ক থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত একমাত্র আমার জীবন ছাড়া আর সবকিছুর চেয়ে আপনি আমার কাছে বেশী প্রিয়।' শুনে তিনি বললেন—'হাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাদের জীবনের চেয়েও [আমি তোমাদের কাছে] বেশী প্রিয়।'[৩৭]

[৫.২] **সৎকাজে খলীফার কথা শোনা এবং তাঁর আনুগত্য করা ঃ** সৎকাজে খলীফার কথা শোনতে হবে এবং তাঁর আনুগত্য করতে হবে কিন্তু গুনাহ্‌র কাজে তাঁর কথা শোনা যাবে না, এমনকি তাঁর আনুগত্যও করা যাবে না। ইবনু আফীফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলাম। তিনি লোকদের থেকে বাইয়াত নিচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন—হে লোক সকল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের আমীরের কথা শোনার জন্য ও মানার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করছি।' ইবনু আফীফ (রা) বলেন—'আমি একথা বুঝে নেয়ার পর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম—'আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আমীরের কথা শোনে তা মানার জন্য আপনার কাছে বাইয়াত হচ্ছি।' একথা শুনে তিনি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুটিয়ে দেখলেন। সম্ভবত আমার কথাটি তাঁর কাছে ভালো লেগেছিলো। অতপর তিনি আমার বাইয়াত নিলেন।[৩৮]

বাইয়াত গ্রহণের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে বলেছিলেন—'হে জনমণ্ডলী ! আমার কথার আনুগত্য ততোক্ষণ পর্যন্ত করবে যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করি। যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।[৩৯]

[৫.৩] **কল্যাণ কামনা ঃ** একে অপরের কল্যাণ কামনা করা ও নসীহত করা। উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে—যখন খলীফাকে সত্যপথ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হতে দেখবে তখন তাঁর কল্যাণার্থে তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করবে। তাছাড়া প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করবে। নিশ্চিত একথা বলা যায় যে, এরূপ হলে সেই খলীফা বা আমীর কখনো সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হবেন না, যার পেছনে গোটা জাতি থাকবে এবং প্রত্যেকের মনেই তাকে কল্যাণের পথে রাখার স্পৃহা থাকবে। এজন্য তিনি খলীফা হওয়ার পর বাইয়াত গ্রহণ শেষে

প্রথম ভাষণেই তিনি বলেছিলেন—'হামদ ও সালাতের পর। হে লোক সকল ! আমাকে তোমাদের আমীর বানানো হয়েছে। কিন্তু আমি তো তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তোমরা আমাকে সাহায্য করবে আর যদি খারাপ কাজ করি তোমরা আমাকে সতর্ক করে দেবে। সত্যের অপর নাম আমানত এবং মিথ্যার অপর নাম খিয়ানত।'[৪০]

[৫.৪] খলীফার ন্যায্য প্রয়োজন পূরণের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা ঃ উম্মতের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে—তাদের সম্পদ থেকে [অর্থাৎ বাইতুলমাল থেকে] খলীফার জন্য এই পরিমাণ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা, যেন তা খলীফা এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের বৈধ প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য যথেষ্ট হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ভাতা স্বরূপ নিম্নোক্ত জিনিসগুলো বরাদ্দ করেছিলেন। দু'টো ইয়েমেনী চাদর, একটি শীতের জন্য একটি গরম কালের জন্য যেন পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। [পুরনো হয়ে গেলে বদলিয়ে নতুন সেট গ্রহণ], সফরের জন্য একটি সওয়ারী, পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সেই পরিমাণ অর্থ, যে পরিমাণ অর্থ তিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন, যবাহকৃত অর্ধেক ছাগল, যার মধ্যে মাথা এবং ভূড়ি [বট] শামিল ছিলো না।[৪১]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ছিলো বাইতুলমাল থেকে যে অর্থ তিনি গ্রহণ করতেন তা যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি বলতেন—'ওমরের জন্য আফসোস। [ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুলমাল থেকে তাকে ভাতা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন] আমার ভয় হয় এই ভেবে, বাইতুলমাল থেকে কিছু নেয়ার অবকাশ হয়তো আমার নেই।' তিনি তাঁর খিলাফত আমলে [অর্থাৎ দু' বছর কয়েক মাস] বাইতুলমাল থেকে আট হাজার দিরহাম গ্রহণ করেছিলেন। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বলতে লাগলেন—আমি ওমরকে বলেছিলাম, বাইতুলমাল থেকে কিছু নেয়া আমার ঠিক হবে না। কিন্তু ওমর আমার ওপর বিজয়ী হয়ে গেল, যে কারণে আমি বাইতুলমাল থেকে ভাতা নিতে বাধ্য হলাম। যখন আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবো তখন আমার সম্পদ থেকে আট হাজার দিরহাম বাইতুলমালে ফিরিয়ে দেবে।' ইন্তিকালের পর যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ অর্থ নিয়ে যাওয়া হলো তখন তিনি বললেন—'আল্লাহ তাআলা আবু বকরের ওপর রহম করুন। তিনি তো তাঁর স্থলাভিষিক্তদেরকে কঠিন সমস্যায় ফেলে গেলেন।[৪২]

[৫.৫] যদি খলীফার ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে যায় তাহলে তিনি বাইতুলমাল থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। যদি কেউ তার ওপর ইহ্‌সান না করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বাইতুলমাল থেকে সাত হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময়ও এ ঋণ তার যিম্মায় ছিলো। তিনি তা আদায়ের জন্য ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন।[৪৩]

ইযতিবা' [اضطباع]—হাজ্জের এক বিশেষ কাজ

ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদর এনে বাম কাধের ওপর রাখা। তাওয়াফে ইয্‌তিবা' করা। –[বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন-'হাজ্জ' শিরোনাম]

ইয়াদুন [يد]—হাত

০ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু' হাত কান পর্যন্ত উঠানো।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

০ নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় হাতকে বেধে রাখা।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]
০ অনাবাদী জমি আবাদে হাত দেয়া।- [দেখুন, 'ইহ্‌ইয়াউল মাওয়াত' শিরোনাম]
০ হাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মত অপরাধ এবং তার দিয়াত।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্‌' শিরোনাম]

ইয়ামীন [يمين]—শপথ

১. সংজ্ঞা

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোনো তৎপরতা বা কাজের গতি ত্বরান্বিত করাকে 'ইয়ামীন' বা শপথ বলে।

২. শপথ পূর্ণ করা

যদি কোনো ভালো কাজের শপথ করা হয় তবে তা পুরা করা তার দায়িত্ব হয়ে যায়। আর যদি শপথ ভঙ্গ করা তা পুরা করার চেয়ে কল্যাণকর হয় তবে শপথ ভঙ্গ করে তার কাফ্‌ফারা আদায় করা উচিত। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার বিধান অবতীর্ণের পূর্বে কখনো তিনি শপথ ভঙ্গ করেননি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আমি যদি কোনো ব্যাপারে শপথ করি আর তার চেয়ে অন্য ব্যাপার আমার কাছে অধিকতর ভালো মনে হয় তাহলে শপথ ভেঙ্গে তার ওপর আমল করে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করবো।[৪৪] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমল এরূপই ছিলো। যদি শপথকৃত কথার চেয়ে অন্য কোনো কথা তাঁর নিকট উত্তম মনে হতো তাহলে তিনি শপথ ভেঙ্গে সে কথার ওপর আমল করে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতেন।[৪৫] যেমন তিনি সেই মহিলাকে শপথ ভঙ্গের উপদেশ দিয়েছিলেন, যে কথা না বলার জন্য মানত করেছিল।-[দেখুন, 'কালাম' শিরোনাম]

ইমাম বাইহাকী তার সুনানে আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়েত করেছেন, তিনি বলেছেন—'একদিন আমাদের বাড়ি ক'জন মেহমান আসেন। আব্বা [অর্থাৎ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু] তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলেন। তিনি বাড়িতে এলেন না। খানা তৈরী করে রাতে মেহমানদেরকে খেতে আহ্বান জানালে তারা বললেন—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছাড়া আমরা খাবো না। যখন তিনি বাড়িতে এলেন তখন মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করলেন-তোমরা কোনো খানা খাওনি? নিজের ব্যাপারে বললেন—আল্লাহ্‌র শপথ আজ রাতে আমি কিছুই খাবো না। মেহমানবৃন্দ বললেন, আপনি কিছু না খেলে আমরাও খাবো না। তিনি বললেন—আমার প্রথম কথা [অর্থাৎ খানা না খাওয়ার ব্যাপারে শপথ] ছিলো শয়তানের পক্ষ থেকে। এসো আমরা খাই। সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন—'আমার মেহমানদের শপথ পুরা হলো আর আমার শপথ নষ্ট হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো ঘটনা শুনে বললেন —আবু বকর! এমন কিছু হয়নি। বরং তুমি এরূপ করে নেকী ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েছো।' ইমাম বাইহাকী বলেন—'শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায়ের কোনো বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেনি।[৪৬]

আমার [লেখক] মনে হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার কথা এজন্য বলেননি যে, তিনি এ বিষয়ে আগে থেকেই

জানতেন। কারণ, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারটি সব মানুষের চেয়ে বেশী জানতেন, কোনো বিষয়ে শপথ করে তার চেয়ে ভালো কোনো বিষয়ে আমল করতে গেলে শপথ ভঙ্গ হয় এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয়। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওপর যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিলো তাতে মুসতাহ্ ইবনু উছাছার ভূমিকাও ছিলো। যাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নানাভাবে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি শপথ করলেন —ভবিষ্যতে মুসতাহ্‌কে আর কোনো সাহায্য করবেন না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ص وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ط أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ـ(النور : ٢٢)

"তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"-(আন নূর ঃ ২২)

সাথে সাথে তিনি শপথ ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারা আদায় করে দেন এবং আপন আত্মীয় মুসতাহ্‌কে সাহায্য প্রদান করতে থাকেন।[৪৭]

৩. শপথের বাক্য

শপথ যেমন আল্লাহ্‌র নামে হয় তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র সিফাতী নামেও শপথ হয়। কোনো হালাল বস্তু যদি নিজের ওপর হারাম করে নেয়ার শপথ হয় তাও হয়ে যাবে। ইবনু কুদামাহ্ (রহ) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, 'হারাম' শব্দটি বলাও শপথ। যেমন বলা হলো—যদি আমি এটি করি তাহলে তা আমার জন্য হারাম।'[৪৮]

৪. অভাবী ঋণগ্রস্তের কাছ থেকে এই মর্মে হলফ [শপথ] নেয়া যে, আমার হাতে সম্পদ আসামাত্র আমি এ ঋণ পরিশোধ করে দেবো।-[দেখুন, 'দাইন' শিরোনাম]

ইরূছ [ارث]—মীরাস/উত্তরাধিকার

১. উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণসমূহ

দু' ব্যক্তির মধ্যে তখনই ওয়ারিসের সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যখন নিম্নোক্ত কারণসমূহের মধ্যে কোনো একটি কারণ পাওয়া যাবে।

[১.১ক] রক্ত সম্পর্ক ঃ রক্তের সম্পর্কের কারণে একে অপরের ওয়ারিস হয়। চাই সে আসাবা কিংবা যাবিল ফুরুয অথবা যাবিল আরহাম হোক না কেন।[৪৯] জীবিত জন্মগ্রহণ করুক কিংবা এখনো মায়ের গর্ভে অবস্থান করুক।-[সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে]

(১.১খ) আল হামীল ঃ এমন সন্তান যাকে কোনো মহিলা দাবী করলেন, সে তার পুত্র কিন্তু এ দাবীর পক্ষে কোনো প্রমাণাদি পেশ করতে পারলেন না। এমতাবস্থায় সন্তান সেই

মহিলার এবং মহিলাও সেই সন্তানের কোনো ওয়ারিস পাবেন না। যতোক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের পক্ষে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারবেন।[৫০] শুধু সন্তান কোলে নিয়ে দাবী করলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে তার সন্তান।

[১.২] বিয়ে ঃ বিয়ের সুবাদে স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিস হয়। যতোক্ষণ বিয়ে বলবৎ থাকে ততোক্ষণ পরস্পরের ওয়ারিসী স্বত্ব নষ্ট হয় না। এমনকি যদি স্ত্রীকে রিজঈ[1] তালাক দেয় এবং সে ইদ্দত পালনরতা অবস্থায় থাকে তবু সে ওয়ারিস হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য হচ্ছে—"কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ব্যাপারে সেই বেশী হকদার অর্থাৎ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে স্ত্রী হিসেবে রাখার, যতক্ষণ তৃতীয় হায়িয থেকে সে পবিত্র না হয়। (তৃতীয় হায়িয শেষ হয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোনো অবকাশ থাকে না। যতোক্ষণ কোনো মহিলা ইদ্দত পালনরতা থাকবে ততোক্ষণ সে স্বামীর ওয়ারিস হবে।"

[১.৩] মালিকানার সম্পর্ক ঃ আযাদকৃত গোলাম বা বাঁদীর যদি কোনো ওয়ারিস না থাকে তবে আযাদকারী তার সম্পদের ওয়ারিস হবে।

আযাদকৃত যেসব দাস-দাসীর আত্মীয়-স্বজন বা কোনো ওয়ারিশ ছিল না হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐসব দাসদাসীর আযাদকারীদেরকে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ প্রদান করতেন। চাই তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করে থাকুক কিংবা অন্য কোনো কারণে। হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরাহ্ বিনতে ইয়াগার নামে এক আনসার মহিলার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাকে তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করে দিয়েছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার পরিত্যাক্ত সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো—এগুলো কাকে দেয়া হবে?' তিনি বললেন —'এগুলো আমরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়ে দাও।' কিন্তু মহিলা সে সম্পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।[৫১]

[১.৪] ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে একাধিক কারণ একত্রিত হওয়া ঃ যদি কোনো ব্যক্তির ওয়ারিস হওয়ার একাধিক কারণ একত্রিত হয় তবে তিনি সবগুলো কারণের জন্যই ওয়ারিস হবেন। যেমন —এক ব্যক্তি মৃত মহিলার স্বামী আবার অন্যদিকে তিনি তার চাচাতো ভাই। যদি তিনি ছাড়া মৃত মহিলার আর কোনো ওয়ারিস না থাকে তবে স্বামী হিসেবে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক পাবেন এবং আসাবা হওয়ার কারণে অবশিষ্ট অংশের মালিকও তিনিই হবেন। ইবরাহীম নখঈ (রহ) এক মৃত মহিলার পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছিলেন—যিনি বৈপিত্রেয় ভাইবোন[2] রেখে মারা গেছেন। অন্যদিকে যারা তার চাচাতো ভাইবোনও হয়।—বৈপিত্রেয় ভাইবোন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সবাই সমান করে ভাগ করে নেবে এবংঅবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ আসাবা হওয়ার কারণে ভাইয়েরা পেয়ে যাবে। বোনেরা অবশিষ্ট সম্পদের কিছুই পাবে না। সাহাবা কিরামের ফতোয়াও এরূপ ছিলো।[৫২]

২. ওয়ারিস হওয়ার শর্তাবলী

দু' ব্যক্তির মধ্যে ওয়ারিসের সম্পর্ক তখনই বলবত হবে যখন নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাবে।

---

1. যে তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে বিয়ে ব্যাতিরেকে ফিরিয়ে নিতে পারে তাকে রিজঈ তালাক বলে।
2. মা এক কিন্তু পিতা পৃথক পৃথক এরূপ ভাইবোনকে বৈপিত্রেয় ভাইবোন বলে।

[২.১] মৃত ব্যক্তি তার সম্পদ রেখে মরার সময় ওয়ারিসের জীবিত থাকা।

[২.১ক] মৃত্যুর সময় কোনো ওয়ারিস জীবিত বলে প্রমাণিত না হলো মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে সে অংশীদার হবে না। তার যাবতীয় সম্পদ যারা জীবিত তারা পেয়ে যাবে।[৫৩]

একথার ভিত্তির ওপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তারা পরস্পরের ওয়ারিস হবে না। কারণ একথা জানার উপায় ছিলো না তাদের মধ্যে কে আগে শহীদ হয়েছেন এবং কে পরে। হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছে তাঁরা পরস্পর ওয়ারিস হবে না। হাঁ, যারা জীবিত আছে তারা শহীদের ওয়ারিস হবে।[৫৪] যারা আগুনে পুড়ে কিংবা পানিতে ডুবে মারা যাবে তাদের জন্যও এই সূত্র অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। তাছাড়া একথা তাদের জন্যও প্রযোজ্য যাদের বেলায় বুঝার কোনো উপায় থাকে না যে, তাদের মৃত্যু কার আগে হয়েছে এবং কার পরে।

[২.১খ] গর্ভস্থ সন্তানের মীরাস ঃ সন্তান যদি জীবিত প্রসব হয় তবে মায়ের পেটে সে জীবিত ছিল বলে ধরে নেয়া হবে। আর যদি মৃত সন্তান প্রসব হয় তবে মায়ের পেটেও সে মৃত ছিলো বলে গণ্য হবে। এ হিসেবেই মীরাসে তার অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হবে। যেমন—এক ব্যক্তি মরে গেল। তার স্ত্রী গর্ভবতী। সে যদি জীবিত সন্তান প্রসব করে তবে সেই সন্তান অংশীদার হবে। আর যদি মৃত সন্তান প্রসব করে তবে ঐ সন্তান পিতার সম্পদে ওয়ারিস হবে না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্ভস্থ সন্তান জীবিত থাকাবস্থায় তাকে মীরাস দিতেন। আতা ইবনু আবী রাবাহ (রহ) তাবিঈ থেকে বর্ণিত—হযরত সা'দ ইবনু উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সমস্ত সম্পদ সন্তানের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং সিরিয়া সফরে চলে গেলেন। অতপর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন কিন্তু একথা হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন না। যখন তিনি সন্তান প্রসব করলেন তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে কায়িসকে বলে পাঠালেন—'সা'দ মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী একথা জানতেন না। আমরা মনে করি তাঁর সম্পদে নবজাতকেরও অংশ আছে। তাকে সে অংশ দিয়ে দেয়া উচিত।' কায়িস ইবনু সা'দ প্রতি উত্তরে বললেন—'আমার পিতা যেভাবে তাঁর সম্পদ বণ্টন ও কার্যকর করে গিয়েছেন আমি তার কোনো পরিবর্তন করবো না। অবশ্য আমার অংশ আমি তাকে দিয়ে দেবো।' ইবনু জুরাইজ আতা ইবনু আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলেন—'হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু কি এ বণ্টন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী করেছিলেন ?' তিনি জবাবে বললেন—'সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ীই বণ্টন করতেন।'[৫৫]

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গাবা অঞ্চলে অবস্থিত তাঁর খেজুর বাগান থেকে ২০ ওয়াসাক* খেজুর তাঁকে দান করতে চেয়েছিলেন। যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ডেকে এনে বললেন—বেটি ! আল্লাহ্‌র কসম ! পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় আমার

* এক ওয়াসাক = ৬০ ছা', ১ছা' = ৩.৫০ সের

আর কেউ নেই। তাছাড়া আমার মৃত্যুর পর তুমি দুঃখে কষ্টে থাকবে এটিও আমার নিকট কম বেদনাদায়ক নয়। তোমাকে আমি বিশ ওয়াসাক খেজুর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তুমি যদি সেই পরিমাণ খেজুর সংগ্রহ করে জমা করে থাক তবে তা তোমার। আজকের পর আমি যা কিছু রেখে যাব তা ওয়ারিসদের। তার ওয়ারিস তোমার দু' ভাই এবং দু' বোন। আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমার পরিত্যক্ত সম্পদ তোমরা বন্টন করে নিও।' আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন—'আব্বাজান ! আপনি যদি দান স্বরূপ আমাকে এর চেয়েও বেশী সম্পদ দিতেন তবু আমি মীরাস বন্টনের জন্য তা থেকে হাত গুটিয়ে ফেলতাম। আব্বাজান ! এক বোন তো আসমা কিন্তু অন্য বোন কে ?' তিনি বললেন—'আমার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান আছে আমার ধারণা সে কন্যা সন্তান।'[৫৬]

[২.২] নিকটতম ওয়ারিসের অনুপস্থিতি ঃ নিকটতম ওয়ারিসের উপস্থিতির কারণে দূরের ওয়ারিস মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করে ভাইদের চেয়ে নিকটতম ওয়ারিস বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ জন্য নাতির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদা ওয়ারিস হন কিন্তু ভাই বঞ্চিত হয়।

[২.৩] মীরাস থেকে বঞ্চিত করার মত নিম্নোক্ত কারণসমূহের মধ্যে কোনো একটি না পাওয়া গেলে।

৩. ওয়ারিস হওয়ার পরও যেসব কাজ মীরাস থেকে বঞ্চিত করে

তিনটি কাজ এমন যা একজন ওয়ারিসকে মীরাস থেকে বঞ্চিত রাখে।

[৩.১] হত্যা ঃ হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিস হয় না। সে হত্যাকাণ্ড ইচ্ছেকৃত সংঘটিত হোক কিংবা ভুলক্রমে।[৫৭]

[৩.২ক] কুফরী মুসলমান কাফিরের (অমুসলিমের) এবং কাফির কোনো মুসলমানের মীরাস পায় না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'দুই ধর্মাবলম্বী পরস্পর একে অপরের ওয়ারিস হতে পারে না।[৫৮]

ইমাম যুহরী (রহ) বলেছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কোনো মুসলমান কাফিরের এবং কোনো কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতো না। যখন হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল এলো তখন তিনি মুসলমানকে কাফিরদের ওয়ারিস সাব্যস্ত করে দিলেন। কিন্তু কোনো কাফিরকে মুসলমানের ওয়ারিস হতে দেননি। হযরত ওমর ইবনুল আবদুল আজিজের শাসন কালের পূর্ব পর্যন্ত এ পদ্ধতিই চলছিল। হযরত ওমর ইবনু আবদুল আজীজ তাঁর খিলাফতকালে এ পদ্ধতি বাতিল করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে জারীকৃত পদ্ধতি বলবত করেন। ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক পর্যন্ত এ নীতিকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু হিশাম ইবনু আবদুল মালিক এ নীতিকে পরিবর্তন করে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি প্রবর্তন করেন।[৫৯]

[৩.২খ] মুরতাদের ওয়ারিস ঃ অবশ্য মুরতাদের নীতি কিছুটা ব্যতিক্রম। মুরতাদের মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। যায়িদ ইবনু

সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। 'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তখন আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের মুসলমান ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দেই।[৬০]

[৩.৩] দাসত্ব ঃ গোলাম কোনো জিনিসের ওয়ারিস হয় না। কেননা গোলামীর কারণে কোনো সম্পদের মালিকানা অর্জন হয় না। আমি এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো বর্ণনা পাইনি। হতে পারে এ মাসয়ালার ব্যাপারে সকল উম্মাহ্ একমত। এজন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ঐক্যমত্য পোষণ করতেন। তাই ভিন্ন কোনো মত তার থেকে বর্ণিত হয়নি।

৪. পরিত্যক্ত সম্পদে দাদীর ওয়ারিস হওয়া

[৪.১] মৃত ব্যক্তির পিতার উপস্থিতিতে দাদী কোনো অংশ পাবেন না। এ মতের ওপরই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম শা'বী (রহ)-এর একটি বর্ণনা অনুসারে—একমাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতার সাথে দাদীকে অংশীদার বানাতেন না।[৬১]

[৪.২] একজন দাদী অথবা নানী এক-ষষ্ঠাংশ সম্পদের ওয়ারিস হবেন। যদি তারা সংখ্যায় একাধিক হন তবে সবাই মিলে এক-ষষ্ঠাংশ সম্পদ পাবেন। নিচের ঘটনা থেকে দাদী অথবা নানীর এক-ষষ্ঠাংশ প্রমাণিত হয়।

একবার এক দাদী [অথবা নানী] এসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নাতির পরিত্যক্ত সম্পদে তার অংশ দাবী করলেন। তিনি তাকে বলে দিলেন—'আল্লাহ্‌র কিতাবে তোমার কোনো অংশ [নির্ধারিত] নেই। এমন কি আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতেও তোমাদের অংশ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা আমার কাছে এসে পৌঁছেনি। তবু আমি বিজ্ঞজনদের সাথে আলাপ করে তোমাকে জানাবো।' ইত্যবসরে হযরত মুগীরা ইবনু শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠলেন—'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সামনে দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার সাথে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ-কারী আর কেউ ছিলো কি ? তখন মুহাম্মদ ইবনু মুসলিমা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগীরা ইবনু শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতপর তিনি দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও মৃত ব্যক্তির এক দাদী [দাদীর সতীন] এসে তার অংশ দাবী করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আল্লাহ্‌র কিতাবে তোমার কোনো অংশ নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পদের ফায়সালা করেছেন তাও তোমার জন্য নয়। তোমার আগে যিনি এসেছিলেন তাঁর জন্য। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আত্মীয়দের জন্য নির্দিষ্ট অংশে কোনো রদবদল করতে পারবো না। তোমাদের জন্য শুধু এক-ষষ্ঠাংশ। যেহেতু তোমরা দু'জন কাজেই ছয় ভাগের এক ভাগ দু'জনে সমান ভাগ করে নেবে। যদি একজন হতে তবে পুরোটাই একা পেতে।[৬২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল দাদী নানীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা সংখ্যায় একজন হন কিংবা একাধিক।

একবার এক মৃত ব্যক্তির দাদী এবং নানী উভয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে এলেন। তিনি নানীকে তার অংশ দিয়ে দিলেন কিন্তু দাদীকে কোনো অংশ দিলেন না। সেখানে

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আবদুর রহমান ইবনু সাহ্‌ল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—'মৃত ব্যক্তির মীরাস আপনি এমন এক ব্যক্তিকে দিলেন, যদি এ-ই স্বয়ং মারা যেত তবে তার নাতি কোনো অংশই পেত না।' একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নানি এবং দাদী উভয়কে এক-ষষ্ঠাংশ সম্পদে শরীক করে দিলেন।[৬৩]

৫. ওয়ারিসী স্বত্বে দাদার অংশ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত ব্যক্তির পিতার উপস্থিতিতে দাদাকে কোন অংশ প্রদান করতেন না। তবে পিতা না থাকলে দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করে পিতার প্রাপ্য অংশ প্রদান করতেন। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। 'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করে দিতেন।' স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'দাদা পিতার ন্যায়। যতক্ষণ তার সাথে [প্রকৃত] পিতা না থাকেন। অনুরূপভাবে নাতিও পুত্রের স্থলাভিষিক্ত। যদি তার ঔরষজাত কোনো পুত্র না থাকে।[৬৪]

এই ভিত্তির ওপর সকল প্রকার ভাই, চাই সে দুধ ভাই হোক কিংবা বৈমাত্রেয় ভাই হোক অথবা বৈপিত্রেয় ওয়ারিস থেকে বঞ্চিত হবেন।

আমাদের নিকট হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই ফায়সালা মওজুদ আছে যা তিনি এক মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদের ব্যাপারে করেছিলেন। তার একজন বৈমাত্রেয় ভাই, মা এবং দাদা ছিলো। তিনি সেই মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি এই ভিত্তির ওপর দাদাকে দিয়েছিলেন যে, দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত। ভাইকে এবং মাকে কিছুই দেননি।[৬৫]

তদ্রূপ এক ব্যক্তি মা, দাদা এবং এক বোন রেখে মৃত্যুবরণ করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাকে এক-তৃতীয়ংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ দাদাকে অর্পণ করলেন। এ যুক্তিতে যে, দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত। বোনকে কিছুই দিলেন না।[৬৬]

আবার এক মহিলা স্বামী, মা, দাদা এবং বোন রেখে মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বামীকে অর্ধেক, মাকে এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ দাদাকে দিয়ে দিলেন। বোনকে কিছুই দিলেন না। কারণ, দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় বোন মীরাস থেকে বঞ্চিত হলেন।[৬৭]

৬. 'কালালা'র মীরাস

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে কালালা ঐ ব্যক্তি, যে নিঃসন্তান এবং যার পিতা ও দাদা জীবিত নেই। তিনি বলেছেন—'কালালা'র ব্যাপারে আমার একটি অভিমত আছে। যদি এ অভিমত সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার দুর্বলতা এবং তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আমার দৃষ্টিতে কালালা হচ্ছে—ঐ ব্যক্তি যে নিঃসন্তান এবং পিতৃহীন।' অবশ্য তার ভাই বোন থাকতে পারে।[৬৮]

একবার তিনি এক বক্তৃতায় বললেন—আল্লাহ্ তাআলা সূরা আন নিসার শুরুতে ওয়ারিসদের অংশ নির্ধারণ করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যা সন্তান এবং পিতার অংশ সংক্রান্ত। পরবর্তী আয়াতে স্বামী-স্ত্রী এবং ভাইবোনদের অংশ সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে সূরা শেষ করা হয়েছে সেখানে দুধ ভাইবোন এবং বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়

ভাইবোন সম্পর্কে বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা আনফালের শেষ আয়াতে যাবিল আরহাম [নিকটাত্মীয়দের] সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর কিতাবে একে অপরের চেয়ে বেশী হকদার।[৬৯]

যে আয়াতে বৈপিত্রেয় ভাইবোনের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ ..... الخ

'আর যদি ঐ পুরুষ মহিলা নিঃসন্তান হোন, এমনকি তার পিতা-মাতাও জীবিত না থাকেন শুধু এক ভাই অথবা এক বোন জীবিত থাকে। তাহলে ভাইবোন প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে সম্পদ পাবে। কিন্তু যদি ভাইবোন একাধিক হয় তবে সবাই মিলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবে। ঋণ এবং ওসিয়ত পূর্ণ করার পর। এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ্ বিজ্ঞ এবং দয়ালু।

বাকী থাকে সেই আয়াত যেখানে দুধ ভাইবোন ও বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইবোন সম্পর্কে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ ..... الخ

'লোকে আপনার কাছে 'কালালা' সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে জানাচ্ছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকলে সে অর্ধেক সম্পদ পাবে। আর যদি বোন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তবে ভাই তার ওয়ারিস হবে। তবে মৃত ব্যক্তির যদি দু' বোন থাকে তবে পুরুষ মহিলার দ্বিগুণ পাবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে তাঁর বিধান বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।'

৭. রদ

[৭.১] মীরাসে যাবিল ফুরূযকে তাদের অংশ দেয়ার পরও যদি সম্পদ থেকে যায়, তাহলে এ অতিরিক্ত সম্পদ তাদের মাঝে পুনরায় বণ্টন করে দেয়াকে রদ বলে।

[৭.২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বণ্টনের পর অতিরিক্ত সম্পদ যাবিল ফরূযদের মাঝে পুনরায় বণ্টনের প্রবক্তা ছিলেন না। একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, যখন আবু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্ত করা গোলাম সালেম যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন, তখন তিনি তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক তার কন্যাকে দিলেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক আল্লাহ্‌র পথে দান করে দিলেন। যদি তিনি যাবিল ফুরূযদের মাঝে পুনরায় বণ্টনের প্রবক্তা হতেন তবে সালেমের অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান না করে বরং কন্যাকে দিয়ে দিতেন।

৮. মৃত ব্যক্তির ওসিয়তে ওয়ারিসদের কোনো অধিকার নেই

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ওসিয়্যাহ্' শিরোনাম।

ইরদাফ [ارداف]—বাহনের পেছনে বসিয়ে নেয়া

আরোহী অবস্থায় অন্য কোনো ব্যক্তিকে পেছনে বসিয়ে নেয়া জায়েয। যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যেমন—দু'জনের ভার যদি পশু বহন করতে না পারে কিংবা 'গাইর মাহরাম' মহিলা হয়। জাহ্‌রা ইবনু খামীসাহ্ থেকে বর্ণিত—'আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু

আনহুর পেছনে আরোহী ছিলাম। যখন আমরা লোকজনের পাশে দিয়ে যেতাম তখন তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলতাম। তারা প্রতি উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলতেন। এতো বেশী পরিমাণে সালাম আদান-প্রদান হলো যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে বাধ্য হলেন—'আজতো লোকজন সালাম দেয়ার ব্যাপারে আমাকে ছাড়িয়ে গেল।'[৭০]

ইল্‌ম [علم]—জ্ঞান

- নামাযে ইমামতের জন্য যিনি বেশী ইল্‌ম রাখেন তাকে আগে দেয়া প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]
- কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা।-[দেখুন, 'ইজারাহ্' শিরোনাম]
- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ একত্রিত করা প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'হাদীস' শিরোনাম]

ইস্‌তিকায়াহ্ [استقاءة]—ইচ্ছেকৃত বমি করা

হারাম খাদ্য গ্রহণের পর ইচ্ছেকৃত বমি করে তা বের করে দেয়া।-[দেখুন, 'ত্ব'আম' শিরোনাম]

ইস্‌তিব্‌রা [استبراء]—পবিত্র করা

ব্যভিচারী মহিলা নিজেকে নিজে গর্ভ থেকে পবিত্র করা।-[দেখুন, 'যিনা' শিরোনাম]

ইস্‌তিতাবাহ [استتابه]—তাওবা করার আহ্বান জানানো

মুরতাদকে তাওবা করার জন্য আহ্বান জানানো।-[দেখুন, 'রিদ্দাহ্' শিরোনাম]

ইস্‌তিস্‌কা [استسقاء]—বৃষ্টি প্রার্থনা করা

অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ধর্ণা দেয়াকে 'ইসতিস্‌কা' বলা হয়। এ ধর্ণা নামাযের মাধ্যমে হয়ে থাকে।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

ইসতিহ্‌কাক [استحقاق]—অধিকারী হওয়া

এমন বস্তু যার মালিক একজন কিন্তু তা পাওয়া গেল অন্যজনের কাছে।-[দেখুন, 'সরিকাহ্' শিরোনাম]

ইস্‌তিহ্‌লাল [استهلال]—নবজাতকের শব্দ/চাঁদ দেখা

১. নবজাতকের জন্মের পর এমন শব্দ করা যাতে সে জীবিত বলে প্রমাণিত হয়। এ ধরনের শব্দকে 'ইস্‌তিহ্‌লাল' বলে।

২. চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'শাহাদাহ্' শিরোনাম]

ইসলাম [اسلام]—ইসলাম, আত্মসমর্পণ

১. ইসলাম সেই দীনের নাম যা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা 'আকাইদ', 'শরীয়াহ্' ও 'আখলাকের সমষ্টি।

২. কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছ থেকে এ ওয়াদা নিতেন—তুমি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনবে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, যে নামায তোমার ওপর ফরয তা সঠিক সময়ে আদায় করবে। কেননা নামাযে অলসতা প্রদর্শন করা ধ্বংসের কারণ। সন্তুষ্টচিত্তে তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করবে। রযমান মাসে রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ আদায় করবে। আল্লাহ্ যাকে তোমার ওপর শাসক নির্বাচন করেন তার কথা শুনবে এবং তার অনুসরণ করবে। একবার এক নওমুসলিমকে এটিও বলেছেন—'তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে, কোনো মানুষের জন্য নয়।[৭১]

৩. কুফরী সমাজে যদি কোনো ভালো কিছু থাকে ইসলাম তাকে শুধু অবশিষ্ট রাখে না বরং গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। আর যেসব কিছু খারাপ তা বাতিল ও ধ্বংস করে দেয়। একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মহিলার নিকট আসেন কিন্তু তিনি তাঁর সাথে কথা বলেননি। তিনি ততোক্ষণ তাকে ছাড়েননি যতোক্ষণ কথা না বলেছেন। মহিলা বলতে বাধ্য হয়েছেন—'হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! আপনি কে ? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'একজন মুহাজির।' মহিলা বললেন—'মুহাজির তো অনেকেই, আপনি কোন্ গোত্রের লোক ?' বলা হলো—'কুরাইশ বংশের।' জিজ্ঞেস করা হলো—'কুরাইশ তো অনেকেই, আপনি কে ?' বলা হলো—'আবু বকর।' পরিচয় পেয়ে মহিলা বললেন—'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ, জাহেলী যুগে আমাদের সাথে কিছু লোকের বিবাদ ছিল। আমি শপথ করেছিলাম, বিবাদ থেকে মুক্তি পেলে তার শোকর স্বরূপ হাজ্জ না করে কারো সাথে কথা বলবো না। (এজন্য প্রথমে আমি আপনার সাথে কথা বলিনি) একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন —'ইসলাম এ ধরনের অনর্থক শপথকে শেষ করে দিয়েছে। সুতরাং শপথ ছেড়ে দিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকো।'[৭২]

৪. কোনো ব্যক্তি মুসলমান কখন হয় ?

সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য এই কথার ওপর যে, কোনো ব্যক্তি কালিমা পড়ার সাথে সাথে তিনি মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এবং পরবর্তী সময়েও কালিমা পড়ার পর তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তদ্রূপ নবজাতকের পিতামাতার মধ্যে যদি কেউ মুসলমান হয় তবে নবজাতককেও মুসলিম হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যদি যুদ্ধের সময় অল্প বয়স্ক সন্তান মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে তবে তাদেরকেও মুসলিম গণ্য করা হয়।

৫. ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়ার মত কথাবার্তা।—[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'রিদ্দাহ্' এবং 'সালাত' শিরোনাম দেখুন]

৬. ইসলাম শর্ত হওয়া

যেসব কাজের জন্য ইসলাম শর্ত তার কিছু নিম্নরূপ ঃ

[৬.১] ইবাদাত—যেমন নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদির জন্য ইসলাম শর্ত। এ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্ ঐকমত্য।

[৬.২] মুসলমানের নেতৃত্বের জন্য, যেমন—রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক প্রভৃতির জন্যও ইসলাম শর্ত। এ ব্যাপারেও সকল উম্মত একমত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেছেন—'মুসলমানের নেতৃত্ব কোনো কাফির প্রদান করতে পারে না।' একই কারণে স্ত্রী মুসলমান হলে স্বামীকেও মুসলমান হতে হবে। তদ্রূপ যারা শূরা সদস্য [উপদেষ্টা] মনোনীত হবেন তাদের জন্য ইসলাম শর্ত।

[৬.৩] যদি দু' ব্যক্তির মধ্যে উত্তরাধিকারীর সম্পর্ক থাকে আর তাদের একজন মুসলমান হয় তবে অন্যজনেরও মুসলমান হওয়া শর্ত।-[বিস্তারিত জানার জন্য 'ইরছ' শিরোনাম দেখুন]

[৬.৪] তদ্রূপ মা যদি কাফির হয় এবং তার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর বিরুদ্ধে কেবল তখনই শাস্তি প্রদান করা হবে যদি তার ছেলে মুসলমান হয়ে থাকে।-[বিস্তারিত জানার জন্য 'কাযফ' শিরোনাম দেখুন]

৭. কাফির বা দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব।-[দেখুন, 'জিহাদ' শিরোনাম]

৮. কোনো মুসলমানকে গোলাম বানানো নিষেধ।-[দেখুন, 'সাবিয়্যুন' শিরোনাম]

৯. আযান ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন।-[দেখুন, 'আযান' শিরোনাম]

ই'সার [اعسار]—অসচ্ছলতা

মানুষের ওপর সম্পদের যে যিম্মাদারী থাকে তা বর্তমানে আদায় করার অক্ষমতাকে 'ই'সার' বলে।-[দেখুন, 'দাইন' শিরোনাম]

ই'সার এবং ইফলাস [দেওলিয়া]-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—গচ্ছিত মাল বর্তমানে ফেরত দানে অক্ষম এমন বুঝাতে ই'সার শব্দটি ব্যবহৃত হয় আর বর্তমানে তো অক্ষমতা আছেই ভবিষ্যতেও সে অক্ষমতা দূর হবে এমন সম্ভাবনা যদি না থাকে তখন 'ইফলাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ইহ্‌ইয়াউল মাওয়াত [احياء الموات]—অনাবাদী জমি আবাদ করা

১. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সৎকাজে উৎসাহিত করতেন। কেউ কোনো সৎকাজের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে অনুমতি দিয়ে দিতেন এবং তিনি এমন জমি লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন যা খারাজ বা গানিমাত হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতো। কারো মালিকানা না থাকায় তা অনাবাদী পড়ে থাকতো। ফসল ফলানো অথবা বাগান করা কিংবা বাড়িঘর নির্মাণের জন্য সেগুলো প্রদান করতেন। এতে দু'টো উদ্দেশ্য সাধিত হতো।

এক ঃ অনাবাদী জমি আবাদ করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

দুই ঃ সৎকাজে লোকদেরকে উৎসাহ প্রদান।

২. অনাবাদী জমি আবাদের পদ্ধতি

দু'ভাবে অনাবাদী জমি আবাদের আওতায় নেয়া যায়।

[২.১] **জায়গীর হিসেবে দেয়া।** ইবনু কুদামা আল মুগনীতে লিখেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জায়গীর হিসেবে একটি জমি দিয়েছিলেন।[৭৩] এ ব্যাপারে একটি দলিল করে অনেক লোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়েছিলো। যখন সে দলিল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সীল দেয়ার জন্য নেয়া হলো তখন তিনি সে দলিলে সীল দিতে অস্বীকার করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—'কী ব্যাপার ! সব জমি তোমাকে প্রদান করবেন, আর কারো কোনো অংশ নেই ?' একথা শুনে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগ হয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বললেন—'আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারি না খলীফা আপনি না ওমর ?' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'ওমর, তাঁর মেজাজটা একটু কড়া, এই যা।'[৭৪]

তেমনিভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একখণ্ড জমি উয়াইনা ইবনু হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও জায়গীর দান করেছিলেন। তাঁকেও একটি দলিল করে দিয়েছিলেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন—এই দলিলটি তুমি যদি ওমরকে দেখিয়ে নিতে তবে ভাল হতো। কারণ, আমার মনে হয় তাঁর পক্ষ থেকে বাধা (objection) পড়ে যাবে। উয়াইনা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে দলিলটি পড়ালেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'সমস্ত জমির মালিকানা তোমার একা। এতে আর কারো কোনো অধিকার নেই ?' তারপর তিনি থু-থুর সাহায্যে তা মুছে ফেললেন। উয়াইনা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে আরেকটি দলিল লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি উত্তর দিলেন—'যে কাজ ওমর বাতিল করে দিয়েছে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে পারবো না।[৭৫]

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা গেল, জায়গীর প্রদানের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি তাই ছিলো যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি। এ জন্যই তিনি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে—হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জায়গীর প্রদান করবেন। আমি সেই দলিল লিখছিলাম। এমন সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দলিলটি আমার কাছ থেকে নিয়ে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে জিজ্ঞেস করলেন—'মনে হয় আপনারা কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন ?' তিনি উত্তর দিলেন—'হাঁ।' (একথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে গেলেন) ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে যাওয়ার পর তিনি দলিল বের করলেন। তারপর আমি সেটি লিখে শেষ করে দিলাম।[৭৬]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে জায়গীরটি দিয়েছিলেন তা যরফ্ এবং কানাহ্ এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।[৭৭]

[২.২] দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে—অনাবাদী জমি রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া নিজেরা আবাদী করে নেবে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি এমন জমি আবাদ করবে যার কোনো মালিক নেই, তাহলে সেই জমির মালিক হওয়ার ব্যাপারে সেই অগ্রাধিকারী। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মতের ওপর ফায়সালা দিয়েছেন।-(সহীহ্ আল বুখারী)। ইবনু হাযম (রহ) বলেন—'এ ফায়সালার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এমন কোনো সাহাবার কথা বর্ণিত হয়নি।[৭৮]

ইহ্‌তিবা [احتباء]—হাঁটু মুড়ে বসা

নিতম্বের ওপর বসে দু' হাটু খাড়া করে রেখে দু' হাতে বেড় দিয়ে বসাকে ফিক্‌হী পরিভাষায় ইহ্‌তিবা বলে।

ইবনু হাযম (রহ) লিখেছেন—জুমুআর খুত্‌বা [বক্তৃতা] প্রদানের সময় এভাবে হাটু মুড়ে বসার ব্যাপারে কোনো সাহাবা বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৭৯]

ইহ্‌তিবাস [احتباس]—বেধে নেয়া/বিরত রাখা

কোনো কাজের জন্য নিজের সময়কে বেধে নিলে সে জন্য সে খরচ বা বিনিময় পাবার অধিকারী হবে।-[আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'নাফকাহ্' শিরোনাম]

ইহ্‌রাম [احرام]—ইহ্‌রাম বাধা/হারাম শরীফে প্রবেশ করা

ইহ্‌রাম [হাজ্জ অথবা ওমরার জন্য মীকাত থেকে সেলাইবিহীন দু' প্রস্ত কাপড় পরিধান করা]-এর জন্য গোসল করা, সেলাই বিহীন কাপড় পরার পর উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।-[ইহ্‌রাম অবস্থায় কি কি কাজ নিষিদ্ধ তা জানার জন্য—'হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

ইহ্‌সান [احصان]—বৈবাহিক বন্ধনভুক্ত করা

১. ব্যভিচারের অপরাধে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার জন্য নির্দিষ্ট শর্তসমূহকে একত্রে শরঈ পরিভাষায় ইহ্‌সান' বলে। ব্যভিচারের অপরাধে শাস্তি দেয়ার জন্য যে শর্তগুলো পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা নিম্নরূপ ঃ

- প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া
- বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া [অর্থাৎ পাগল না হওয়া-অনুবাদক]
- স্বাধীন হওয়া [ক্রীতদাস না হওয়া–অনুবাদক]
- বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে নিভৃতে মিলিত হওয়ার সুযোগ থাকা।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلاَ مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না রাখে, সে তোমাদের অধিকার ভুক্ত মুমিন ক্রীতদাসীকে বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অবহিত আছেন। তোমরা পরস্পর এক। অতএব তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। তবে তারা

বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হবে কিন্তু ব্যভিচারী কিংবা উপপতি গ্রহণকারী হবে না। তারা যখন বিয়ে বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোনো অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন মহিলার অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও করুণাময়।"-(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

সাফিয়া বিনতে ইবনু উবাইদ বলেন—এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করলেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাবার পূর্বে অন্য এক মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেললেন। ঘটনার বিচারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে একশ' বেত্রাঘাত করে এক বছরের নির্বাসন দিলেন।[৮০] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা না করে বেত্রাঘাত করেছেন। কারণ, তিনি মুহসিন বা সংরক্ষিত ছিলেন না। অর্থাৎ 'ইহ্‌সান' এর এক শর্ত [স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ] তার মধ্যে পাওয়া যায়নি।-[আরো জানতে হলে দেখুন-'যিনা' শিরোনাম]

২. অপবাদ আরোপকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানে ইহ্‌সান

ব্যভিচারের মিথ্যে অপবাদের শাস্তির জন্য ঐ সমস্ত শর্ত পাওয়া জরুরী যা ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট। উপরন্তু আরো দু'টো শর্ত পাওয়া প্রয়োজন।

এক ঃ যে ব্যক্তির ওপর অপবাদ আরোপ করা হবে তার মুসলমান হওয়া। কেননা কাফিরদের ওপর অপবাদ আরোপের জন্য শাস্তি প্রদান করা যাবে না। হাঁ, যদি কোনো মুসলমানের মায়ের ওপর মিথ্যে অপবাদ আরোপ করা হয় তবে মুসলমানের ইজ্জতের ওপর হামলার কারণে অপবাদ আরোপকারীকে শাস্তি প্রদান করতে হবে। মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পরবর্তী সকল খুলাফা-ই-রাশিদীন উক্ত অপবাদ আরোপকারীকে কোড়া [বেত্রাঘাত] লাগিয়েছেন। যদিও সেই মুসলমানের মা ইহুদী, খৃষ্টান বা অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন। এ সমস্ত মোকদ্দমায় মুসলমানের ইজ্জত আব্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।[৮১]

দুই ঃ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির ব্যভিচার থেকে পবিত্র হওয়া। যদি সেই ব্যক্তি অবৈধ বিয়ে কিংবা ফাসেদ বিয়ে করে থাকে এবং তাতে তার নিষ্কলুষ চরিত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপকারীকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭১২।
২. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৪০
৩. কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৯ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৮১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩০।
৪. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১৮।

৫. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১২২।
৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১০।
৭. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৪৮।
৮. আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৪৬।
৯. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৯৫।
১০. সুনানু বাইহাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা–১৬৬।
১১. তাজুল উরূস, ইত্‌রাহ্ শিরোনাম ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬৬ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১২২।
১২. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৬।
১৩. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭২৪ ; ৭ম খণ্ড, পৃ-৪২১।
১৪. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫২।
১৫. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫০।
১৬. কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৮৯।
১৭. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৮৯।
১৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
১৯. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
২০. কিতাবুয্ যুহদ ওয়ার রিকাক, ইবনুল মুবারক, পৃ-২৩৫ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩২১ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৫২।
২১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৫৩, সহীহ্ আল বুখারী, বাবে আইয়ামে জাহেলিয়াহ্।
২২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭০৬।
২৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৮৯।
২৪. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৬৩।
২৫. সাফওয়াতুস সাফওয়া ১ম খণ্ড, পৃ-২৬০
২৬. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭১ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫০।
২৭. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
২৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯২।
২৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৫।
৩০. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৮৯।
৩১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৮৯।
৩২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৭৪ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৮৬।
৩৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০।
৩৪. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭১৪।
৩৫. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬১৮, ৬৬৫।
৩৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬২১।
৩৭. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৩৩।
৩৮. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৩৩।
৩৯. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০১ ; সাফওয়াতুস সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬০ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৩৬।
৪০. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০১ ; সাফওয়াতুস সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬০ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৩৬।
৪১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৫ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-১০৫।
৪২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৯ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৬৮।
৪৩. আসারু আবী ইউসুফ, পৃ-৯১৩।
৪৪. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৫৪ ; মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ–৪৯৭ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ–২৭৫।

৪৫. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৫৮।
৪৬. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৭।
৪৭. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৬ ; তাফসীরে ইবনু কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ–২৭৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ–৬৮১।
৪৮. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ–৬৯৯।
৪৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৬ ; কানযুল উম্মাল ১১শ খণ্ড, পৃ-৭০ ; সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৮৮।
৫০. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫১ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২৯ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ-১০২।
৫১. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩০০।
৫২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮১।
৫৩. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২০৮।
৫৪. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২২ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৯৮; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-২২০।
৫৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৯৯ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৪২; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩২ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬১৬।
৫৬. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭০ ; মুয়াত্তা–মালেক, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৫২।
৫৭. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-১০১।
৫৮. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৯১।
৫৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮২।
৬০. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩০০।
৬১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮৫।
৬২. মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১৩ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৭৪ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৭৮ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৪১ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২০৬।
৬৩. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৭৫ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা , ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৫ ; আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৩৫ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-২২ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৭৪।
৬৪. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৫ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৫৭।
৬৫. ইখতিলাফু আবী হানীফা মাআ ইবনু আবী লাইলা—আবু হানিফা ও আবু লাইলার মধ্যে মতপার্থক্য–পৃ-৮৩।
৬৬. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৬।
৬৭. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৪।
৬৮. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-৮৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৩ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৭৯ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬।
৬৯. কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-২২।
৭০. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২১৯।
৭১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৩০।
৭২. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৭২২।
৭৩. আল মুগনী ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৭
৭৪. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৭৬।
৭৫.কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৭৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০ ; তাফসীরে তাবারী, ১৪শ খণ্ড, পৃ-২১৫।
৭৬. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯১৩।
৭৭. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৪৪।

৭৮. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩৫।
৭৯. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৭।
৮০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০৫।
৮১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৩৫।

ঈ

ঈদ [عيد]—ঈদ

- ঈদের নামাযের জন্য আযান শরীআহ্ সম্মত না হওয়া।-[দেখুন, 'আযান' শিরোনাম]
- ঈদের নামাযে ইকামতের প্রচলন না হওয়া।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]
- ঈদের নামায প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

উ

উম্মুন [ام]—মা

১. সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে মা পিতার চেয়ে বেশী হকদার।-[বিস্তারিত জানার জন্য 'হিদানা' শিরোনাম দেখুন]

২. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ছোট্ট গোলামকে তার মা থেকে পৃথক না করা।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'রিক্বুন' শিরোনাম]

উযুন [اذن]—কান

কান কেটে নেয়া কিংবা উপড়ে ফেলার অপরাধ ও তার শাস্তি।-[দেখুন 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম]

ও

ওকুবাহ্ [عقوبة]—শাস্তি

শরঈ কোনো বিধান লংঘনের দায়ে প্রদত্ত পার্থিব শাস্তিকে উকুবাহ্ বলে।

–হদ (শরীআহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'হদ' শিরোনাম দেখুন)

–তা'যীর (প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)।–(বিস্তারিত দেখুন 'তা'যীর শিরোনাম)

–কিসাস (সংঘটিত শাস্তির সমপরিমাণ শাস্তি)।–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম)

ওদীয়াহ্ [وديعة]—গচ্ছিত রাখা

১. কারো কাছে সম্পদ (গচ্ছিত) রেখে দেয়া, যেন সে কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া তার হিফাযত করে, একে ইসলামী পরিভাষায় 'ওদীয়াহ্' বলে।

২. 'ওদীয়াহ্' আমানতের একটি অবস্থা। তাই হিফাযতকারীর বাড়াবাড়ি কিংবা গাফলতি ছাড়া যদি সেই গচ্ছিত বস্তু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হিফাযতকারীর ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। সেই মালের সাথে হিফাযতকারীর মাল নষ্ট হোক বা না হোক।[১]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ওদীয়ার ব্যাপারে—যা থলের ভেতর রাখা হয়েছিলো, থলে ফেটে যাওয়ায় গচ্ছিত বস্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো—ফায়সালা দিয়েছিলেন, 'ওদীয়াহ্' (গচ্ছিত) রাখা ব্যক্তির ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।[২]

ওসিয়্যাহ্ [وصية]—ওসিয়ত

১. ওসিয়তের সংজ্ঞা

ওসিয়ত দু' প্রকার

[১.১] সম্পদের ওসিয়ত—কারো মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কথা অনুযায়ী তার সম্পদে অন্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

[১.২] মৃত্যুর পর তার সম্পদ থেকে খরচের জন্য ওসিয়ত—

[এ ধরনের ওসিয়তের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার কথানুযায়ী কারো ভরণপোষণ কিংবা কারো জন্য ব্যয় নির্বাহ করা কিংবা তার কথামত কোনো কাজ সম্পন্ন করা।-অনুবাদক]

২. ওসিয়ত বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য

যদি ওসিয়ত এমন কোনো ব্যাপারে হয় যা শরঈ দৃষ্টিতে হারাম নয় তাহলে সেই ওসিয়ত বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিয়ত করেছিলেন, তাঁর নামাযে জানাযা যেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ান।[৩]

হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওসিয়ত করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যেন হাওদা সদৃশ পর্দাঘেরা জায়গায় তাকে গোসল দেয়া হয় এবং সেখানে যেন (গোসল করানো লোকজন ছাড়া) অন্য কেউ প্রবেশ করতে না পারে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু

আনহার এ ওসিয়তের ওপর আমল করেছেন। ইমাম বাইহাকী তার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন —'মহিলাদের মরদেহ গোসল দেয়ার পদ্ধতিটি আমার কাছে মোটেই পছন্দ হয় না। একটি মাত্র কাপড় লাশের ওপর রাখা হয় যার ভেতর দিয়ে শরীরের উঁচু নীচু জায়গাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।' হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে হাবশায় অবস্থান কালে সেখানে মহিলাদের লাশ গোসল দেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেন—সে দেশে মহিলাদের লাশ গোসল দেয়ার জন্য পর্দাঘেরা কনের হাওদার মত একটি জায়গা বানিয়ে সেখানে গোসল দেয়া হয়। একথা শোনে তিনি হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ওসিয়ত করলেন, 'আমার মৃত্যুর পর যেন ঐ রকম জায়গা তৈরী করে আমাকে গোসল দেয়া হয় এবং সেখানে যেন কাউকে আসতে না দেয়া হয়।' যখন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখানে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে বাধা দেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওসিয়ত মুতাবেক এরূপ করেছেন। শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'তোমাকে ফাতিমা যেভাবে ওসিয়ত করেছে সেভাবেই তুমি কাজ কর।'[৪]

৩. ওসিয়তের পরিমাণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ (এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশই বেশী) এটি নস। কাজেই এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী ওসিয়ত করা জায়েয নয়। এজন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা করার সুযোগ দিয়েছেন।[৫] কিন্তু উত্তম হচ্ছে—এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম ওসিয়ত করা। কেননা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'যদি তোমরা ওয়ারিসদেরকে ভালো অবস্থায় রেখে যাও তবে তা ঐ অবস্থার চেয়ে উত্তম যে, তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ ওসিয়ত করা পছন্দ করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো—'এক-পঞ্চমাংশ দেয়া সহজ, এক-চতুর্থাংশ দেয়া কষ্টকর এবং এক-তৃতীয়াংশ দেয়া বিচারকের অনুমতি সাপেক্ষ।'[৬] একবার তিনি বলেছেন—'আমার কাছে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ এবং এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ ওসিয়ত করা বেশী পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করে মনে হয় সে তার ওয়ারিসদের জন্য কিছুই রাখলো না।'[৭] তিনি তাঁর সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ ওসিয়ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন—'আমি কি আমার মালের ওসিয়তের ব্যাপারে এমন অংশের ওপর সন্তুষ্ট থাকবো না, যে পরিমাণ অংশ আল্লাহ্ গানিমাতের মালে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন?' তারপর তিনি মালে গানিমত সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন—'জেনে রেখো তোমরা যে গানিমাতের মাল অর্জন কর তাতে আল্লাহ্‌র জন্য এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে।[৮]

মারজুল মাওতের (অর্থাৎ মৃত্যু পূর্ববর্তী অসুস্থতার) সময় কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি সৎকাজের উদ্দেশ্যে কোনো সম্পদ পৃথক করে রাখেন এবং তাও ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত।-[আরো দেখুন 'হাজর' শিরোনাম]

৪. ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়ত করা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ এমন আত্মীয়ের জন্য ওসিয়ত করেছিলেন যারা তাঁর সম্পদে ওয়ারিস ছিলো না।[৯] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ধরনের সিদ্ধান্তের পেছনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কার্যকরী ছিলো। তিনি বলেছেন, "ওয়ারিসদের জন্য কোনো ওসিয়ত নেই।"

ওযর [عذر]—ওযর আপত্তি

ওযর বশত সুন্নাত পরিত্যাগের অনুমতি।-[দেখুন-'বুসাক' শিরোনাম]

ওযু [وضوء]—ওযু

১. সমুদ্রের পানিতে ওযু করা

ওযুর জন্য পানি পবিত্র হওয়া শর্ত এবং সমুদ্রের পানি পবিত্র। সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করা জায়েয। সমুদ্রের পানির ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, জবাবে তিনি বলেছিলেন—"সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণীও (অর্থাৎ মাছ) হালাল।[১০]

২. প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করা

ওযু থাকাবস্থায় পুনরায় ওযু করা উত্তম। মানুষ যখন ওযু করে তখন তার গুনাহ্‌সমূহ ঝরে যায়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে ওযু করতেন। ইবনু আবী শাইবা নিজের সনদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করে নিতেন। যদি মসজিদে থাকতেন তবে বড়ো গামলা চেয়ে তার মধ্যে ওযু করতেন।[১১]

৩. মসজিদে ওযু করা

মসজিদে ওযু করা জায়েয। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে অবস্থান করলে তিনি সেখানে বসেই ওযু করতেন।-[দেখুন, 'মাসজিদ' শিরোনাম ১ম প্যারা]

৪. ওযুর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা

ওযুর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা সুন্নাত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—"বান্দা যখন ওযুর সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় তখন তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যায়। আর যদি আল্লাহ্‌র নাম না নেয় তবে শুধু ঐ অংশই পবিত্র হয় যা ওযুর সময় ধোয়া হয়।[১২]

এখানে এ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে—আধ্যাত্মিক বা মনের পবিত্রতা। শরঈ পবিত্রতা নয়। একথা অনুযায়ী যার ওপর গোসল ফরয সে শুধু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ওযু করলেই তা যথেষ্ট হবে না।

৫. ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়া

ওযুতে যেসব অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া ফরয তা শুধুমাত্র একবার ধুলেই যথেষ্ট। যদি দু'বার কিংবা তিনবার করে ধোয়া হয় তাও জায়েয। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ওযু করেছেন।[১৩]

সাঈ থেকে বর্ণিত—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ওযুতে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দু'বার করে ধুয়েছিলেন।[১৪]

৬. ওযুর সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা

ওযুর সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা সুন্নাত। যেন আঙ্গুলসমূহের মধ্যস্থিত চিপা জায়গায় পানি পৌঁছুতে পারে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ওযু করতেন তখন আঙ্গুল খিলাল করতেন এবং বলতেন—আঙ্গুলসমূহ পানি দিয়ে খিলাল করে নাও, নইলে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন দিয়ে তা খিলাল করাবেন।[১৫]

৭. মোজা ও পাগড়ির ওপর মাসেহ্ করা

[৭.১] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরুষের জন্য পাগড়ি এবং মহিলাদের জন্য ওড়নার ওপর মাসেহ্ করা বৈধ মনে করতেন। আবদুর রহমান ইবনু উসাইলা আস সানাজী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাগড়ির ওপর মাসেহ্ করতে দেখেছি।[১৬]

[৭.২] তেমনিভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মোজা এবং জুতার ওপর মাসেহ্ করাও জায়েয মনে করতেন। বর্ণিত আছে—তিনি মোজার ওপর মাসেহ্ করতেন আবার কখনো জুতার ওপরও মাসেহ্ করতেন।[১৭]

৮. ওযু নষ্টকারী বস্তু

[৮.১] রক্ত ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় হচ্ছে—রক্ত বেরুলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। নামাযের মধ্যে যার নাক দিয়ে রক্ত বেরুয় তার সম্পর্কে বলেছেন—সে নাক থেকে রক্ত পরিষ্কার করে পুনরায় ওযু করবে তারপর এসে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে। রক্ত বেরুনোর পূর্বে আদায়কৃত রাকায়াত নষ্ট করার প্রয়োজন নেই অবশিষ্ট নামায আদায় করলেই হয়ে যাবে।[১৮] মোটকথা–রক্ত বের হলেই ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

[৮.২] আগুনে পাকানো খাদ্য ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় হচ্ছে—আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবার নির্দেশ রহিত (মান্‌সূখ) হয়ে গেছে। হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে রুটি-গোশ্‌ত খেয়েছি। তাঁরা সবাই খানা খেয়ে নামায পড়েছেন কিন্তু (নতুন করে) ওযু করেননি।" আরেকবার জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রান কিংবা কাধের গোশ্‌ত খেয়ে সরাসরি নামায পড়েলেন, নতুন করে ওযু করলেন না।[১৯]

ওয়াক্‌ফ [وقف]—ওয়াক্‌ফ

সম্পদ আসল অবস্থায় রেখে কাউকে তা থেকে বিনাপ্রতিদানে কল্যাণ লাভ করার অনুমতি প্রদানকে ওয়াক্‌ফ বলে। এটি আইনসিদ্ধ একটি প্রক্রিয়া। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাড়ী ছেলের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[২০]

যার জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয। কোনো ব্যক্তি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনি কি মসজিদ সংলগ্ন হাউয বা কূপের পানি পান করেন, সে তো ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ।" হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন—"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো উম্মু সা'দ এর (ওয়াক্‌ফকৃত) কূপ থেকে পানি পান করতেন।"[২১]

ওয়াকালাহ্ [وكالة]—প্রতিনিধিত্ব/দায়িত্ব অর্পণ করা

কোনো ব্যক্তি কাউকে তার নিজের কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তাকে সেই কাজ আঞ্জাম দেয়ার ইখতিয়ার প্রদান করাকে 'ওয়াকালাহ্' বলে। শরঈ দৃষ্টিতে এরূপ করা জায়েয। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাই আকীলকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই বলে পাঠিয়েছিলেন যে—'তার অধিকারের ব্যাপারে যে ফায়সালা করা হবে তা আমার হবে। আর তার বিপক্ষে যে ফায়সালা করা হবে তার দায়িত্বও আমি বহন করবো।[২২]

ওয়াত্‌রুন [وتر]—বিত্‌র নামায

- বিত্‌র নামাযের ওয়াক্ত।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
- বিত্‌র নামায আদায়ের নিয়ম ও দু'আ কুনূত পড়া প্রসঙ্গে।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

ওয়াতিয়্যুন [وطى]—সহবাস, যৌন মিলন

স্ত্রী সহবাসকে 'ওয়াতিয়্যুন' বলে।

- বিয়ের সাথে সাথে স্ত্রী সহবাস বৈধ হওয়া।-['নিকাহ্' শিরোনাম দেখুন]
- পুরুষ বা মহিলার মলদ্বার দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ করা হারাম।-['লিওয়াতাত' শিরোনাম দেখুন]
- হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ।-['হায়েয' শিরোনাম দেখুন]
- সহবাসের পর গোসল ফরয হওয়া।-['গুস্‌ল' শিরোনাম দেখুন]
- বিয়ের আক্‌দ হওয়ার পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হওয়া।
- নিষিদ্ধ সহবাস এবং তার বিধান।-['যিনা' শিরোনাম দেখুন]
- ইহ্‌সান এর জন্য সহবাস বৈধ হওয়ার শর্ত।-['ইহ্‌সান' শিরোনাম দেখুন]
- হাজ্জে তাওয়াফে ইফাদার পর সহবাস হালাল হয়ে যাওয়া।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

ওয়ালাদ [ولد]—সন্তান

সন্তানের জন্য খরচের দায়িত্ব পিতার আবার পিতার জন্যও খরচের দায়িত্ব সন্তানের।

-[আরো দেখুন-'নাফকাহ্' শিরোনাম]

ওয়ালা [ولاء]—মালিকানা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব

আযাদকৃত গোলাম অথবা চুক্তিবদ্ধ গোলামের সম্পদে ওয়ারিস হওয়া।

–[দেখুন–'ইরছ' শিরোনাম]

ওয়াশমুন [وشم] -উল্কি আঁকা

কায়িস ইবনু আবু হাযিম (র) বলেন—'আমি আমার পিতার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি উজ্জ্বল গৌড় বর্ণের ব্যক্তি ছিলেন। আমার দৃষ্টি তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহার হাতের দিকে পড়লো। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। দেখলাম তাঁর হাতে উল্কি আঁকা।[২৩]

আমার [লেখক] বক্তব্য হচ্ছে—আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাতে যে উল্কি ছিলো তা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের আঁকা।

তথ্যসূত্র

১. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৩৮২।
২. কানযুল উম্মাল, ১৬ খণ্ড, পৃ–৬৩২।
৩. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৮০।
৪. সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৫।
৫. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬৩০।
৬. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৭০।
৭. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬২০।
৮. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-৮৮ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৬ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৭ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৮৭ ; ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬২১ ; আল মুগনী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪।
৯. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ–৮৮ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ ও ১৬শ খণ্ড, পৃ–যথাক্রমে ৮৭ ও ৬২১।
১০. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২২।
১১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬।
১২. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৩৫।
১৩. সহীহ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, ওযু শিরোনাম।
১৪. ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩।
১৫. ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৩৫।
১৬. ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫, ৩০ ; আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬০ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৬৪; আল মজমু ; ১ম খণ্ড, পৃ-৪৪৮ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩০০।
১৭. ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩০।
১৮. ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৮ ; ইস্‌তিজ্‌কার, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯১।
১৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৮ ; মারিফাতুস্ সুনান ওয়াল আছার, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯৬ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪ ; আল ই'তিবার, পৃ-৪৯ ; আল মাজমু, ২য় খণ্ড, পৃ-৬১ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৯১।
২০. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬১ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৪৫।
২১. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬০৫।
২২. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮২।
২৩. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৯৬।

ক

কাওয়াদ [قود]—প্রতিশোধ গ্রহণ

১. সংজ্ঞা

কিসাসকে [ইসলামী আইনের পরিভাষায়] 'কাওয়াদ'ও বলা হয়। [অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ করা।]

২. কিসাসের অপরিহার্যতা

যদি এমন ধরনের প্রতিশোধ হয় যা নেয়া সম্ভব এবং যার জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে সে যদি মাফ না করে তাহলে প্রতিশোধ বা বদলা নেয়া ওয়াজিব। যার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে সে সরদার হোক কিংবা সাধারণ মানুষ তাতে কিছু যায় আসে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাকে পেশ করেছিলেন।[১]

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে অভিযোগ করলো—অমুক ব্যক্তি যুলম করে আমার হাত কেটে দিয়েছে। শুনে তিনি বললেন—যদি তোমার অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো।[২]

একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাতের উট বন্টনের জন্য এক জায়গায় গেলেন। সেখানে গিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন—"এখানে আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন প্রবেশ না করে।" এক মহিলা তার স্বামীকে বললো—"এ লাগামটি নিয়ে আপনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যান, যাকাতের উট বন্টন করা হচ্ছে। আল্লাহ্ হয়তো আমাদেরকে একটি উটের ব্যবস্থা করে দেবেন।" স্বামী সেখানে গিয়ে দেখলো, তাঁরা দু'জন উটের বাথানে প্রবেশ করেছেন। সেও পিছু পিছু সেখানে প্রবেশ করলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়ে বললেন—"তুমি এখানে কেন এসেছো?" একথা বলে তার হাত থেকে লাগাম নিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। যখন তিনি অবসর হলেন তখন তাকে ডেকে এনে তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন—"তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন—"না, আল্লাহ্‌র শপথ! এ প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।" ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিলেন—"আপনি এটিকে নিময় হিসেবে চালু করবেন না।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন–'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে আমার পক্ষ থেকে কে জামিন হবে?' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'অন্যভাবে তাকে খুশী করে দিন।' তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন—"তাঁকে হাওদাসহ একটি উট, একটি চাদর এবং ৫টি দীনার দিয়ে দাও।" এভাবে তিনি তাকে খুশী করে দিলেন।[৩]

৩. প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়ম

অত্যাচারীর কাছ থেকে ঠিক সেভাবেই প্রতিশোধ নিতে হবে যেভাবে সে অত্যাচার করেছিলো। যে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে বিনিময়ে তাকেও তলোয়ার দিয়েই হত্যা করতে

হবে। যে কারো মাথা দু' পাথরের মাঝে রেখে থেতলে দেয় তার মাথাও অনুরূপ দু' পাথরের মাঝে রেখে থেতলে দিতে হবে। তদ্রূপ যদি কারো নাক কান কেটে বিকৃত করে দেয়া হয় তবে তাকেও তার নাক কান কেটে দিতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন— লাশের নাক কান কেটে নেয়া থেকে বিরত থাকো। কারণ, এটি গুনাহ্‌র কাজ, ঘৃণিত কাজতো বটেই। অবশ্য কিসাসের ক্ষেত্রে এরূপ করা যেতে পারে।[৪]

৪. কিসাসের দণ্ড প্রয়োগের সময় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তবে তা কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।-[দেখুন-'জিনাইয়াহ্‌' শিরোনাম]

কাতউন [قطع]—কেটে ফেলা, পৃথক করা

চুরির অপরাধে হাত কেটে দেয়া।-[দেখুন–'সারিকাহ্‌' শিরোনাম]

কাত্‌ল [قتل]—হত্যা

কারো জীবন শেষ করে দেয়াকে 'কাত্‌ল' বলে।

- ইচ্ছেকৃত ও ভুলে হত্যা করার বিধান।-['জিনাইয়াহ্‌' শিরোনাম দেখুন]
- বন্দীকে হত্যা করা।-['আসির' শিরোনাম দেখুন]
- মুরতাদকে হত্যা করা।-[রিদ্দাহ্‌' শিরোনাম দেখুন]
- চুরির অপরাধে যার উভয় হাত এবং উভয় পা কেটে ফেলা হয়েছে তাকে হত্যা করা। -['সারিকাহ্‌' শিরোনাম দেখুন]
- হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]
- কুকুর হত্যা করা।-['কালবুন' শিরোনম দেখুন]

কা'বাহ্‌ [كعبة]—কা'বা ঘর

কাবা শরীফের গেলাফ ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাতান কাপড় এবং ইয়েমেনী চাদর দিয়ে কা'বা ঘরের গেলাফ দিয়েছিলেন।[৫]

কাফ্‌ফারাহ্‌ [كفارة]—প্রতিকার, কাফ্‌ফারা

অপরাধ মার্জনার জন্য আল্লাহ্‌র দেখানো পদ্ধতি ব্যবহারের নাম কাফ্‌ফারা।

- শপথের কাফ্‌ফারা।-[দেখুন–'ইয়ামীন' শিরোনাম]

কাফান [كفن]—কাফন

মৃতকে কাফন পরানো।-[দেখুন-'মাওত' শিরোনাম]

কাফায়াত [كفاءة]—সমতা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে আরবের সমস্ত মুসলমান বিয়ের ব্যাপারে একে অপরের সমান। অর্থাৎ কুফুর দিকে সমান। এ জন্য তিনি নিজের বোনকে একজন অকুরাইশ আশআছ ইবনু কায়িসের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।[৬]

ক্বাবয [قبض]—আয়ত্বে নেয়া, হাতের মুঠোয় ধারণ করা

হিবা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য তা আয়ত্বে নেয়া শর্ত।-['হিবা' শিরোনাম দেখুন]

কাযা [قضاء]—ফায়সালা করা

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য তাঁর নিকট আসতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এ কাজের ভার খুলাফা-ই-রাশিদীনের ওপর এসে পরে। তারপর সেইসব সাহাবাদের ওপর যাঁরা ফতোয়া প্রদান করতেন। ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবাগণ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব নিতেন না শুধু রায় প্রদান করতেন। লোকদের মন-মানস ইসলামী শরীআহ্‌র প্রতি এতোই নিবিষ্ট ছিলো যে, তারা তাঁদের ফতোয়াকে আদালতের রায়ের সমতুল্য মনে করতেন। এজন্য প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দিষ্ট কোনো বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন মনে করেননি। এমন কি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন মনে করেননি। আবদুর রাজ্জাক তাঁর কিতাব মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে রিওয়ায়েত করেছেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত কাউকে বিচারক নিয়োগ করে যাননি। এমনকি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও না। তবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর খিলাফতের বিস্তৃতি লাভ করায় তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লোকদের পারস্পরিক দেন-দরবারের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৭] ইবনু সা'দ তাবকাতে বর্ণনা করেছেন—'হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম ব্যক্তি যিনি শহরে বিচারক নিয়োগ করেছেন। সম্ভবত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালনকালে বেদুঈনদেরকে ইসলামের বিপরীত আচরণ করতে দেখে ধারণা করেছিলেন যে, বিচারক নির্ণয় করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ জন্য তিনি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর বলেছিলেন—'আমার কিছু সাহায্যকারীর প্রয়োজন।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'বিচার-ফায়সালার দিকটা আমি সামলাবো।' আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'বাইতুলমালের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।' অতপর তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিচার-ফায়সালার ভার এবং আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইতুলমালের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এক বছর পর্যন্ত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে দায়িত্ব পালন করলেন কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি মামলাও তাঁর নিকট এলো না। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বিশ্বাস জন্মালো যে, এখনো মানুষ নেকীর পথেই আছে। এজন্য তিনি আর কাউকে বিচারক নিয়োগ করেননি।[৮]

২. বিচারক অন্য কাউকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করা

কোনো বিশেষ মামলায় গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য যদি বিচারক তাঁর সহকারী বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চান তবে তা জায়েয আছে। অতপর সেই প্রতিনিধি যা ফায়সালা করবেন তা কার্যকর করার ইখতিয়ার প্রধান বিচারকের। ইবনু মাজিদা সাহ্‌মী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—এক ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হয়। আমি তার কানের কিছু অংশ কেটে দেই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজ্জে চলছেন এমন সময় এ মামলা তাঁর কাছে দায়ের করা হলো। তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—একটু দেখ, এ মামলা কিসাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাঁ সূচক জবাব দিয়ে হাযামকে

ডাকতে বললেন। যখন তিনি হাযামের নাম উচ্চারণ করেছেন তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন—'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি আমার খালাকে একজন গোলাম দান করেছি। আমি আশা করি আল্লাহ্ আমার খালার জন্য তার বরকতের কারণ বানিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি তাকে হাযাম, কসাই অথবা স্বর্ণকার বানাতে নিষেধ করেছি।[৯]

৩. বিচার-ফায়সালার উৎস

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে নির্ভরতার দৃষ্টিকোণ থেকে শরঈ বিধানের উৎসের স্তর আছে। যার মধ্যে প্রথমে আল কুরআন, তারপর সুন্নাতে রাসূল এবং সর্বশেষ ইজতিহাদের স্তর। ইমাম বাইহাকী তাঁর সনদে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন—তিনি কোনো মামলার রায় দিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসন্ধান করতেন। সেখানে না পেলে সুন্নাতে রাসূলের দ্বারস্থ হতেন। যদি ফায়সালা পেয়ে যেতেন তবে সেই অনুযায়ী রায় দিতেন। না পেলে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন তারা এ ধরনের ঝগড়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ফায়সালা সম্পর্কে অবহিত আছেন কিনা। অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালার ব্যাপারে তাদের সকলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করতেন এবং বলতেন—'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের মাঝে তাঁর এমন বান্দা সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁর রাসূলের কথাকে স্মরণ রেখেছে।' যদি এভাবে তিনি ফায়সালা করতে না পারতেন তখন আলিম ও বিজ্ঞ লোকের সমাবেশ আহ্বান করতেন। তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যে কথার ওপর তাঁরা সবাই একমত হতেন তিনি তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করতেন। আর যদি তাঁরা একমত হতে না পারতেন, তাহলে তিনি নিজের ইজতিহাদ মুতাবেক ফায়সালা করে বলতেন—'যদি এ ফায়সালা সঠিক হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে তা আমার দূর্বলতা। এজন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।[১০]

৪. বিচারে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার উপায়

যখন বিচারক বা আদালতের কাছে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন তার আলোকে রায় প্রদান করা বিচারক বা আদালতের জন্য ওয়াজিব। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

[৪.১] সাক্ষ্য ঃ সাক্ষ্যের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয় এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত।

-[দেখুন, 'শাহাদাহ্' শিরোনাম]

[৪.২] স্বীকারোক্তি ঃ অপরাধীর স্বীকারোক্তিতেও সত্য প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে সকল উম্মতের ঐকমত্য হয়েছে।-[দেখুন, 'ইকরার' শিরোনাম]

[৪.৩] শপথ ঃ যদি অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার না করে কিংবা তার কোনো সাক্ষ্য না পাওয়া যায়, তবে শপথের মাধ্যমেও সত্য প্রমাণিত হয়।

[৪.৪] শপথের সাথে সাক্ষ্য ঃ যদি সাক্ষ্যের সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহলে তার সাথে শপথও করতে হবে। যেমন বাদী একজন মাত্রসাক্ষী উপস্থিত করলেন। এ ক্ষেত্রে বিচারক বাদীর নিকট থেকে শপথও গ্রহণ করবেন। যদি বাদী শপথ করেন তাহলে বিচারক তার পক্ষে রায় দেবেন। আর যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে বিবাদীকে শপথ করাতে হবে। আবদুল্লাহ্

ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাক্ষ্য গ্রহণের সাথে সাথে শপথও করাতে দেখেছি।[১১]

[৪.৫] বিচারকের প্রজ্ঞা ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, বিচারক নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে হদের ব্যাপারে ফায়সালা দিতে পারেন না। তিনি বলেছেন —'যদি আমি এমন ব্যক্তিকে পাই যার সম্পর্কে বুঝতে পারি যে, তার ওপর হদ প্রয়োগ করা চলে তবু আমি নিজে (নিজের সিদ্ধান্তক্রমে) তার ওপর হদ প্রয়োগ করবো না কিংবা কাউকে করতে বলবো না। যতোক্ষণ আমার সাথে অন্য কেউ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত না থাকবে।[১২]

–(দেখুন-'হদ' শিরোনাম)

কাসামাহ্ [قسامة]—পরস্পর শপথ করা

কোনো মহল্লা বা জনপদে লাশ পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারী অজ্ঞাত হলে ঐ মহল্লা বা জনপদের লোকদের থেকে হত্যার ব্যাপারে শপথ নেয়াকে 'কাসামাহ্' বলে।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম]

ক্বাযফ [قذف]—ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া

১. সংজ্ঞা

কারো বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করাকে 'ক্বাযফ' বলে।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো পিতা তার সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে পরোক্ষভাবে সন্তানের মায়ের ওপর যিনার অপবাদ আরোপিত হয়। এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন—'এ আমার ছেলে, যে আমাকে তার জন্মদাতা হিসেবে অস্বীকার করে।' তিনি বললেন—'ওকি সত্যিই তোমার ছেলে ?' তিনি হাঁ সূচক জবাব দিলেন। তখন তিনি চাবুক দিয়ে ছেলেটির মাথায় আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—'মাথায় শয়তান ঢুকেছে ! মাথায় শয়তান ঢুকেছে !' তারপর বললেন—'অজ্ঞাত কোনো বংশের সাথে সম্পর্ক দাবী করা অথবা কোনো বংশসূত্রকে অস্বীকার করা চাই তা রসিকতার ছলেই হোক না কেন তা আল্লাহ্‌র সত্বাকে অস্বীকার করারই নামান্তর।[১৩]

২. অপবাদ আরোপের শাস্তি স্বরূপ হদ প্রয়োগের শর্ত

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শাস্তি দেয়ার শর্ত হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তাকে অবশ্যই মুহসিন অর্থাৎ বুদ্ধিমান, বালেগ, স্বাধীন মুসলিম ও চরিত্রবান হতে হবে। হাঁ যদি এমন কোনো অমুসলিমের ওপর অপবাদ লাগানো হয়, যিনি কোনো মুসলমানের পিতা অথবা মা। তবু অপবাদ আরোপকারীর বিরুদ্ধে হদ প্রয়োগ করা হবে। ঐ শুধু মুসলমানের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার্থে। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পরবর্তী সকল খলীফা মুসলমানদের ইজ্জত ও সম্মানের খাতিরে ঐ ব্যক্তিকে চাবুক লাগিয়েছেন যে কোনো মুসলমানের মাকে ব্যভিচারী বলে ডেকেছে। যদিও তিনি (মা) ইহুদী অথবা খৃষ্টান হন।[১৪]

৩. ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আন নূরে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

"যারা সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তার পক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০ ঘা চাবুক লাগাবে এবং কোনো দিন আর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরা ফাসিক।"-(সূরা আন নূর ঃ ৪)

এ শাস্তি গোলামের জন্য অর্ধেক। এই কারণে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপবাদ আরোপকারী গোলামকে চল্লিশ ঘা চাবুক মারতেন। আবদুর রহমান ইবনু আমির ইবনু রবীআ' রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অপবাদ আরোপকারী গোলামকে শুধু চল্লিশ ঘা চাবুক মেরেছেন।[১৫]

৪. গালিগালাজ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে কোনো শাস্তি নেই।-['সাব্বুন' শিরোনাম দেখুন]

ক্বারয [قرض]—ঋণ, কর্জ

কোনো জিনিস এই শর্তের ওপর নেয়া যে, ঠিক অনুরূপ জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হবে। একে 'কারয' বলে।

০ বাইতুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ।-['ইমারাত' শিরোনাম দেখুন]

কালবুন [كلب]—কুকুর

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুকুর মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনু জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুকুর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খাটের নিচে ঘুমিয়েছিলো। আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন—'আব্বু ! আমার কুকুর ?* আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আমার এ ছেলের কুকুরটিকে তোমরা মেরো না।' তার কথার ওপর ভিত্তি করে কুকুরটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো।[১৬]

কালাম [كلام]—কথাবার্তা

১. সংজ্ঞা

'কালাম' অর্থ মুখ থেকে অর্থবোধক বাক্য বা শব্দ নির্গত হওয়া।

২. কথাবার্তা থেকে নিজেকে নিজে বিরত রাখা

জাহেলী যুগে লোকেরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে চুপ থেকে রোযা থাকতো। ইসলাম এ প্রথাকে বাতিল করে দিয়েছে। কথাবার্তা না বলে চুপ থেকে রোযা রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আহমাস গোত্রের এক মহিলার

---

* হযরত জাফর তাইয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তার বিধবা স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে করেন। তার সাথে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট ছেলে আবদুল্লাহ্ মায়ের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে চলে আসলে এবং সেখানেই থাকেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।-(লেখক)

তাবুতে প্রবেশ করলেন, যার নাম ছিলো যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা। দেখলেন সে কোনো কথাবার্তা বলছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'সে এমন করছে কেন ? বলা হলো—'সে কোনো কথা না বলে হাজ্জ করার নিয়ত করেছে। তিনি তাকে কথা না বলার মানত পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে বললেন—'ইসলাম এটিকে অনুমোদন করে না। এতো জাহেলী যুগের কথা।' একথা শুনে সেই মহিলা কথা বলা শুরু করে দিলেন।[১৭]

৩. অশ্লীল কথার জন্য শাস্তি দেয়া।-['তা'যীর' শিরোনাম দেখুন]
০ খুতবার সময় খতীবের সাথে কথা বলা।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
০ বাকশক্তি রহিত করার অপরাধ ও তার শাস্তি।-['জিনাইয়াহ' শিরোনাম দেখুন]

কিতাবিয়্যু [كتابى]—আহ্‌লে কিতাব

ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে আহ্‌লে কিতাব (বা কিতাবিয়্যু) বলে।
০ আহ্‌লে কিতাবদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা।-[দেখুন-'জিযিয়াহ্' শিরোনাম]

ক্বিরান [قران]—একত্রিত করা, কিরান হাজ্জ

০ হাজ্জে কিরান অর্থাৎ দু' হাজ্জ একত্রে মিলিয়ে আদায় করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

কিরাবাহ্ [قرابة]—আত্মীয়তা

০ আত্মীয়তার ভিত্তিতে ওয়ারিসের হক।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]
০ আত্মীয়ের জন্য ব্যয় করা।-['নাফকাহ্' শিরোনাম দেখুন]

ক্বিসমাহ্ [قسمة]—অংশ, বণ্টনযোগ্য বস্তু

বণ্টন করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জায়েয মনে করতেন না। আওফ ইবনু মালিক আশযায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি সেই যুদ্ধে (অর্থাৎ 'গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল') অংশগ্রহণ করেছিলাম যে যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। এমন কতিপয় লোকের কাছ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম যারা একটি উট যবেহ করে রেখেছিলো কিন্তু তা টুকরা করতে জানতো না। অবশ্য আমি কসাইর কাজ পারতাম। তাদেরকে বললাম—যদি আমাকে এক-দশমাংশ প্রদান করেন তাহলে আমি এটি কেটে টুকরো করে বানিয়ে দিতে পারি। তারা রাজী হলো আমি একটি ছুরি নিয়ে তাদের গোশতগুলো কেটে টুকরো করে দিয়ে, আমার ভাগের অংশ নিয়ে সাথীদের কাছে চলে এলাম। আমরা গোশ্‌ত পাকিয়ে খেয়ে নিলাম। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে চাইলেন এ গোশ্‌ত কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি সবকিছু খুলে বললাম। তারা উভয়ে বলে উঠলেন—আওফ ! আল্লাহ্‌র কসম, তুমি কাজটি ভালো করোনি। আমাদেরকে এ গোশ্‌ত খাইয়ে।' অতপর তাঁরা বমি করে সবটুকু ফেলে দিলেন।'[১৮]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ জন্যই বমি করে ফেলেছিলেন, আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু গোশ্‌ত বণ্টনের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন, এটিকে তিনি বৈধ মনে করেননি।

ক্বিসাস [قصاص]—প্রতিশোধ, কিসাস

অপরাধী অপরাধ সংঘটনের সময় যে আচরণ করেছিলো তার সাথে ঠিক অনুরূপ আচরণ করার নাম কিসাস।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

০ কিসাসের সময় হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি কেটে বিকলাঙ্গ করা।

-(দেখুন, 'মুছলাহ্' শিরোনাম)

০ কিসাসের শাস্তি ভোগ করার পূর্বেই অপরাধীর মৃত্যু হলে।

-[দেখুন, 'সিরাইয়াহ্' শিরোনাম]

কুউ'দ [قعود]—বসা

১. নামাযে তাশাহুদের জন্য বসা।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

২. কারো জায়গায় বসা ঃ কোনো জায়গা থেকে কাউকে উঠতে দেখে তার অনুমতি ছাড়া সেই জায়গায় গিয়ে বসা মাকরূহ্। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়েছিলো। তাঁকে আসতে দেখে এক ব্যক্তি নিজের জায়গা থেকে ওঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন—"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে বলেছেন–কাউকে নিজের জায়গা থেকে উঠতে দেখে কেউ যেন সেই জায়গায় গিয়ে না বসে পড়ে।[১৯]

কুনূত [قنوت]—কুনূত

কুনূত অর্থ আল্লাহ্‌র সামনে নিজের বিনয় ভাব প্রকাশ করা।

ফযরের নামাযে কুনূত পড়া।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

বিত্‌র নামাযে কুনূত পড়া।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

কুফর [كفر]—কুফরী

১. ইসলামকে অস্বীকার করার নাম 'কুফর'।

২. কুফরী মুসলমান এবং কাফিরের মধ্যে ওয়ারিসী স্বত্বের প্রতিবন্ধক।

-[দেখুন, 'ইর্‌ছ' শিরোনাম]

০ মুসলমানকে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায় এমন কাজসমূহ।

-['রিদ্দাহ্' এবং 'সালাত' শিরোনাম দেখুন]

০ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ।-['জিহাদ' শিরোনাম দেখুন

০ কাফির [অমুসলিম] কখনো 'মুহসান' হয় না।-['ইহ্‌সান' শিরোনাম দেখুন]

০ মুসলিম মহিলাদের সতরের প্রতি অমুসলিম মহিলাদের দৃষ্টি পড়া।

-['হিজাব' শিরোনাম দেখুন]

০ মুসলিম ব্যক্তির অমুসলিম মায়ের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপে হদ প্রয়োগ।

-['কাযফ' শিরোনাম দেখুন]

কুবলাহ্ [قبلة]—চুমো

'তাকবীল' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

কুরআন [قران]—কুরআন মজীদ

প্রসঙ্গ কথা

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী অবতীর্ণ হতো তখন ওহী লেখকগণ তা কাপড়ের টুকরায়, সাদা পাতলা মসৃণ পাথরে, খেজুরের ডাল প্রভৃতির ওপর লিখে রাখতেন। সেখান থেকে অন্যান্য সাহাবাগণ কাপড়ের টুকরায় লিখে নিতেন। আবার কেউ কেউ হিফ্‌য [কণ্ঠস্থ] করেজ রাখতেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন, তখন মানুষের স্মৃতিপটে এবং কাপড়ের টুকরার ওপর আল কুরআন সংরক্ষিত ছিলো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় যখন চারদিকে মুরতাদদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়। বিশেষ করে বনী হানফিয়া গোত্রের মুসায়লামা কায্‌যাব ও তার সাথীদের দৌরাত্ম চরম আকার ধারণ করে তখন তিনি মুসলমানদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। অভিযানে অনেক লোক হতাহত হয়। তার মধ্যে হাফিযে কুরআন-ই ছিলেন সত্তরজন। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে হলো এভাবে হাফিযগণ শহীদ হতে থাকলে কুরআন সম্পর্কে মানুষ মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে চলতে থাকলে কুরআনের কোনো কোনো অংশ আমাদের থেকে হারিয়েও যেতে পারে অথবা তার বিন্যাসে কোনো আয়াত সম্পর্কেও বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, লিখিত রূপে সংরক্ষণও তো খুব একটা নেই। যা আছে শুধু কিছু কাপড়ের টুকরার মধ্যে। একথা চিন্তা করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন—'আল কুরআনের ব্যাপারে লোকদেরকে সামলান।' একথা বলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, কুরআন মজীদকে একত্রিত করে লিখিত আকারে মানুষের হাতে পৌছানোর ব্যবস্থা নিন। তিনি বললেন—'আমি সে কাজ কীভাবে করতে পারি যে কাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি?' ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন—'আল্লাহ্‌র শপথ! আল কুরআনের সংকলন এতো উত্তম কাজ।' তারপর তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বার বার বলতে লাগলেন এবং এ ব্যাপারে এতবেশী জোর দিলেন যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের সবগুলো লিখাকে একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহুকে যিনি ওহী লেখক এবং হাফিযে কুরআন ছিলেন—ডেকে আল কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজে অপারগতা প্রকাশ করলেন। অবশ্য গুরুত্ব বুঝানোর পর তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—'যদি এরা আমাকে কোনো পাহাড়কে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে বলতো তা আমার কাছে এ কাজ থেকে সহজ মনে হতো।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা দু'জন ততোক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের কোনো আয়াত গ্রহণ করতেন না যতোক্ষণ তার পক্ষে অন্য দু'জন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান না করতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই উভয় মনীষী অক্লান্ত শ্রমের মাধ্যমে কুরআন সংকলন সমাপ্ত করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝিয়ে দেন। তিনি তা মুখস্থ করে নেন। আজীবন সেই কপিটি তাঁর হিফাযতেই ছিল। মৃত্যুকালে তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে তা পাঠিয়ে দেন।

১. ই'রাবে কুরআন

ই'রাবে কুরআন বলতে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি আল কুরআনকে সহীহ্ শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য এবং প্রত্যেকটি অক্ষরের সঠিক উচ্চারণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। যা হরকত প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'কুরআনের একটি আয়াত মুখস্থ করার চেয়ে তা সঠিক ও শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।[২০]

২. তাফসীরে কুরআন

যে আয়াতের ভাষ্য সম্পর্কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু না জানতেন সে আয়াতের ব্যাপারে তিনি মুখ খুলতেন না। একবার তাঁর নিকট 'ওয়া ফাকি হাতাও ওয়া আব্বা' আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন—'কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দেবে, কোন্ জমিন আমাকে বহন করবে যদি আমি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে জানি না এমন বিষয়ে কথা বলি।'[২১]

৩. আল কুরআনের সিজদা

সাহাবা কিরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, মুফাচ্ছাল* সূরাসমূহে সিজদার আয়াত আছে কি নেই। অনেকের ধারণা মুফাচ্ছাল সূরাসমূহে কোনো সিজদার আয়াত নেই। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মতের প্রবক্তাদের অন্যতম ছিলেন। আবার অনেকে মুফাচ্ছাল সূরাসমূহে তিনটি সিজদার আয়াতের কথা বলেছেন।[২২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যতম। ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা ইন্‌শিকাক এবং সূরা আলাক এ সিজদার আয়াতের কথা বলতেন।[২৩]

৪. আল কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীয ও ঝাড়ফুক করা।-['রুকাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

৫. আল কুরআনের ক্রয়-বিক্রয়।-[বায় শিরোনাম দেখুন]

কুরাইশ [قريش]—কুরাইশ গোত্র

যতোক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে ততোক্ষণ খিলাফত কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে।-['ইমারাত' শিরোনাম দেখুন]

কুরু [قروء]—হায়েয

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের এ আয়াতে–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ط

'তালাকপ্রাপ্তা তিন কুরু' পর্যন্ত [বিয়ে থেকে] নিজেকে বিরত রাখবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

কুরু' [قروء] শব্দের অর্থ করেছেন হায়েয বা ঋতুকাল।[২৪]

---

* [সূরা ক্বাফ থেকে অথবা অনেকের মতে সূরা আল হুজুরাত থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাচ্ছাল বলা হয়—অনুবাদক]

তথ্যসূত্র

১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৬৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৬৯-৭১।
২. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৬৬৩।
৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
৪. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৯।
৬. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৮৪।
৭. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক–৮ম খণ্ড, পৃ–৩০২ ; আখবারুল কাযাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ-১০৫।
৮. আখবারুল কাযাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ-১০৪।
৯. আখবারুল কাযাহ ১ম খণ্ড, পৃ–১০২।
১০. কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৯৮।
১১. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৭৩ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮২৫ ; আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৫১।
১২. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪২৬ ; কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ, পৃ-২১২।
১৩. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২০৭ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৮২।
১৪. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৩৫।
১৫. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫১ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬১।
১৬. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০১।
১৭. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৪০ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৭২২।
১৮. সীরাতে ইবনু ইসহাক গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল শিরোনাম ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৭৫।
১৯. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-২২২।
২০. কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২৭ ; তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-৫।
২১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬২ ; কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২৭।
২২. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬১৬।
২৩. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৬ ও 'সুজুদ' শিরোনাম দেখুন।
২৪. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫২।

খ

খুত্‌বাহ্ [خطبة]—বক্তৃতা, খুত্‌বা

০ জুমআর নামাযের খুত্‌বা।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

০ ঈদের নামাযের খুত্‌বা।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

খুফ্‌ফুন [خف]—মোজা

০ মোজার ওপর মাসেহ্ করা।-[দেখুন, 'ওযু' শিরোনাম]

০ যারা হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাধবে তাদের জন্য মোজা পরা নিষেধ।-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

খিমার [خمار]—ওড়না

'খিমার' এমন ধরনের চাদর বা ওড়নাকে বলে যা মাথাসহ চেহারার একটি অংশকে ঢেকে ফেলে।

০ ওযুর সময় ওড়নার ওপর মাসেহ করার বৈধতা।-[দেখুন, 'ওযু' শিরোনাম]

খিযাব [خضاب]—রঙানো, খিযাব লাগানো

১. হাত-পা অথবা চুল-দাড়ি মেহেদী অথবা অন্য কিছু দিয়ে রঙানোকে 'খিযাব' বলে।

২. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুলে মেহেদী এবং 'ওয়াসমাহ'-এর খিযাব লাগাতেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মেহেদী এবং ওয়াস্‌মাহ-এর 'খিযাব' ব্যবহার করতেন।[১] আবু জা'ফর আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চুল-দাড়ি এমন লাল বর্ণের দেখেছি, যেন ঝাউগাছের চেরা লাকড়ি।[২]

খিয়ানাত [خيانة]—খিয়ানত

১. আমানতের গড়বড় করাকে এখানে খিয়ানাত বা খিয়ানাহ্ বলা হয়েছে। যেমন কেউ কারো কাছে কিছু জিনিস গচ্ছিত রাখলো কিন্তু সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলো।

২. খিয়ানত চুরি নয়। এ জন্য খিয়ানতকারীর হাত কাটা যায় না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'খিয়ানতের জন্য হাত কাটার দণ্ড দেয়া যাবে না।'[৩]

খাইলুন [خيل]—ঘোড়া

ঘোড়ার ওপর যাকাত নেই।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

খাতাম [خاتم]—আংটি

১. পুরুষদের রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রূপার আংটি ব্যবহার করতেন।[৪]

২. যে কোনো হাতে আংটি ব্যবহার করা জায়েয। ডান হাতে হোক কিংবা বাম হাতে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাম হাতের আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতেন।[৫]

৩. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক আংটির ওপর খুদাই করা ছিলো– نعم القادر الله ['কত উত্তম ক্ষমতাবান আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা'][৬], অপর আংটিতে খুদাই করা ছিলো– عبد ذليل لرب جليل ['পরাক্রমশালী প্রতিপালকের নগণ্য এক বান্দা']।[৭]

খামর [خمر]—মাদক দ্রব্য

১. নেশা হয় এ ধরনের সকল জিনিসই 'খামর'।

২. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলী যুগে কখনো মদ পান করেননি। এমনকি ইসলাম গ্রহণের পর মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও কোনো দিন তা স্পর্শ করে দেখেননি। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম পূর্ব জীবনে কোনো দিন মাদক দ্রব্য হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেননি। এমনকি ইসলাম গ্রহণের পরও।[৮]

৩. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদক দ্রব্য সেবনকারীকে ৪০ ঘা চাবুক মারতেন। আবার কখনো চাবুকের পরিবর্তে জুতা পেটা করতেন। কখনো কখনো কাপড়ের মাথায় গিঁট দিয়ে তা দিয়েই পেটাতেন। আবার অনেক সময় বেত্রাঘাত করতেন। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—'তিনি মাদক দ্রব্য সেবনকারীকে চল্লিশ ঘা জুতা মেরেছেন।[৯]

৪. মাদক দ্রব্য সেবন কবীরা এমন অপরাধ যার কারণে 'হদ' জারী করা হয়। আর যে সমস্ত অপরাধে হদ জারী করা হয় তা থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করা উত্তম।–(আরো দেখুন, 'হদ' শিরোনাম)

খালওয়াহ [خلوة]—নিভৃতস্থান, একাকিত্ব

১. পুরুষ মহিলার ব্যাপারে 'খালওয়াহ্' এমন নিভৃত জায়গাকে বলে যেখানে তারা ইচ্ছে করলে দৈহিক সম্পর্কস্থাপন করতে পারে।

২. স্বামী-স্ত্রীর 'খালওয়াহ্' হলে স্বামীর ওপর মোহর অবশ্য প্রদেয় (ওয়াজিব) হয়ে যায় এবং স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দত' পালনও অপরিহার্য (ওয়াজিব) হয়ে যায়।–[দেখুন, 'ইদ্দাত' এবং 'নিকাহ' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৯১-৯২ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৮৮ ; মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৫ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৫৪।
২. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৮৮।
৩. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২১০।

৪. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩২২।
৫. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৮২।
৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ- ৬১২।
৭. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৩৭।
৮. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৬৭।
৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৭৭ ; আল মুহাল্লী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৩৬৪ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩০৮ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৭১, ৪৮২।

গ

গানাম [غنم]—ছাগল, ভেড়া

- ছাগল ভেড়ার যাকাত।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]
- দিয়াত হিসেবে প্রদেয় ছাগল ভেড়ার পরিমাণ।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]
- ছাগল ও ভেড়ার কুরবানী এবং হাদী হিসেবে তার ব্যবহার।-['আয্হিয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

গানীমাত [غنيمة]—গানিমাত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

১. সংজ্ঞা

বিদ্রোহী কাফিরদের (পরিত্যক্ত) সম্পদ যা মুসলমানগণ যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত করে তাকে 'গানিমাত' বলে।

মুরতাদের ঐ সম্পদ যা মুসলমানদের হস্তগত হয়।-['রিদ্দাহ্' শিরোনাম দেখুন]

২. গানিমাতের মালের প্রকার

[২.১] গানিমাতের মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে শুধু তারাই এ থেকে অংশ পাবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ইকরামাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু আবু জাহিলকে পাঁচশ' মুসলমানের একটি বাহিনী দিয়ে কামুক নামক স্থানে যিয়াদ ইবনু লবিদ এবং মাহাজির ইবনু আবী উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কাছে পাঠান। তাঁরা সেখানে পৌঁছার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী ইয়েমেনের বাখীরা অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলো। গানিমাতের মাল বণ্টনের সময় যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকেও অংশ প্রদান করেন। পরে এ সংবাদ পত্র মারফত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানালে তিনি লিখে পাঠান—'গানিমাতের মাল থেকে শুধু তারাই অংশ পাবে যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে।'[১] তিনি ইকরামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদেরকে অংশীদার এ জন্য বানাননি যে, তারা সেখানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি।

[২.২] অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ ঐসব খাতে ব্যয় করতে হবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল আনফালে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ

"আর একথা জেনে রেখো, কোনো বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গানিমাত হিসাবে পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে—আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয় স্বজনের, ইয়াতীম, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৪১)

[২.২ক] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ, যা গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ তা নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতেন। যা অবশিষ্ট থেকে যেত তা ফকীর ও মিসকীনদের দিয়ে দিতেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর উক্ত অংশ মুসলমানদের খলীফার জন্য নির্দিষ্ট হয়। যিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থানে তাঁর মু'আমিলাতের হিফাযতকারী। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন —'যখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে কোনো রিযিক প্রদান করেন এবং তারপর তাকে উঠিয়ে নিয়ে যান—তাহলে সেই রিযিক তাঁরও প্রাপ্য যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন।' কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই অংশ গ্রহণ করেননি। বরং তিনি তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।[২]

[২.২খ] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দের অংশ তিনি বনী হাশিম এবং বনী আবদুল মুত্তালিবদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কারণ, তাদের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং তারা তাঁকে সর্বদা সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।[৩] কিন্তু যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্‌তিকাল করলেন, তখন তাদের সাহায্য-সহযোগিতার ধারা বন্ধ হয়ে গেলো। এজন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সমস্ত মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন আর এ অংশ থেকে তাদেরকে দেয়া যাবে না। একথার ওপর উম্মতে মুসলিমার ঐক্য হয়ে গেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের অংশ জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হবে।[৪]

এজন্য মালে গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে মাত্র তিনটি খাত অবশিষ্ট রয়ে গেছে। যথা—ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফির। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গানিমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশকে পুনরায় তিন ভাগ করে ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।[৫]

৩. মুসলমানের লুণ্ঠিতমাল যদি গানিমাত হিসাবে পুনরায় তাদের হস্তগত হয়

যদি কাফিররা যুদ্ধে মুসলমানদের মালসম্পদ দখল করে নেয় এবং পুনরায় মুসলমানগণ যুদ্ধ করে গানিমাতের মালের সাথে তা হস্তগত করে নেয় তার বিধান হচ্ছে মালিক যদি তা সনাক্ত করতে পারে তবে সেই সম্পদের অধিকারের বেলায় সেই অগ্রগণ্য। গানিমাতের মাল বণ্টনের পূর্বেই তা সনাক্ত করা হোক কিংবা পরে।[৬]

৪. যদি কোনো কাফিরকে এককভাবে কেউ হত্যা করে তাহলে নিহত কাফিরের মাল-সামান গানিমাতের সাথে বণ্টন করা যাবে না। বরং এর মালিক হবেন সেই ব্যক্তি যিনি উক্ত কাফিরকে হত্যা করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যে ব্যক্তি কোনো কাফিরকে এককভাবে হত্যা করবে, নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত মাল-সামানা সেই পাবে।'[৭]

৫. সেনাপতি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কোনো সৈনিককে গানিমাত থেকে পুরস্কার স্বরূপ তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী প্রদান প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'তানফীল' শিরোনাম]

৬. গানিমাতের মাল থেকে চুরি করা।-[দেখুন, 'সারিকাহ্', 'তাযীর' এবং গুলুল 'শিরোনাম]

গিনা [غناء]—গান, সংগীত

শব্দমালাকে সুর তরঙ্গের সাথে উচ্চারণ করার নাম 'গিনা'।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সংগীতকে দোষের মনে করতেন না। কেননা এটি পাপাচার [ফিস্‌ক] নয় কিংবা পাপের উপকরণও নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য—'আমি মুহাজিরদের মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যার সুরমূর্ছনা আমার কর্ণগোচর হয়নি।[৮]

গুস্‌ল [غسل]—গোসল

১. স্ত্রী সহবাস ছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হলে গোসল অপরিহার্য (ফরয) হয়ে যায়। তদ্রূপ লিঙ্গ মহিলাদের বিশেষ অঙ্গে প্রবেশ করানো মাত্র গোসল ফরয হয়ে যায়, বীর্যপাত হোক বা না হোক।[৯] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যে কাজ দুটি হদ (অর্থাৎ চাবুক অথবা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড)কে অনিবার্য করে তুলে সে কাজে গোসলও ফরয হয়ে যায়।'[১১]

২. মৃতকে গোসল দেয়া।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]

০ ইহ্‌রাম বাধার জন্য গোসল করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

০ ইহ্‌রাম বাধার জন্য হায়েয নিফাস ওয়ালা মহিলাদেরও গোসল করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

গুলূল [غلول]—গানিমাতের সম্পদ চুরি করা

১. সংজ্ঞা

গানিমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে চুরি করাকে 'গুলূল' বলে।

২. গুলূলের শাস্তি

গানিমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে তার মালিকানা সকল মুসলমানের। অর্থাৎ সেখানে সকল মুসলমানের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। এ জন্য গানিমাতের মাল চুরির কারণে চোরের হাত কাটা যায় না। কারণ, যে সম্পদ থেকে চুরি করা হয় সেখানে তারও অধিকার থাকে। তবে এজন্য তাযীরের শাস্তি প্রদান করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুলূলের কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করতেন।[১১] যদি কারো কাছে গানিমাত থেকে চুরির মাল পাওয়া যেত তাহলে প্রথমেই তাকে একশ' ঘা চাবুক লাগাতেন তারপর তার চুল দাঁড়ি মুড়িয়ে দিতেন এবং তার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ও বাহনটি রেখে সবকিছু জ্বালিয়ে দিতেন। আর সে অপরাধীকে মুসলমানের সাথে কোনো অংশ প্রদান করতেন না।[১২] অর্থাৎ সারা জীবনই সে বঞ্চিত থেকে যেত।-[দেখুন, 'সারিকাহ্' এবং 'তা'যীর' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৫০।
২. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫০ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৭০।
৩. তাফসীরে ইবনু কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ-২১২ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪০৬, ৪০৮।
৪. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৩৩১ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৪২ ; আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৩ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৩৮ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২২৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪০৭।
৫. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪০৬।
৬. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১১১ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫২১।
৭. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৩৬।
৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৯।
৯. আল মুহাল্লী ২য় খণ্ড-পৃ-৪।
১০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪৬ ; আল ইস্তিযকার, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৪৩।
১১. কিতাবুল খারাজ-আবু ইউসুফ, পৃ-১৭২ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৩১।
১২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩২।

ছ

ছাদয়ুন [ثدى]—স্তন

স্তন ক্ষতিগ্রস্ত করা।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

জ

জাদ্দুন [جد]—দাদা

মীরাসে দাদার অংশ।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]

জাদ্দাতুন [جدة]—দাদী/নানী

মীরাসে দাদী/নানীর অংশ।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]

নানী সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতার চেয়েও বেশী হকদার।-['হিদানা' শিরোনাম দেখুন]

জিনাইয়াহ্ [جناية]—অপরাধ

আমরা জিনাইয়াহ্ শিরোনামে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

০ অপরাধী।

০ যার সাথে অপরাধ সংঘটিত হয়।

০ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানী করার অপরাধ।

০ বিভিন্ন প্রকার ক্ষত।

০ শাস্তি।

১. সংজ্ঞা

'জিনাইয়াহ' বলতে শরঈ পরিভাষায় সেসব নিষিদ্ধ কাজসমূহকে বুঝায়—যা মানুষের জীবন কিংবা কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর করা হয়ে থাকে।

২. অপরাধী স্বেচ্ছায় অপরাধ সংঘটিত করুক কিংবা ভুলে

[২.১] অপরাধী যদি জেনেশুনে অপরাধ সংঘটিত করে তাহলে তার থেকে কিসাস নেয়া ওয়াজিব। আর যদি কোনো দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এরূপ করা হয়, যেমন সে যদি বিচারক হয়, তাহলে একে অপরাধ গণ্য করা হবে না। এ জন্য কিসাসও হবে না। তবে দিয়াত প্রদান করবে অথবা ধরনের সমঝোতা করে নেবে।-[আরো জানতে হলে দেখুন 'ইমারাত' শিরোনাম]

একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত বণ্টনের জন্য এক জায়গায় গেলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন কেউ যেন বিনা অনুমতিতে এখানে না আসে। এক মহিলা তার স্বামীর হাতে উটের একটি লাগাম ধরিয়ে দিয়ে বললো—তুমি সেখানে যাও, সম্ভবত আল্লাহ্ আমাদেরকেও কোনো উট প্রদান করবেন। ঐ ব্যক্তি সেখানে গেলো। দেখলো দু'জন উটশালায় প্রবেশ করেছেন। সেও সেখানে তাদের নিকট গিয়ে দাঁড়ালো। পেছন ফিরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন —'তুমি এখানে কেন এসেছো ?' একথা বলে রাগ করে তার হাত থেকে উটের লাগাম ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। বণ্টন কাজ শেষ করে তাকে ডাকলেন। বললেন —'এবার তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর।' ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাঝখানে বলে উঠলেন—

'অসম্ভব এ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না। আপনি একে নিয়মে পরিণত করবেন না।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচাতে কে আমার জিম্মাদার হবে?' ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আপনি তাকে সন্তুষ্ট করে দিন।' তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাকরকে নির্দেশ দিলেন—ঐ ব্যক্তিকে হাওদা সহ একটি উট, একটি চাদর এবং পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দাও। এভাবে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করে দিলেন।[১]

ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে এ জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি, কারণ তাঁরা মহান খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।[২] অন্য রিওয়ায়েতে আছে—একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগ করে একজনকে একটি থাপ্পর মারেন। পরে তাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেছিলেন।[৩] তারা একথা এজন্য বলেননি যে, এটি তাদের ওপর ওয়াজিব ছিলো বরং এটি করেছিলেন লোকদেরকে সৌজন্য প্রদর্শন ও খুশী করার জন্য।

[২.২] যদি অপরাধী ভুলে কোনো অপরাধ সংঘটিত করে, তবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী দিয়াত এবং কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ مَن يَّصَّدَّقُوْا ط

"কোনো মু'মিন অপর কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে তা হতে পারে না। তবে ভুল-ত্রুটি হলে ভিন্ন কথা। যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে—একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং তার স্বজনদের রক্তপণ [দিয়াত] দেয়া। যদি তারা মাফ করে দেয় সে ভিন্ন কথা।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

[২.৩] **অপরাধীর পরিচয় পাওয়া না গেলে ঃ** যদি নিহত ব্যক্তিকে এমন গোত্র বা মহল্লার কাছে পাওয়া যায় যাদের সাথে নিহত ব্যক্তির শত্রুতা ছিল এবং হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা না যায় তাহলে তাদেরকে শপথ করতে হবে। শপথ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ঐ গোত্রের অথবা মহল্লার পঞ্চাশজন ব্যক্তি এই মর্মে শপথ করবে যে, তারা ঐ ব্যক্তির হত্যাকারী নয় এবং হত্যাকারীকে তারা চিনে না। শপথ নেয়ার পর তাদের থেকে কিসাস [হত্যার বিনিময়ে হত্যা] নেয়া যাবে না তবে দিয়াত [বা রক্তপণ] ওয়াজিব হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শপথ নেয়ার পর তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করতেন না।[৪]

৩. যার ওপর অপরাধ সংঘটিত হয়

[৩.১] **ক্রীতদাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ ঃ** হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিল—ক্রীতদাস হত্যার বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।[৫] চাই সে দাস তার মালিকানাধীনে হোক কিংবা অন্যের মালিকানাধীন। কেননা দাস মর্যাদার দিক থেকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। কাজেই মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো কিসাস হতে পারে না।

যদি ক্রীতদাস মালিকের হাতে মারা যায় তবে ঘাতক মালিককে একশ' চাবুক লাগানো হবে। এক বছর তাকে বন্দী করে রাখা হবে। এ সময়ের মধ্যে সে ফাই-এর কোনো অংশ

পাবে না। এবং তাকে একজন ক্রীতদাস মুক্তির নির্দেশ দেয়া হবে। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে আছে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রীতদাস হত্যার বিনিময়ে স্বাধীন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতেন না। বরং তাকে একশ' চাবুক মেরে এক বছর বন্দী করে রাখতেন এবং এক বছরের জন্য 'ফাই'য়ে তার অংশ মুলতবী রাখতেন, যদি এ হত্যাকাণ্ড ইচ্ছেকৃত হতো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তাতে একথাও আছে, তাকে একটি ক্রীতদাস মুক্তির নির্দেশ দেয়া হতো।[৬]

যদি নিহত ক্রীতদাস হত্যাকারীর মালিকানাধীন না হয় তবে সকলের মতে তার মূল্য ক্রীতদাসের মালিককে প্রদান করতে হবে।[৭]

[৩.২] আক্রমণকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ ঃ [আক্রমণকারী মানুষ অথবা পশু যাই হোক না কেন।]

ক. যদি আক্রমণকারী কোনো মানুষ হয় এবং তার আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে আক্রমণকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেজন্য কোনো জরিমানা নেই। একবার এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলো। তাতে হাতের ওপর দাঁত বসে গেল। যখন আহত ব্যক্তি তার হাত ছাড়িয়ে নিতে গেল তখন কামড়ে ধরা ব্যক্তির একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। উভয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে অভিযোগ করলো। তিনি দাঁত উৎপাটনকারীর কোনো জরিমানা করলেন না। বরং বললেন—'তার হাত নিজের বদলা নিয়ে নিয়েছে।'[৮]

খ. কোনো পশু যদি কারো ওপর আক্রমণ করে এবং সে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সেই পশুকে হত্যা করে ফেলে। সে হত্যা না করেও আত্মরক্ষা করতে পারতো। এমতাবস্থায় তাকে জরিমানা দিতে হবে। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে—একটি ষাড় এক লোকের ওপর আক্রমণ করে। সে তরবারী দিয়ে ষাড়টিকে হত্যা করে ফেলে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হলে তিনি তাকে জরিমানা করেন এবং বলেন—'ষাড়তো ছিলো অবুঝ এক পশু।'[৯] এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, [প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌ই জানেন] লোকটি ষাড়টিকে হত্যা না করে তাড়িয়েও দিতে পারতেন।

৪. মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানী করার অপরাধ

[৪.১] যদি কোনো ব্যক্তির এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করে দেয়া হয়, মানব দেহে যার কোনো জোড়া নেই, যেমন–জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ প্রভৃতি, সেই অঙ্গ যদি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, তা কোনো কাজে না আসে তবে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি সেই অঙ্গটি একাধিক হয় তাহলে সমস্ত দিয়াতকে সেই অঙ্গসমূহের বিপরীতে ভাগ করে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গসমূহে যে হারে পড়ে সেই পরিমাণ জরিমানা নির্ধারণ করতে হবে। যদি সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, যাতে তা পুরোপুরি অকেজো না হয়ে আংশিক অকেজো হয়ে যায় এবং সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে কিছু না কিছু উপকার লাভ করা যায়, এমত অবস্থায় একজন ন্যায়পরায়ন বিজ্ঞ ব্যক্তির ফায়সালা গ্রহণ করতে হবে। এর ভিত্তিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

[৪.২] জিহ্বার ব্যাপারে পুরো দিয়াতের ফায়সালা দিয়েছেন, যখন তা গোড়া থেকে কেটে ফেলে দেয়া হয়। যদি আংশিক কেটে ফেলা হয় তবে অর্ধেক দিয়াত প্রদানের ফায়সালা দিয়েছেন।[১০]

[৪.৩] পুরুষাংগ কেটে ফেলার দিয়াত ১০০ উট নির্ধারণ করেছেন।[১১]

[৪.৪] মেরুদণ্ডের হাড় যদি এমনভাবে ভেঙ্গে দেয়া হয়, যাতে সে যৌন মিলনের মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ দিয়াত প্রদান করতে হবে। আর যদি একেবারে অক্ষম না হয় তবে অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন—মেরুদণ্ডের হাড় যদি এমনভাবে ভেঙ্গে দেয়া হয়, পরবর্তীতে আর কোনো সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে না, তাহলে তাকে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। আর যদি মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গার পরও সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহলে অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে।[১২]

[৪.৫] দুই ঠোঁট কেটে ফেললে পূর্ণ দিয়াত [অর্থাৎ একশ' উট] আর একটি ঠোঁট কেটে ফেললে অর্ধেক দিয়াতের ফায়সালা দিয়েছেন।[১৩]

[৪.৬] কোনো মহিলার স্তনের বোটা কেটে ফেললে দশটি উট কিংবা একশ' দীনার এবং স্তন গোড়া থেকে কেটে ফেললে পনেরোটি উট জরিমানা নির্ধারণ করেছেন। আর যদি পুরুষের স্তনের মাথা কেটে নেয়া হয়, তবে পঞ্চাশ দীনার জরিমানা নির্দিষ্ট করেছেন।[১৪]

[৪.৭] কান কেটে নিলে তার দিয়াত পনেরো উট নির্ধারণ করেছেন। তাউস বলেন—প্রথম যিনি কান কেটে নেয়ার জরিমানা নির্ধারণ করেছিলেন, তিনি—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। যিনি পনেরো উট জরিমানা করেছিলেন।' এবং বলেছিলেন—'কান কেটে যাবার ফলে শ্রবণশক্তিতে কোনো প্রভাব পড়ে না। এমনকি শারীরিক শক্তিতেও কোনো ঘাটতি দেখা দেয় না। তাছাড়া দৃষ্টিকটু অংশটুকু তো চুল এবং পাগড়ীতে ঢেকে থাকে।[১৫] অর্থাৎ কানের বাহ্যিক অংশ থাকা না থাকার মধ্যে কানের উদ্দেশ্য ব্যহত হয় না। এমনকি সৌন্দর্যেও খুব একটা ঘাটতি দেখা দেয় না।

[৪.৮] চোখের পাতা নষ্ট করে দিলে এবং সমস্ত পশম পড়ে গেলে এ জন্য দশ উট জরিমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[১৬]

[৪.৯] হাত এবং পায়ের ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া হয়েছে, তা যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায়, যা সোজা করা যায় না কিংবা সোজা করলে গোটানো যায় না কিংবা পা ঝুলে থাকে, তা মাটি স্পর্শ করে না—এসব অবস্থায় অর্ধেক দিয়াত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি হাত অথবা পা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে না যায়, কিছু না কিছু কাজ তা দিয়ে করা যায়। এমতাবস্থায় দিয়াতের এতটুকু অংশ ওয়াজিব হবে, হাত অথবা পা যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১৭]

৫. বিভিন্ন প্রকার ক্ষত

[৫.১] আল মাওদুআহ্ ঃ এমন ক্ষত, যে ক্ষতের ভেতর দিয়ে হাড় দৃষ্টিগোচর হয়, চাই সে ক্ষত মাথায় হোক কিংবা মুখমণ্ডলে,[১৮] তার জন্য জরিমানা স্বরূপ পাঁচটি উট প্রদেয়।[১৯]

[৫.২] আল জায়িফাহ্ ঃ এটি এমন ধরনের ক্ষত যা পেটের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদেয়। যদি ক্ষত পেট ও পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়, তবে দিয়াতের দু-তৃতীয়াংশ প্রদান করা ওয়াজিব।[২০]

সাইয়েদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহ) বর্ণনা করেছেন—এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তীর শরীরের একদিকে বিধে অপরদিক দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। এ

বিচারের রায়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়াতের দু-তৃতীয়াংশ প্রদান করার নির্দেশ দেন।[২১]

৬. চড় থাপ্পর মারা

কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে চড় থাপ্পর মারে কিংবা বেত্রাঘাত করে অথবা কোনো রকম বাড়াবাড়ি করে, তবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে সে জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে।[২২]

৭. শাস্তি

[৭.১] কিসাস ঃ যদি জেনেবুঝে অপরাধ করা হয় এবং কিসাস নেয়া সম্ভব হয়, তবে কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধীকে মাফ করে দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা।

যদি অপরাধী থেকে কিসাস গ্রহণ করা হয়, যা জীবন নেয়ার চেয়ে কম কিন্তু কিসাসের প্রভাবে তার মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তার রক্ত বৃথা গেল। অর্থাৎ তার মৃত্যুর কারণে কোনো জরিমানা গ্রহণ করা হবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন —'শাস্তি প্রদানের সময় যদি কারো মৃত্যু সংঘটিত হয়, তবে তার কোনো দিয়াত নেই।'[২৩] –'কাওয়াদ' শিরোনাম দেখুন)

[৭.২] দিয়াত ঃ এমন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ দিয়াত প্রদান করতে হয় যা অনিচ্ছাকৃত সংঘটিত হয়ে যায়।

ক. ভুলে কোনো হত্যা সংঘটিত হলে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়। যার পরিমাণ একশ' উট। যদি উট দুষ্প্রাপ্য হয় তবে প্রতিটি উটের পরিবর্তে দু'টো করে গরু অর্থাৎ দু'শ গরু প্রদান করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যদি কারো দিয়াত স্বরূপ গরু দিতে হয় তবে দু'শ' গরু দিতে হবে।'[২৪] মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে আছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি উটের পরিবর্তে দু'টো গরু দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২৫] যদি উট সহজলভ্য না হয়ে ছাগল ভেড়া সহজলভ্য হয় তবে প্রতিটি উটের পরিবর্তে বিশটি করে ছাগল অথবা ভেড়া প্রদান করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যে ব্যক্তি দিয়াত হিসেবে ছাগল প্রদান করবে তাকে প্রতিটি উটের পরিবর্তে বিশটি করে ছাগল প্রদান করতে হবে।'[২৬] আর যদি উটের পরিবর্তে তার মূল্য পরিশোধ সহজতর হয়, তবে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মফস্বল এলাকায় যেখানে উট দুষ্প্রাপ্য সেখানে উটের পরিবর্তে নগদ মূল্যে তা পরিশোধের নির্দেশ দিতেন। এক শ' উটের নগদ মূল্য সাত শ' দীনার থেকে আট শ' দীনার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হতো।[২৭]

খ. এমন নির্যাতন যাতে মৃত্যু হয় না শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয় তার বিধান ৪ ও ৫নং এ বর্ণিত হয়েছে।

গ. যিম্মীর দিয়াত একজন মুসলমানের দিয়াতের মতো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে এ দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[২৮]

জানীন [جنين]—গর্ভস্থ সন্তান

গর্ভস্থ সন্তানকে 'জানীন' বলে।

জানীনের মীরাস ['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]

মাদী পশু যবাহ্ করার পর তার পেটে শাবক থাকলে সেটিও যবাহ্ হয়ে যায়।-[দেখুন, 'যবাহ্' শিরোনাম]

জায়িফাহ্ [جائفه]—গভীর ক্ষত

যে ক্ষত পেটের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে তাকে জায়িফাহ্ বলে। জায়িফাহ্‌র জরিমানা।

-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

জাল্‌দ [جلد]—চাবুক/বেত

০ যিনার শাস্তি স্বরূপ চাবুক মারা।-['যিনা' শিরোনাম দেখুন]

০ মাদক দ্রব্য সেবনের শাস্তিতে বেত্রাঘাত।-['খামর' শিরোনাম দেখুন]

০ মিথ্যা অপবাদের শাস্তিতে চাবুকাঘাত।-['কাযফ' শিরোনাম দেখুন]

০ তাযী'র স্বরূপ বেত্রাঘাত।-['তাযী'র এবং গুলূল' শিরোনাম দেখুন]

০ ক্রীতদাসের শাস্তি স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক।-[দেখুন, 'হদ' এবং 'কাযফ' শিরোনাম]

জিযিয়াহ্ [جزية]—জিযিয়া

১. জিযিয়া সেই কর (Tax)-কে বলে যা অমুসলিম নাগরিকের কাছ থেকে তাদের জান-মাল হিফাযত এবং সাধারণ সেবার বিনিময়ে নির্দিষ্ট অংকে গ্রহণ করা হয়।

২. যখন মুসলমানগণ অমুসলিম কোনো সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় লাভ করে এবং অমুসলিম সম্প্রদায় জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয নেই। কারণ, স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদানের স্বীকৃতি একথাই প্রমাণ করে যে, তারা তাদের এলাকায় ইসলামের প্রাধান্যকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা যদি জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যারা তোমাদেরকে জিযিয়া দেবে তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ কর। আর যারা যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।'[২৯]-[আরো জানার জন্য দেখুন, 'জিহাদ']

৩. আহলে কিতাব [অর্থাৎ ইহুদী এবং খৃষ্টান]-দের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না, যদি তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে এবং ইসলামের নেতৃত্ব কবুল করে নিয়ে ইসলামের ছত্রছায়ায় থাকতে ইচ্ছুক হয়। অগ্নিপূজক ও সূর্য পূজকদের ব্যাপারেও একই বিধান প্রযোজ্য কেননা তাদের নিকটও আসমানী কিতাবের মত বস্তু পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নিয়েছেন।[৩০]

জিহাদ [جهاد]—জিহাদ

১. সংজ্ঞা

ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ। সে যুদ্ধ কাফিরদের সাথে হতে পারে, মুরতাদদের সাথে হতে পারে এমনকি ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সাথেও হতে পারে।

এজন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন—'আল্লাহ্‌র কসম ! এরা যদি উটের পা বাধার একটি রশিও যাকাত স্বরূপ দিতে অস্বীকার করে যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে দেয়া হতো আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। নিসন্দেহে সম্পদে আল্লাহ্‌র যে হক আছে তার নাম যাকাত। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবো যারা নামায এবং যাকাতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাবে।'[৩১]

বেদুঈনদের ওপর জিহাদ ফরয নয়।-[দেখুন, 'বাদবুন' শিরোনাম]

জিহাদের জন্য ইমাম বা খলীফার অনুমোদন।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

২. মুজাহিদদেরকে আল্লাহ্ হাফেয বলার জন্য তাদের সাথে কিছু দূর যাওয়া ঃ

মুজাহিদদেরকে এগিয়ে দেয়ার জন্য কিছুদূর যাওয়া অতি উত্তম। বিশেষ করে যখন স্বয়ং খলীফা এমনটি করেন। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদেরকে সামান্য এগিয়ে দেবেন, এ কাজ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব পছন্দ করতেন। তিনি যখন সিরিয়ায় জিহাদের জন্য ইয়াজীদ ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি করে মুজাহিদদেরকে পাঠান, তখন তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য তাদের সাথে চলছিলেন। ইয়াজীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরোহী অবস্থায় এবং তিনি পায়ে হেটে। ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'হে রাসূলের খলীফা ! আপনি হেটে যাচ্ছেন আর আমি আরোহী ! হয় আপনি আরোহণ করুন, নয় আমি পায়ে হেটে যাই।' তিনি উত্তর দিলেন—'আমি আরোহণ করবো না এবং তুমি হেটেও যাবে না। আল্লাহ্‌র পথে আমার যে পদচিহ্ন পড়ছে আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করছি।'[৩২]

একবার জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারী মুজাহিদদের সাথে চলতে গিয়ে বলেছিলেন —'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি তাঁর পথে আমার পা ধূলোমলিন করার তাওফিক দিলেন।' তাঁকে বলা হলো—'কীভাবে আমাদের পা ধুলোমলিন হলো আমরা তো শুধু তাদেরকে বিদায় জানিয়েছি।' তিনি জবাবে বললেন—'আমরা তাদের যুদ্ধের সরঞ্জামাদী এগিয়ে দিলাম, তাদেরকে আল্লাহ্ হাফেয বললাম এবং তাদের জন্য দু'আ করলাম।'[৩৩]

মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য পাঠানো সৈন্যদের সাথে তিনি যুলকাচ্ছা নামক স্থান পর্যন্ত হেটে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে সেনাপতির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন।[৩৪]

৩. খলীফা নিজে সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেয়া

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খিলাফতের শেষ দিকে বিভিন্ন দায়িত্ব সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পালনের জন্য নিজেকে এমনভাবে মুক্ত রেখেছিলেন, যেন যাবতীয় ফায়সালা তিনি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে পারেন। যেখানে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের প্রয়োজন হতো সেখানে প্রখ্যাত সৈন্যদেরকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করতেন। কেননা একথা—তোমরা একজন কাজ কর কিন্তু সহস্রজন তোমাদের দেখাশুনা করে। এতো হাজার গুণ ভালো যে, একজনের জন্য সহস্রজন কাজ করে। ইবনু কাসীর বর্ণনা করেছেন—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় তাদের নেতৃত্ব প্রদানের নিয়তে মদীনা থেকে দু' মঞ্জিল দূরে যুলকাচ্ছা পর্যন্ত যান, সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাকে মদীনায় ফিরে যাবার অনুরোধ করেন এই বলে যে, আপনার অনুপস্থিতি যেন মদীনাবাসীর উদ্বেগের

কারণ না হয়। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সেখানে এগারোজন অফিসারের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।[৩৫]

ইমাম বাইহাকী রিওয়ায়েত করেছেন—যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নিযুক্ত হন তখন একদল লোক ইসলাম থেকে ফিরে মুরতাদ হয়ে যায়। তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মদীনা থেকে বেরিয়ে বাকীর নিকটবর্তী নুফাগ নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন। সেখানে পৌছে মদীনার ব্যাপারে খেয়াল হলো, এদিকে না মদীনা আক্রান্ত হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৩৬]–[আরো জানার জন্য দেখুন, 'ইমারাত্']

৪. শত্রু অমুসলিম এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া

সেনাপতির কর্তব্য হচ্ছে—শত্রু-এলাকায় রাত অতিবাহিত করে প্রভাতে আযান শোনার জন্য প্রতীক্ষা করা এবং আযান শোনা গেলে আক্রমণ না করা। আর যদি আযানের আওয়াজ শোনা না যায় তাহলে আক্রমণ করা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন তখন সেনাপতিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—তাদের [অর্থাৎ মুরতাদদের] এলাকায় গিয়ে রাত কাটাবে। যদি ভোরে আযান শোন তাহলে তাদেরকে আক্রমণ করবে না, কারণ, আযান ঈমানের নিদর্শন।[৩৭]

যদি আযান না শোনা যায় তাহলে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধের বিকল্প প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে।

৫. যুদ্ধের বিকল্প প্রস্তাব

[৫.১] যুদ্ধ শুরুর পূর্বে প্রথমে সেনাপতি অমুসলিম প্রতিপক্ষকে বিকল্প প্রস্তাব দেবেন। যে প্রস্তাবে তিনটি বিষয় থাকবে–এক ঃ ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান। যদি তারা মুসলমান হয় তবে উত্তম। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে–দুই ঃ তারা তাদের এলাকায় ইসলামের প্রাধান্য স্বীকার করে নেবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থেকে তারা তাদের জীবনযাপন করবে। বিনিময়ে জিযিয়া প্রদান করবে। তিন ঃ উপরোক্ত কোনো শর্তই না মানলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে। ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সিরিয়া অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন সেনা অফিসারদের সাথে পায়ে হেটে কিছুদূর যান। সে যুদ্ধে সেনা অফিসার হিসেবে ছিলেন ইয়াজীদ ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত সুরাহ্‌বিল ইবনু হাসানাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু। যখন তাদের সাথে সানিয়াতুল বিদা' পৌছেন তখন তাদেরকে বিদায় জানানোর প্রাক্কালে নিম্নোক্ত হিদায়াত দেন—

তোমাদের সাথে শত্রুর মুকাবেলা হলে—যদি আল্লাহ্ চান—তাহলে তাদেরকে তিনটি কথার দিকে আহ্বান জানাবে। যদি তারা তিনটি কথা মেনে নেয় তবে তোমরা হাত গুটিয়ে ফেলবে। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তাদের সাথে আর যুদ্ধ করবে না। তারপর তাদেরকে নিজেদের এলাকা ছেড়ে মুসলমানদের এলাকায় এসে বসবাস করতে বলবে। তারা মেনে নিলে বলবে, সেসব নতুন জমি আবাদ করার পর তার মালিকানা তোমাদেরই হবে যেভাবে সেখানে বসবাসরত মুসলমানের রয়েছে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণের পর এলাকা ত্যাগ করতে রাজী না হয়, তবে তাদেরকে বলে দেবে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র সেই বিধান প্রয়োগ করা হবে, যাযাবর মুসলমানের ওপর যে বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ তারা ফাই [জিযিয়া, খারাজ, ওশর] এবং গানিমাত থেকে কোনো অংশ পাবে না, হাঁ,

যদি তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে পাবে। যদি এসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে বলবে। জিযিয়া প্রদান করতেও যদি তারা অস্বীকার করে, তখন আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে।[৩৮] তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জিযিয়া দেবে তার থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবে আর যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য রুখে দাঁড়াবে তাকে হত্যা করবে।'[৩৯]

[৫.২] যেখানে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্ন দাঁড়াবে সেখানে কোনো বিকল্প প্রস্তাব দেয়া যাবে না। বরং মুজাহিদগণ রাতে সেখানে পৌঁছে প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি সেখানে ফযরের আযান শোনা যায়, তবে সেখান থেকে ফিরে আসবে। কেননা আযান হচ্ছে ঈমানের নিদর্শন। আর আযান না শোনা গেলে হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। এজন্য পূর্ব ঘোষণা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানোর সময় অফিসারদের এই হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন— 'রাতের বেলা সেখানে পৌঁছে যাবে। যে এলাকা থেকে ফযরের আযান তোমরা শুনতে পাবে সেখানে আক্রমণ করবে না। কারণ, আযান ঈমানের নিদর্শন।'[৪০]

তিনি একথাও বলেছেন—'যখন তোমরা পৌঁছুবে [এবং তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে— অনুবাদক] তখন তাদের ওপর বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়বে।'[৪১] হঠাৎ করে আক্রমণ করা বিকল্প প্রস্তাব ছাড়াই হয়ে থাকে।-[আরো দেখুন-'আযান' শিরোনাম]

৬. জিহাদে কি কি করা উচিত এবং কি কি করা অনুচিৎ

এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনা অফিসারদেরকে যেসব হিদায়েত দিয়েছিলেন তা আমরা নিচে একত্রে ধারাবাহিকভাবে পেশ করলাম।

[৬.১] যুদ্ধের নীতিমালা মেনে চলা।

[৬.২] কাপুরুষ ও দুর্বলদের বাছাই।

[৬.৩] এ রকম কোনো কাজের জন্য অগ্রসর না হওয়া যার পেছনে ধ্বংসযজ্ঞের মানসিকতা কাজ করে অথবা যার পরিণতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

[৬.৪] বিশ্বাসঘাতকতা না করা।

[৬.৫] ফল-ফসল ও গাছ-পালা ক্ষতিসাধনের মানসিকতা নিয়ে তা ক্ষতি না করা।

[৬.৬] বিনা প্রয়োজনে পশু-পাখীর ক্ষতিসাধন পরিহার করা।

[৬.৭] ঘর-বাড়ি ও অট্টালিকাসমূহ বিনা প্রয়োজনে ধ্বংস না করা।

[৬.৮] যেসব লোক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তাদেরকে হত্যা না করা।

[৬.৯] গানিমাতের মাল সংরক্ষণ করা এবং তার থেকে কোনো মাল আত্মসাৎ না করা।

[৬.১০] শত্রুর বিচ্ছিন্ন শির দেহ থেকে অন্যত্র না নিয়ে যাওয়া।

হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত সুরাহ্‌বিল ইবনু হাসনাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহু রোম সৈন্যের এক অফিসারের মাথা কেটে ওত্‌বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে মদীনায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যখন ওত্‌বা রাদিয়াল্লাহু আনহু শির নিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি এ কাজকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখলেন। ওত্‌বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন —'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! সিরিয়ার লোকজন এ রকমই করে থাকে।' তিনি রাগের

সাথে উত্তর দিলেন—'আমিও কি রোম ও পারস্যের আইন অনুযায়ী চলবো ? ভবিষ্যতে যেন এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। শুধু সংবাদ বা চিঠি-ই যথেষ্ট।' অতপর তিনি বক্তৃতা দিয়ে বললেন—'আমার নিকট রোম সেনা অফিসারের শির নিয়ে আসা হয়েছে। এর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। এ হচ্ছে অনারবদের রীতি।'[৪২]

আমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক হিদায়াত সম্পর্কে জানতে পারি, যা তিনি বিভিন্ন সময় সেনাপতিদেরকে লিখিত ও মৌখিকভাবে দিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে সম্ভবত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ হিদায়াত সেইটি, যা তিনি সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের সময় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি—সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর দীনের সাহায্য করবেন। গানিমাতের মাল আত্মসাৎ করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কাপুরুষতা দেখাবে না। বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না। যুদ্ধের বিধান লংঘন করবে না। ..... খেজুর গাছ কাটবে না বা তা জ্বালিয়ে দেবে না। চতুষ্পদ জন্তু ধ্বংস করবে না। ফলবান গাছ-পালা কেটে ফেলবে না। কোনো উপাসনালয় ধ্বংস করবে না। শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করবে না। এ রকম অনেক লোক পাবে যারা নিজেদেরকে গির্জার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে, দুনিয়ার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা তাদেরকে সেই অবস্থায়ই ছেড়ে দেবে। এমন কিছু লোক দেখতে পাবে যারা মাথায় উঁচু উঁচু টুপি পরে থাকে, যাদেরকে গির্জার খাদেম বলা হয়, লোকেরা যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করে থাকে। যখন তোমরা এ ধরনের লোক দেখবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।' একবার তিনি বলেছিলেন—'তোমরা আবাদী জমি নষ্ট করবে না এবং ছাগল ও উট গোশ্‌ত খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া হত্যা করবে না।'[৪৩]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের চেয়েও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে শক্ত মনোভাবের পরিচয় দিতেন। তাছাড়া মুরতাদরা একথা বুঝতে পেরেছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরও ইসলামী হুকুমত তাদেরকে শায়েস্তা করতে পুরোপুরি সক্ষম যারা ইসলামী শাসনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যেতে চাবে। এ জন্য তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানোর সময় সেনা অফিসারদের বলে দিতেন—'যখন তোমরা কোনো এলাকা ঘিরে ফেলবে তখন প্রবল শক্তিমত্তার সাথে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। তাদেরকে নির্মূল করে ছাড়বে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে। তোমাদের নবীর ওফাতের কারণে যেন তোমাদের ভেতর অলসতার সৃষ্টি না হয়।'[৪৪] এমনকি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ারও নির্দেশ দিতেন।-[দেখুন, 'ইহ্‌রাক' শিরোনাম]

৭. খলীফার এ অধিকার আছে, তিনি যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের সাথে এমন শর্তে সন্ধি করতে পারেন যা মুসলমানের কল্যাণে আসে।-[দেখুন, 'সুল্‌হ' শিরোনাম]

কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী প্রদান করার অধিকারও খলীফার আছে।-[দেখুন, 'তানফীল' শিরোনাম]

জুম্‌আহ্ [جمعة]—জুম্‌আ'

০ জুমআ'র নামায।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

০ জুমআ'র সময় খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া।-['আযান' শিরোনাম দেখুন]

জুয়ারুন [جوار] –প্রতিবেশী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখার ওসিয়ত করেছেন। প্রতিবেশীর সাথে ভালো সম্পর্ক থাকলে উভয়েই উপকৃত হয়। এ উপকার লড়াই ঝগড়া বা অন্য কোনো রকম শত্রুতার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার যখন তাঁর ছেলে আবদুর রহমানকে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করতে দেখেন, তাকে শাসান এবং বলেন—'খবরদার ! প্রতিবেশীর সাথে কখনো ঝগড়া করবে না। কেননা, সে-ই তোমার উপকারে আসবে, অন্যেরা তো পেছন ফিরে চলে যাবে।'[৪৫]

তথ্যসূত্র

১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
২. সুনানু বাইহাকী ৮ম খণ্ড।
৩. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৮।
৪. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৭ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড।
৫. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৬৯ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬৫৮।
৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৯১ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০।
৭. আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৫।
৮. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৫৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৯৮।
৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৬৭।
১০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৫৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮৯ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৫ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩।
১১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৭৩ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩।
১২. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৫ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৫১ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩।
১৩. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৫ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৪৫১ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩।
১৪. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৩ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৫৪ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০।
১৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩২৩ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮।
১৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩২১ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪২৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৪।
১৭. আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৩৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড।
১৮. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮৩ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৮৩ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৩।
১৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩২১ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪২৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩।
২০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮৫ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৪।

২১. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৯।
২২. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৮।
২৩. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২২ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭২৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০।
২৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৮৮।
২৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৯৩ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৩।
২৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৯০ ; কানযুল উম্মাল ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০২।
২৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৯৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭১।
২৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৯৫ ; আছার আবু ইউসুফ, রিওয়ায়েত নং ৯৭২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১১৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৪।
২৯. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ-২৬৪।
৩০. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৯৮।
৩১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ-৩১১।
৩২. শরহে আস সিয়ারুল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯ ; মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪৭ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৫৩; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮৫।
৩৩. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৭২।
৩৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৫।
৩৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৫।
৩৬. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৭৫।
৩৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, পৃ-৪৮৩ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৫৯।
৩৮. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮৫।
৩৯. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় ও ৩য় খণ্ড, পৃ-২৬৪।
৪০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৫৯।
৪১. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৯৫।
৪২. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ-২৬৩ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩০৬ ; সুনানু বাইহাকী ৯ম খণ্ড, পৃ-১৩২ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৯৪ ; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৯০।
৪৩. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮৫ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৯৪, ২৯৬, ২৯৭ ; মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪৭ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৫১, ৪৫২, ৪৭৭ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯৬ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৯৯ ; শরহে আসসিয়ারুল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯।
৪৪. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮৫।
৪৫. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৮৩।

ত

ত'আতুন [طاعة]—আনুগত্য

০ আমীরের আনুগত্য।-['ইমারাত' শিরোনাম দেখুন]

০ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ওপর বিনিময় না নেয়া।-['ইজরাহ্' শিরোনাম দেখুন]

ত'আমুন [طعام]—খাদ্য

১. পানিতে বসবাসরত প্রাণী

পানিতে বসবাসরত সকল প্রাণী হালাল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ 'সমুদ্রে যেসব প্রাণী আছে, আল্লাহ্ তাআলা তা তোমাদের জন্য যবেহ করে হালাল করে দিয়েছেন।'[১] আরেকবার বলেছেন—'আল্লাহ তাআলা সামুদ্রিক সকল প্রাণী তোমাদের জন্য যবেহ করে দিয়েছেন যেন তোমরা তা খেতে পারো। এগুলো সব হালাল এবং পবিত্র।'[২] যেমন—মাছ পানিতে বাস করে। তা খাওয়া হালাল। সেই মাছ স্বাভাবিকভাবে মরুক কিংবা শিকার করার কারণে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি একথা সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'মরে পানির ওপর ভেসে ওঠা মাছ হালাল।'[৩]

২. খাওয়ার আদব

খাওয়ার প্রথমে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা খানার আদব হিসেবে গণ্য। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধাভিযানে পাঠানোর সময় এগিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন—'তোমরা অচিরেই এমন এক ভূখণ্ডে গিয়ে পৌছুবে, যেখানে তোমাদের সামনে হরেক রকমের খাদ্য সামগ্রী এনে হাজির করা হবে। তাই যখন তোমরা খানা খেতে শুরু করবে তখন 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলবে এবং খাওয়া শেষে যখন পৃথক হবে তখন—'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে।'[৪]

৩. খাদ্য গ্রহণের সময় হালাল কিনা তা অনুসন্ধান করা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তা হালাল কিনা এ ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশী অনুসন্ধান করতেন। কারণ, খাদ্য যদি হালাল না হয়, আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ কবুল হবে না এবং কোনো সৎকাজও গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে হারাম বস্তু দিয়ে উদর পূর্তি করে ফেলে এবং জানতে পারে যে, সে খাদ্য হালাল ছিলো না, তাহলে তার উচিত বমি করে পেট খালি করে দেয়া। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ করতেন। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবা যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। একটি কূয়ার পাশে অবস্থিত কতিপয় লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম নুআইমান

তাদের কাছে গিয়ে ভবিষ্যত বাণী করা শুরু করে দিলো। বলতে লাগালো এরূপ হবে ঐরূপ হবে ইত্যাদি। লোকগুলো তার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করে তাকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ও দুধ হাদিয়া দিলো। সেগুলো সে সাথীদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো—'আপনি কি জানেন এগুলো কোত্থেকে এসেছে?' নুআইমান যা কিছু পাঠিয়েছে তা ভবিষ্যত উপার্জিত। একথা শুনে তিনি বললেন—'আচ্ছা আজ তাহলে নুআইমানের জ্যোতিষি বিদ্যার মাধ্যমে উপার্জিত বস্তু খেয়েছি !!' অতপর তিনি গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে সব ফেলে দিলেন।[৫]

ইবনে ইসহাক আওফ ইবনু মালিক আশজায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—আমি সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, যে যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধের নাম ছিলো 'যাতুস্ সালাসিল'। আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। আমরা এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা একটি উট যবেহ করে রেখেছিলো কিন্তু তারা তা বানাতে জানতো না। আমি কসাইয়ের কাজ জানতাম। তাদেরকে বললাম—যদি তোমরা আমাকে দশ ভাগের এক ভাগ গোশত দাও তবে আমি এটি বানিয়ে তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারি। তারা রাজী হলো। আমি একটি ছুরি দিয়ে তা টুকরা টুকরা করে ফেললাম। তারপর আমার ভাগের টুকরাটি নিয়ে সাথীদের কাছে চলে এলাম এবং গোশ্‌ত রান্না করে খেয়ে নিলাম। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন—'আওফ ! তুমি এ গোশ্‌ত কোথায় পেলে?" সব কথা আমি তাদেরকে বললাম। তাঁরা বললেন—'আওফ ! আল্লাহ্‌র শপথ তুমি কাজটি ভালো করোনি।' একথা বলে উভয়ে উঠে চলে গেলেন এবং যা কিছু খেয়েছিলেন তা বমি করে ফেলে দিলেন।'[৬]

৪. খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা প্রসঙ্গে।-['বায়' শিরোনাম দেখুন]

তাওবাহ্ [تَوبة]—তাওবা

ব্যভিচারী মহিলার বিয়ের সময় করা তাওবার প্রভাব।-['যিনা' শিরোনাম দেখুন]

তাওয়াফ [طواف]—চক্রাকারে ঘুরা, তাওয়াফ করা

- তাওয়াফে কুদূম।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]
- তাওয়াফে ইফাযা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

তাকবীর [تكبير]—তাকবীর, 'আল্লাহু আকবার' বলা

- 'আল্লাহু আকবার' বলার নাম তাকবীর।
- নামাযের শুরুতে 'তাকবীরে তাহরীমাহ্' বলা।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
- নামাযে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা।-(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

তাক্বীল [تقبيل]—চুমো দেয়া

১. মৃত ব্যক্তিকে চুমো দেয়া

মৃতকে আল বিদা' জানানোর জন্য চুমো দেয়া জায়েয। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাকে চুমো খেয়েছিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন—'যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হলো তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এলেন। তাঁকে বড়ো একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মুখের চাদর সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে চুমো খেলেন। তারপর তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনার জীবন কত উত্তম ছিলো এবং আপনার মৃত্যুও কত উত্তম !'[৭]–[আরো দেখুন, 'মাওত' শিরোনাম]

২. জীবিতদেরকে চুমো দেয়া

পুরুষ ঐসব মহিলাকে চুমো খেতে পারে যারা তার জন্য মুহাররাম। যেমন—মা, দাদী, নানী, কন্যা প্রমুখ। কিন্তু চুমো এমন জায়গায় হতে হবে যাতে কামোদ্দীপনা জাগ্রত না হয়, যেমন—মাথা, কপাল, গাল প্রভৃতি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাথায় এবং গালে চুমো খেয়েছেন বলে প্রমাণিত আছে।[৮] হযরত বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন তখন আমি একদিন তাঁর সাথে তাঁর বাড়িতে গেলাম। দেখলাম তাঁর মেয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্বরের কারণে শয্যাশায়ী। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'বেটি ! এখন তোমার অবস্থা কেমন ?' একথা বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে চুমো খেলেন।[৯]

৩. ইহ্‌রাম পরা অবস্থায় মুহাররামকেও চুমো দেয়া যাবে না।-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

তাখলীল [تخليل]—খেলাল করা

ওযুতে আঙ্গুল খেলাল করা।-['ওযু' শিরোনাম দেখুন]

তাখাল্লু [تخلى]—মলমূত্র ত্যাগ করতে যাওয়া

মলমূত্র ত্যাগ করতে গেলে মাথা ঢেকে রাখা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পছন্দ করতেন। একবার তিনি এক বক্তৃতায় বলেন—'হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহ্‌কে লজ্জা কর। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ! আমি যখন মলমূত্র ত্যাগ করতে যাই তখন আল্লাহ্‌কে লজ্জা করে সর্বদা আমার মাথা ঢেকে রাখি।'[৪]

তাখান্নুছ [تخنس]—নপুংসক হওয়া

১. সংজ্ঞা

পুরুষের কথাবার্তা, চাল-চলন, অঙ্গভঙ্গি অথবা শারীরিক গঠনে রমণীসুলভ হলে তাকে 'তাখান্নুছ' বলে।

২. মুখান্নাছ*-এর হুকুম

মুখান্নাছ হওয়া হারাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা মুখান্নাছ হয় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐসব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নপুংশক [হিজড়া] হয়ে যায়।[১১] মুখান্নাছ হওয়া ইসলামের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ইসলাম চায় পুরুষকে পৌরষদীপ্ত করে গড়ে তুলতে। যেন সে বীর যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নপুংশকদের পিছে লেগে থাকতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন মদীনায় একজন নপুংশক আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন।[১২]

তাগরীব [تغريب]—নির্বাসন, দেশান্তর

- জন্মভূমি বা নিজ দেশ থেকে অন্য কোথাও [শাস্তি স্বরূপ] পাঠিয়ে দেয়াকে 'তাগরীব' বলে।
- নপুংশককে শাস্তি স্বরূপ নির্বাসন দেয়া।-['তাখান্নুছ' শিরোনাম]
- অবিবাহিত ব্যভিচারীকে দেশান্তর করা।-['যিনা' শিরোনাম]

তাজাস্‌সুস [تجسس]—গোপন অনুসন্ধান/গোয়েন্দাগিরি

কোনো বিষয়ে জানার এমন প্রক্রিয়াকে তাজাস্‌সুস বলে, যার থেকে জানতে চাওয়া হয়, অনুসন্ধানী তাকে মোটেই পছন্দ করে না। [অর্থাৎ গোপনে অপ্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে তার দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ানো।-অনুবাদক]

যদি কোনো মুসলমানের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য জানার চেষ্টা করা হলে তা হারাম [অবৈধ]। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন وَلَا تَجَسَّسُوا [গোপনে কারো দোষ অনুসন্ধান করে বেড়িও না]। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর এবং সেনাপতিদেরকে কারো দোষ অনুসন্ধান করে বেড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—'লোকদের গোপনীয়তাকে নষ্ট করো না এবং তাদের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া।'[১৩]

তাদাবী [تداوى]—চিকিৎসা করা

ঝাড়-ফুঁক ও তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা করা।-['রুকাইয়াহ্' শিরোনাম]

তানফীল [تنفيل]—অতিরিক্তি দেয়া, পুরস্কার

১. সংজ্ঞা

গানিমাতের মাল থেকে সেনাপতি কর্তৃক কোনো সৈন্যকে তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রদান করাকে তানফীল বলে।

২. তানফীলের হুকুম

তানফীল শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ। এটি জিহাদে বীরত্ব প্রদর্শন কিংবা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করার বিনিময়ে প্রদত্ত পুরস্কার স্বরূপ। তানফীলের মাধ্যমে একদিকে যেমন উৎসাহিত করা হয়

* পৌরষ বিনষ্টকারী কিংবা মেয়েলী আচার-আচরণ রপ্তকারীকে আরবীতে 'মুখান্নাছ' বলে।-অনুবাদক

তদ্রূপ অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করা হয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ করতেন এবং এ কাজকে তিনি জায়েয মনে করতেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া গাসসানী বলেন—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলী যুগে এক বাঁদীকে ভালোবাসতেন। যার নাম ছিলো লায়লা বিনতু জুদী। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বিরহে কবিতা পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। একবার তিনি আলী ইবনু উমাইয়ার কাছে ইয়েমেন গেলেন। সেখানে গিয়ে ঐ বাঁদীকে বন্দী দেখতে পেলেন। তিনি আলীকে বললেন—'এ বাঁদী আমাকে দিয়ে দাও।' আলী বললেন—'আমি তো তা দিতে পারবো না।' তবে এ ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখি দিচ্ছি। তিনি জবাবে লিখলেন—'তাকে ঐ বাঁদী দিয়ে দাও।' মুয়াজ বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে—'ইবনু আউন বলেন, আমার ধারণা ঐ বাঁদী তাঁকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করা হয়েছিলো।[১৪]

তানমিয়াহ্ [تنمية]—বাড়ানো

শাসক কর্তৃক যাকাতের সম্পদ বাড়ানো।-[দেখুন, 'যাকাত' এবং 'হিমা' শিরোনাম]

তাবার্‌রু [تبرع]—দান

১. কোনো বিনিময় ছাড়া কাউকে কিছু প্রদান করার নাম 'তাবার্‌রু'।

২. তাবাররুর অন্তর্ভুক্ত লেনদেন কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন—হিবা, সদকা, ওসিয়ত, ওয়াক্‌ফ, ঋণ, কাফালাত, কোনো জিনিস কাউকে ধার দেয়া, কারো ঋণ মাফ করে দেয়া ইত্যাদি।

৩. তাবার্‌রুর অন্তর্ভুক্ত লেনদেন গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।-[হিবা' শিরোনাম]

৪. এমন ব্যক্তি যে লেনদেন করতে অক্ষম কিংবা লেনদেনের ব্যাপারে অবরুদ্ধ সে তাবার্‌রুর অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রকার লেনদেন করতে পারবে না।-['হাজর' শিরোনাম দেখুন]

তামছীল [تمثيل]—বিকলাঙ্গ করা

স্বেচ্ছায় কোনো মানুষের অঙ্গহানী করে কিংবা পেট ফেঁড়ে নাড়িভুড়ি বের করে বিকৃতি সাধনকে 'তামছীল' বলে।

অঙ্গহানী জনিত অপরাধের কিসাস।-['কাওয়াদ' শিরোনাম দেখুন]

শাস্তি স্বরূপ বিকলাঙ্গ করে দেয়া নিষেধ।-['তা'যীর' শিরোনাম দেখুন]

[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'মুছলাহ্' শিরোনাম]

তামাত্তু' [تمتع]—কল্যাণ লাভ করা, তামাত্তু' হাজ্জ

হাজ্জে তামাত্তু' হচ্ছে—হাজ্জে গমনকারী ব্যক্তি হাজ্জের মাসে প্রথমে ওমরা করার নিয়তে ইহ্‌রাম বেধে ওমরা আদায় করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে। পুনরায় হাজ্জের নিয়তে ইহ্‌রাম বেধে হাজ্জ আদায় করবে।-(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'হাজ্জ']

তামীমাহ্ [تميمة] -তা'বীজ

'রুকাইয়্যাহ্ (ঝাড়ফুঁক) শিরোনাম দেখুন।

তা'যিয়াহ্ [تعزيه]—সান্ত্বনা প্রদান

কারো মৃত্যুতে তার স্বজনদের সান্ত্বনা প্রদান করা শরীআহ্ সম্মত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাউকে সান্ত্বনা প্রদান করলে বলতেন—'সবর করতে পারলে কোনো দুঃখ আর দুঃখ থাকে না, কান্নাকাটিতে কোনো লাভ নেই, মৃত্যুর পূর্বের জীবনটা সহজ কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বেশ কঠিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কথা স্মরণ কর সেই কঠিন বিপদের সামনে তোমার এ বিপদ হাল্কা মনে হবে। আল্লাহ্ যেন তোমার বিনিময় বাড়িয়ে দেন।[১৫]

তাযাইয়্যুন [تزين]—সৌন্দর্য চর্চা

খিযাব বা কলপ লাগিয়ে সুন্দর হওয়া।-['খিযাব' শিরোনাম দেখুন]

তা'যীর [تعزير]—শাস্তি প্রদান

১. সংজ্ঞা

কিছু এমন অপরাধ, যার শাস্তি শরীআহ্ নির্দিষ্ট করে দেয়নি, আদালত নির্ধারণ করে দেয়। ইসলামী আইনের পরিভাষায় একে তা'যীর বলে।

২. তা'যীরের পদ্ধতি

এর মূলনীতি হচ্ছে, বিচারক অপরাধীকে এমন শাস্তি প্রদান করবেন, যাতে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখতে এই শাস্তিই যথেষ্ট।

[২.১]. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা'যীর স্বরূপ অপরাধীকে ধমকে দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো—'আপনার কী মনে হয় ব্যভিচার করাটাও তাকদীরের অংশ।' তিনি উত্তরে বললেন—'হাঁ'। তারপর সে বলতে লাগলো—'ব্যভিচারের ব্যাপারটি আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আবার এর জন্য আমাদের শাস্তিও ভোগ করতে হয়।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন—'হে অশ্লীল ভাষী মহিলার সন্তান ! আল্লাহ্‌র কসম, এ মুহূর্তে যদি আমার কাছে কেউ থাকতো তবে তোমার নাক থেতলে দিতে নির্দেশ দিতাম।[১৬]

[২.২]. তিনি শক্ত কথা বলেও তা'যীর করেছেন। সহীহ্ আল বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে আছে তিনি তাঁর ছেলে আবদুর রহমানকে বলেছিলেন—'এই জানোয়ার ! আল্লাহ্ করুন তোর নাক যেন কেটে যায়।' সেই সাথে ভালোমন্দ আরো কিছু কথাও শুনিয়ে দেন।[১৭]

[২.৩]. অঙ্গহানী করে শাস্তি প্রদান বৈধ নয়, যেমন—নাক কান কেটে দেয়া অথবা জিহ্বা কেটে দেয়া ইত্যাদি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির আবু ওমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিহাদে পাঠানোর সময় বলেছিলেন—'মানুষের নাক, কান, জিহ্বা প্রভৃতি কেটে অঙ্গহানি করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এটি শুধু গুনাহ্‌র কাজই নয়, ঘৃণিত কাজও বটে। হাঁ, কিসাসের বেলায় এরূপ করা যেতে পারে।'[১৮]

[২.৪]. তিনি চুল দাড়ি কেটে দিয়ে, মাল-সম্পদ পুড়িয়ে দিয়ে এবং ফাই [জিযিয়া, খারাজ, ওশর প্রভৃতি]-এর অংশ থেকে বঞ্চিত করেও তা'যীর করেছেন।

[২.৫]. তিনি তা'যীর স্বরূপ বেত্রাঘাতও করেছেন।-[দেখুন 'গুলূল' শিরোনাম]

৩. তা'যীরের কারণ

(৩.১) যে ব্যক্তি মুসলমানকে হেয় করার জন্য ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা [কিংবা গান অথবা নাটক, উপন্যাস—অনুবাদক] লিখবে তাকে তা'যীর বা শাস্তি প্রদান করা যাবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির আবু ওমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন—'ঐসব বাঁদী যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা বা গান গেয়ে থাকে এবং মুসলমান হওয়ার দাবীও করে, তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য শাস্তি দেবে। শুধু লক্ষ্য রাখবে শাস্তি দিতে গিয়ে যেন তাদের অঙ্গহানি না ঘটে। আর যদি তারা যিম্মী হয়, আমার জীবনের কসম তাদেরকে ক্ষমা করা শিরকের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।[১৯]–(আরো দেখুন, 'সাব্বুন' শিরোনাম)

[৩.২]. তিনি গানিমাতের মাল চুরি করলে তাকে চুল দাঁড়ি কামিয়ে, মালপত্র জ্বালিয়ে, ফাই থেকে বঞ্চিত করে দিতেন এবং একশ' বেত্রাঘাত করতেন। আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুরি যাওয়া গানিমাতের মাল কারো কাছে পাওয়া গেলে তাকে ধরে ফেলতেন। তারপর একশ' বেত্রাঘাত করে চুল দাঁড়ি কামিয়ে দিতেন। অতপর তার মালপত্র [বাহন ছাড়া] একত্রিত করে আগুন লাগিয়ে দিতেন। কোনো দিন আর সে মুসলমানদের সাথে কোনো সম্পদে অংশ পেত না।[২০]–(আরো দেখুন, সারিকাহ্ এবং গুলূল শিরোনাম)

তায়ামুন [تيامن]—ডানদিক থেকে শুরু করা

১. ডানদিক থেকে কোনো কাজ শুরু করাকে 'তায়ামুন' বলে।

২. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তম কাজগুলো ডানদিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। নগণ্য কাজগুলো ডানদিক থেকে শুরু করা থেকে বিরত থাকতেন। যখন তিনি থুথু ফেলতে চাইতেন তখন বামদিকে মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলতেন। ডানদিকে থুথু ফেলতেন না।-[আরো দেখুন-'বুসাক' শিরোনাম]

তালবিয়াহ্ [تلبيه]—তালবিয়া

১. হাজ্জ এবং ওমরাকারীর—'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা,* পাঠ করাকে তালবীয়া বলে।

২. হাজ্জে কখন তালবীয়া পাঠ শুরু করতে হয় এবং কখন তালবীয়া পাঠ শেষ করতে হয়।-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ

* আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্ আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি হাজির, তোমার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাজির, সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার, রাজত্ব ও ক্ষমতাও একমাত্র তোমার এ ব্যাপারে তোমার সাথে কেউ শরীক নেই, আমি উপস্থিত।–(অনুবাদক)

তালাক [طلاق]—তালাক

১. সংজ্ঞা

বিয়ের মাধ্যমে অর্জিত ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়াকে তালাক বলে।

২. পুত্রের কাছে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের দাবী পিতা জানাতে পারেন

কোনো শরঈ কারণে পিতা ছেলেকে তার স্ত্রী তালাক দিতে বলতে পারেন। এ অধিকার তার আছে। যেমন স্ত্রী তার স্বামীকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কিংবা কোনো ফরয কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। ছেলের উচিত পিতার আহ্বানে সাড়া দেয়া। আতিকা বিনতে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আবদুল্লাহ্ ইবনু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে করেছিলেন। সে স্বামীর মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এমনকি তাকে হাট-বাজারে যাতায়াত করা থেকেও বিরত রাখতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছেলেকে ডেকে বললেন—তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার জন্য। ছেলে তাই করলেন। কিন্তু স্ত্রীর বিচ্ছেদে ভেঙ্গে পড়লেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পথ দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করতেন সে পথে বসে তিনি তাকে দেখে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন ঃ

কোনো মহিলা নেই, যে বিনা অপরাধে–
হয়েছে বিতাড়িত স্বামীর ঘর থেকে,
তেমন কেউ কি আছে ধরাতে—
যে দিয়েছে তালাক তার প্রিয়তমাকে।

এ কবিতা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন নরম হয়ে গেলো। তিনি ঐ মহিলাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন।[২১]

৩. তালাকের সংখ্যা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ তালাক দু'টো। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে—এমন তালাক যাতে ফিরিয়ে নেয়া যায়। অর্থাৎ তালাকে রিজঈ দু'বার দেয়া যায়। আমরা ওপরে দেখেছি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেকে স্ত্রী ফিরিয়ে আনার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে এক তালাক দেয়া হয়েছিলো।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার তাৎপর্য হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই শব্দে দু' অথবা তিন তালাক দেবে শুধু এক তালাক কার্যকরী হবে। কেননা, তালাক তো শুধু একবারই বলা হয়।* তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি হযরত আবদুল্লাহু ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলাম। সেখানে তাঁর গোলাম আবু সাহ্বাও ছিলো। আবু সাহ্বা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যে তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দেয়। তিনি জবাব দিলেন—লোকেরা তিন তালাককে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় এক তালাক মনে করতেন। একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুত্‌বার

* ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মাযহাবে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। হানাফী মতে এক শব্দে তিন তালাক বলুক কিংবা ভিন্ন ভিন্নভাবে তিন তালাক বলুক, একই মজলিসে বসে বলুক কিংবা পৃথক পৃথক মসলিসে গিয়ে বলুক, সর্বাবস্থায়ই তিন তালাক কার্যকর হবে।–অনুবাদক

সময় বললেন—'তোমাদের অনেকেই এক সাথে তিন তালাক দেয়া শুরু করে দিয়েছো। তাই ভবিষ্যতে তোমরা যে ক'টি তালাকের কথা বলবে তার স্ত্রীর ওপর সেই ক'টি তালাকই কার্যকরী হয়ে যাবে।২২-[অর্থাৎ কার্যকরী করা হবে—অনুবাদক]

৪. 'তুমি আমার ওপর হারাম' একথা বলা

হারাম শব্দ বললে তালাক কার্যকরী হবে না। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে নেবে তাতে তার স্ত্রী তালাক হবে না। কিন্তু একে কসম বা শপথ মনে করে তার কাফ্‌ফারা আদায় করা আবশ্যক হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবে, তুমি আমার জন্য হারাম, এতে স্ত্রী হারাম হবে না কিন্তু তার ওপর কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে।'২৩

৫. তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকে।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]

তাহাল্লুল [تحلل]—খুলে ফেলা/হালাল করে নেয়া

হাজ্জের ইহ্‌রাম খুলে ফেলা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

তাহার্‌রিউন [تحرى]—অনুমান করা/পরিমাপ করা

যখন কোনো কিছুর প্রকৃতি বা পরিমাপ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে 'তাহার্‌রিউন' বলে।

মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডের ব্যাপারে তাহাররিউন, যদি তার মাসিকের দিন স্মরণ না থাকে।-['হায়েয' শিরোনাম দেখুন]

তিজারাহ্ [تجارة]—ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসার মালের যাকাত।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

তিফলুন [طفل]—শিশু

দেখুন, 'সগীরুন' শিরোনাম।

তিলাওয়াত [تلاوة]—তিলাওয়াত, আবৃত্তি

তিলাওয়াতের সিজদা।-['সুজূদ' শিরোনাম]

ত্বীব [طيب]—সুগন্ধি

- ইহ্‌রাম পরা ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।-['হাজ্জ' শিরোনাম]
- তাওয়াফে ইফাযা'র পর মুহ্‌রিম [ইহ্‌রাম বাধা] ব্যক্তির সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি।-['হাজ্জ' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৫৬ ; আল মাজমু, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩১ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬০৭ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৯৭।

২. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১৩৭।

৩. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৬৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৫২)

৪. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৮।

৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২০৯ ; কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ-১০৯।

৬. সীরাতে ইবনু ইসহাক ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৭৫।

৭. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৪৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭৫০ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৫ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৪২।

৮. মুসান্নাফ–ইবনে আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩২।

৯. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১০১।

১০. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৮ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৫০৮ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ–১৬৬।

১১. সহীহ আল বুখারী।

১২. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৪৩।

১৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬২১।

১৪. কিতাবুল আমওয়াল, ৩১৯ পৃঃ।

১৫. কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৭৪৪।

১৬. কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৩৫।

১৭. আল মাজমু' ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫৮।

১৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।

১৯. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।

২০. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩২ ; কিতাবুল খারাজ, পৃ-১৭২।

২১. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৭০৬।

২২. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৯২ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৬৮ ; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭২ ; সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ২১৯৯।

২৩. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪১ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯৪ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৭১৯ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১২৯ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৪ ; ৮ম খণ্ড, পৃ-২৯৯।

দ

দাইন [دين]—ঋণ

আমীর অথবা খলীফার বাইতুলমাল থেকে ঋণ নেয়া।-[দেখুন, 'ইমারাত' শিরোনাম]

যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, সে জন্য তাকে আটক রাখা যাবে না। বরং তার কাছ থেকে এ মর্মে হল্‌ফ নিতে হবে যে, ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা হওয়া মাত্র ঋণ পরিশোধ করে দেবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত থেকে এ মর্মে হল্‌ফ নিতেন, তুমি শপথ করে বলো ঋণ পরিশোধের জন্য তোমার কাছে নগদ কোনো টাকা-পয়সা নেই। এমনকি তোমার কাছে কোনো সম্পদও নেই যা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পার। যদি তুমি কোথাও থেকে কিছু পাও তাহলে সাথে সাথে ঋণ পরিশোধ করে দেবে। হল্‌ফ নেয়ার পর তাকে ছেড়ে দিতেন।[১]

দাফান [دفن]—দাফন করা

মৃতের কাফন-দাফন।-[দেখুন 'মাওত' শিরোনাম]।

দামুন [دم]—রক্ত

রক্ত বের হলে ওযু নষ্ট হওয়া।-[দেখুন, 'ওযু' শিরোনাম]

দিয়াত [دية]—দিয়াত বা রক্তপণ

'দিয়াত ঐ সম্পদকে বলে যা কোনো হত্যার বিনিময়ে পরিশোধ করা হয়।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

দু'আ [دعاء]—দু'আ, প্রার্থনা

এ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, 'যিক্‌রুল্লাহ্' শিরোনাম।

দুবুর [دبر]—নিতম্ব

নিতম্বের দিক দিয়ে যৌন মিলন।-[দেখুন, 'লিওয়াতাত' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. সুনানু বাইহাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২ ; কাশফুল গুম্মাহ ২য় খণ্ড, পৃ-১৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮২৫।

ন

নাওয়াহ্ [نواح]—বিলাপ, শোকগাঁথা

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা নিষিদ্ধ।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]

নাফল [نفل]—নফল, অতিরিক্ত

ফরযের অতিরিক্ত শরীআহ্ সম্মত যে ইবাদাত তাকে নফল বলা হয়। কখনো নফল মুস্তাহাব নামে পরিচিত হয় আবার কখনো ঐচ্ছিক ইবাদাত [تطوع]- নামে।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

নাফাকাহ্ [نفقة]—খোরপোষ, ভরণ-পোষণ

১. আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করা

প্রত্যেকের ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব তার নিজের। যতোক্ষণ তার সামর্থ থাকে। সামর্থ না থাকলে তার খোরপোষের দায়িত্ব তার নিকটাত্মীয়ের। এ জন্য সন্তানের-ভরণ পোষণের দায়িত্ব পিতার। চাই সে পিতার বাড়িতে থাকুক কিংবা অন্য কোথাও। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফায়সালা দিয়েছিলেন—তার প্রতিপালন করবে নানী এবং খরচ বহন করবেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।[১]

তদ্রূপ পিতার ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্বও পুত্রের। পুত্রের সম্পদ থেকে তা উসূল করা যাবে। ছেলে জানুক বা না জানুক। তবে শুধু ততোটুকুই নেয়া যাবে যতোটুকু তার প্রয়োজন বলে শরীয়াহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললো—'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! আমার পিতা আমার সব সম্পদ নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে।' তিনি পিতাকে ডেকে বললেন—'তুমি তোমার ছেলের সম্পদ থেকে ততোটুকু নেবে যা তোমার চলার জন্য যথেষ্ট হয়।' পিতা উত্তরে বললেন—'হে রাসূলের খলীফা ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি একথা বলেননি যে, 'তুমি এবং তোমার সব সম্পদ পিতার !' তিনি বললেন—'যে কথায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন তুমিও সেই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যাও।'[২]

২. সময় ও শ্রমের বিনিময়

এর মূলনীতি হচ্ছে—যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজের সময় ও শ্রমকে নির্দিষ্ট করে নেবে তার ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তাবে। এই সূত্রের ভিত্তিতে আমীরুল মু'মিনীনের ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব বাইতুল মালের। কেননা আমীরুল মু'মিনীন মুসলমানদের কল্যাণে তাঁর সম্পূর্ণ সময় ও শ্রম নিয়োগ করে করেন।

-[দেখুন, 'ইমারাত' শিরোনাম]

তদ্রূপ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। কারণ, স্ত্রী তার সম্পূর্ণ সময় ও শ্রম স্বামীর জন্য নিয়োগ করেন। তেমনিভাবে নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য নিয়োজিত মজদুরের ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব তার যে তাকে নিয়োগ দেবে। কেননা মজদুর তার সময় ও শ্রম নিয়োগ কর্তার

ইচ্ছে মাফিক ব্যবহার করে। তাই কাজ শেষ হওয়া মাত্র সে তার পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। আর যদি সময় নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই সে তার পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। নিয়োগ কর্তার কাজ সম্পূর্ণ হোক কিংবা না হোক। এ মাসয়ালার ব্যাপারে সবাই একমত। কারো দ্বিমত নেই।

নাফিলাহ্ [نافلة]—নফল, অতিরিক্ত

০ নফল নামায।-['সালাত' শিরোনাম]

০ সফরে নফল নামায।-['সাফার' শিরোনাম]

নাযর [نذر]—মানত করা, ভেট প্রদান

১. সংজ্ঞা

আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ কোনো মুবাহ্ জিনিসকে নিজের উপর অবশ্য করণীয় করে নেয়ার নাম 'মানত'।

২. মানত পুরো করা

শরীআহ্ অনুমোদন করে না এমন কোনো কাজ বা তৎপরতার ব্যাপারে 'মানত' করা জায়েয নেই। যদি কোনো গুনাহ্‌র কাজের জন্য মানত করা হয়, তবে সেই মানত পুরো করা হারাম। কাজটি গুনাহ্‌র নয় কিন্তু শরীয়াহ্ সেই কাজের অনুমোদন করে না এরূপ মানত পুরো করা অপরিহার্য নয়। এক মহিলা কথা না বলে চুপচাপ হাজ্জ সম্পাদনের মানত করেছিলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মানত পরিহার করে কথাবার্তা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনু আবী শাইবা প্রমূখ মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, হাজ্জের সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আহ্‌মাস গোত্রের এক মহিলার তাবুর কাছে গিয়েছিলেন, যে মহিলার নাম ছিলো যয়নব। তিনি দেখলেন, সেই মহিলা কোনো কথা বলছে না। খবর নিয়ে জানতে পারলেন, সে কোনো কথাবার্তা না বলে চুপচাপ হাজ্জ করার জন্য মানত করেছে। ঘটনা শোনে তিনি বললেন—'এরূপ করা জায়েয নেই। এতো জাহেলী যুগের কাজ। কাজেই মানত পরিহার কর এবং কথাবার্তা বল।' অতপর সেই মহিলা মানত পরিহার করলো।[৩]

নার [نار]—আগুন

আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া।-[দেখুন, 'ইহ্‌রাক' শিরোনাম]

নাসাব [نسب]—বংশ পরিচয়, পিতার দিকের আত্মীয়-স্বজন

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবদের মত অন্যান্য মুসলমানদের বংশ পরিচয় সংরক্ষণের ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতেন। কারণ, বংশ পরিচয়ের সাথে অনেক অধিকার জড়িত। যেমন—সন্তানের প্রতিপালন, ভরণ-পোষণ, মীরাস, পৃষ্ঠপোষকতা বা অভিভাবকত্ব ইত্যাদি।

এজন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন—'আসল বংশ পরিচয় বাদ দিয়ে অজ্ঞাত কোনো বংশ পরিচয় দেয়া, তা যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, তা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করারই নামান্তর।'[৪] কোনো মহিলার সাথে বিছানায় গেলে বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।-[আরো দেখুন 'কায্‌ফ' শিরোনাম]

নাসীহাহ্ [نصيحة]—উপদেশ, কল্যাণ কামনা

অধিনস্তদেরকে উপদেশ প্রদান আমীরের দায়িত্ব।-['ইমারাত' শিরোনাম দেখুন]

নিকাহ্ [نكاح]—বিয়ে

১. সংজ্ঞা

নিকাহ্ ঐ আক্‌দ [বা চুক্তি]-কে বলে যার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে উপভোগ করা জায়েয হয়ে যায়।

২. বিয়ের নির্দেশ

বিয়ের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ কথার অনুসারী ছিলেন, তিনি বলেছেন—'হে যুবক বৃন্দ ! তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা রাখে তারা যেন বিয়ে করে।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সামর্থবান প্রত্যেক যুবকের জন্য বিয়ে করা অপরিহার্য মনে করতেন। কোনো মুসলমানের জন্য দৈন্যতার অজুহাতে বিয়ের মত ফরয থেকে পালিয়ে বেড়ানো জায়েয নয়। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط

"আর তোমাদের মধ্যে যে স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের মালিকানাধীন মুসলিম বাঁদীদেরকে বিয়ে করবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

অবশ্য যে ব্যক্তি অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নিমিত্তে বিয়ে করবে আল্লাহ্ তাকে স্বচ্ছলতা প্রদান করবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তোমরা পালন করো, তিনি তোমাদের স্বচ্ছলতা প্রদানের যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করবেন।'[৫] আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন—'তারা যদি অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতায় থাকে আমি তাদেরকে স্বচ্ছলতা প্রদান করবো।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলতেন—'তোমরা বিয়ের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা অর্জন করো।'[৬] হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩. ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা

[দেখুন, 'যিনা' শিরোনাম]

৪. অল্প বয়স্ক বালিকার বিয়ে

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মেয়ে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে দেন তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা ছিলেন।[৭]

৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো, বিয়ের ব্যাপারে সকল আরব একে অপরের সমান। একথার ওপর তিনি তাঁর সহোদরা উম্মে ফারওয়াহ্‌কে কিন্দাহ্ গোত্রের আশআছ ইবনু কায়িসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ উম্মে ফারওয়াহ কুরাইশ গোত্রের মেয়ে ছিলেন।[৮]

৬. স্বামী-স্ত্রী নির্জনে মিলিত হলেই পূর্ণ মোহর প্রদান অপরিহার্য হয়ে যায়

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি এমন কোনো নির্জন জায়গায় একত্রিত হয় যেখানে দৈহিক মিলনে কোনো বাধা নেই তাহলে স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য (ওয়াজিব)। স্ত্রীর সাথে সে দৈহিক সম্পর্কস্থাপন করুক না করুক। যিরারা ইবনু আওফা বলেন—'খুলাফায়ে রাশিদীনের এই অভিমত ছিলো যে, যখন স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে থাকে সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হবে তখনই পূর্ণ মোহর প্রদান অপরিহার্য হয়ে যাবে।'[৯]

৭. ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায় বিয়ে কিংবা বিয়ের কোনো অনুষ্ঠান পালনে নিষেধাজ্ঞা।

-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

- কোনো মহিলা যখন বিয়ে করবে তখন থেকেই পূর্ব স্বামীর সন্তান প্রতিপালনের অধিকার তার নষ্ট হয়ে যাবে।-['হিদানাহ' শিরোনাম দেখুন]
- মৃত্যুর সাথে সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় না।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]
- বৈবাহিক কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ওয়ারিস হয়।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]

নিসাব [نصاب]—নিসাব

শরীয়াহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ, যার ওপর ভিত্তি করে শরীআহ্‌র নির্দেশসমূহ কার্যকরী হয়।

- যাকাতের বিভিন্ন নিসাব।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]
- চুরির অপরাধে হাত কাটার জন্য নিসাব।-['সারিকাহ্' শিরোনাম দেখুন]

নুকূদ [نقود]—নগদ অর্থ, সোনা-রূপা

- দিয়াত বাবদ প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]
- রূপার যাকাত।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

তথ্যসূত্র

১. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-১১৫ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৭।
২. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৮১ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫৭৭।
৩. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৪ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড।

৪. সুনানু দারেমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৩ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৫১ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২০৭।
৫. তাফসীরে ইবনু কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ-২৮৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৪৮৬।
৬. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৪৮৬ ; তাফসীরে ইবনু কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ–২৮৬।
৭. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৬০।
৮. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৮৪।
৯. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৮২ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭২৪ ; ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫১।

ফ

ফাই [فَيْء]—ফাই

১. সংজ্ঞা

কাফিরদের পরিত্যক্ত সেই সম্পদ যা মুসলমানগণ যুদ্ধ ছাড়াই হস্তগত করে। যেমন—জিযিয়া, খারাজ, শতকরা দশ ভাগ ব্যবসায়িক শুল্ক, মুসলমানদের ভয়ে কাফিররা যে সম্পদ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায় প্রভৃতিকে 'ফাই' বলে।

২. ফাইয়ের বণ্টন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো—মুসলমানগণ ইসলামের সন্তান আর ফাই (কাফিরদের) পরিত্যক্ত সম্পদ। এ জন্য মুসলমানগণ তাতে সমানভাবে ওয়ারিস (অংশীদার)। সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিলো, মুসলমানগণ ইসলামের সন্তান, কাজেই সবাই তারা সমান অংশীদার। কারণ, সকল ভাই পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে সমানভাবে অংশ পায়। যদিও তাদের মধ্যে কেউ মর্যাদাসম্পন্ন, কেউ দীনদার ও নেকীর ব্যাপারে অগ্রসর।[১]

এ জন্য তিনি 'ফাই'-এর বণ্টন সমানভাবে করতেন। এতে স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ, মহিলা, ছোট বড়ো সবাই সমান অংশ পেতেন।[২] আবদুর রহমান ইবনু হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম আবু কুর্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাই বণ্টনে আমাকে ততোটুকু অংশ প্রদান করেছেন যতোটুকু অংশ আমার মালিক পেয়েছিলেন।'[৩]

কেউ কেউ তাকে সমান অংশে বণ্টন না করে বেশী কম করে বণ্টনের পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'যদি আপনি আনসার ও মুহাজিরদের অংশ কিছু বেশী করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। কারণ, তাঁরা ইসলামের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও তাদের গভীর সম্পর্ক ছিলো।' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'তাদের প্রতিদান তো তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে পাবেন। আর অর্থনৈতিক বণ্টনের ব্যাপারে সবার অংশ সমান হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, কারো ওপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক নয়।'[৪]

ফাইতে বেদুঈনদের অংশ প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'বাদভুন' শিরোনাম]

ফাকরুন [فَقْر]—দারিদ্র

যাকাত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার।-[দেখুন, 'যাকাত' এবং 'যাকাতুল ফিত্‌র' শিরোনাম]

ফাখযুন [فخذ]—রান, উরু

০ হাঁটু থেকে নিতম্ব পর্যন্ত অংশকে রান বা উরু বলে।

০ উরু বা রান কি সতরের অন্তর্ভুক্ত ?-[দেখুন-'আওরাতুন' শিরোনাম]

ফাতিহাহ্ [فاتحة]—সূরা ফাতিহা, মুখবন্ধ

নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়া।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

ফাজর [فجر]—সকাল

০ ফযরের আযান কখন দেয়া হয় ?-[দেখুন, 'আযান' শিরোনাম]

০ সুবহে সাদিক শুরুর সাথে সাথে রোযা শুরু হয়ে যায়।-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

ফারাইয্ [فرائض]—উত্তরাধিকার আইন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টনের যে বিধান, তাকে ফারাইয্ (বা উত্তরাধিকার আইন) বলে।

ফিতনাহ্ [فتنة]—পরীক্ষা, বিপদ, বিপর্যয়

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবসময় সন্তানদেরকে 'ফিতনা' থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকীদ করতেন। তিনি একবার বলেছেন—'হে বেটা ! মানুষ যদি বিপর্যয়ে জড়িয়ে যায়, তাহলে তুমি সেই গুহায় চলে যাবে যেখানে আমি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুকিয়ে ছিলাম। [অর্থাৎ ছুর পর্বতের গুহা] এবং সেখানেই লুকিয়ে থাকবে। অবশ্যই তোমার সকাল বিকেলের খানা সেখান থেকেই জুটে যাবে।'[৫]

ফিদ্দাহ্ [فضة]—রূপা

০ রূপার যাকাত।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

০ রূপার আংটি ব্যবহার।-[দেখুন, 'খাতাম' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৬৪।
২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬১৪।
৩. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২২২ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫২১।
৪. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪৮ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৬৩ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪১৬ ; কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭১৪; ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫২১ ; ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯২।
৫. কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৬৩।

ব

বায়' [بيع]—ক্রয়-বিক্রয়

১. সংজ্ঞা

সম্পদ দিয়ে সম্পদ বিনিময় যাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা মালিকানা হস্তান্তর করা যায়। এরূপ পদ্ধতিকে 'বায়' বা ক্রয়-বিক্রয় বলে।

২. একই ধরনের জিনিসের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—একই ধরনের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করতে হলে পরিমাণে কমবেশী করা যাবে না। এরূপ হলে সূদী লেনদেন বলে বিবেচিত হবে। চাই তা নগদ টাকা-পয়সা হোক কিংবা সোনা-রূপা অথবা অন্য কোনো জিনিস। সব কিছুর বেলায়ই এ হুকুম কার্যকর।

[২.১] নগদ টাকা ও সোনা-রূপা প্রসঙ্গে আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—'আমি বাড়ি থেকে বেরুলাম। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। দেখলাম তাঁর হাতে এক জোড়া নূপুর। আমি তাঁর থেকে নূপুর জোড়া কিনে নিলাম। নিক্তি এনে এক পাল্লায় নূপুর এবং অপর পাল্লায় রূপা রেখে ওজন দেয়া হলো। রূপার ওজন সামান্য বেশী হওয়ায় আমি বললাম, অতিরিক্তটুকু আপনার জন্য হালাল করে দিলাম। [অর্থাৎ বেশীটুকু ছেড়ে দিলাম]।' তিনি বললেন—তুমি আমার জন্য হালাল করতে পার কিন্তু আল্লাহ্‌তো হালাল করেননি। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—"রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা সমানভাবে ওজন করে লেনদেন করতে হবে। অতিরিক্ত যে দেবে এবং যে অতিরিক্ত দাবী করবে উভয়ে জাহান্নামী।"[১]

তিনি সিরিয়া অভিযানে পাঠানো সেনাবাহিনীর অফিসারকে লিখেছিলেন—"তোমরা এমন এক জায়গায় পদার্পণ করছো যেখানে সুদ ভিত্তিক লেনদেন হয়। কাজেই সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সোনার পরিবর্তে সোনা এবং রূপার পরিবর্তে রূপা লেনদেন করতে হলে অবশ্যই ওজন সমান সমান হতে হবে। খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য কিনবে না, যদি ওগুলোর ওজন সমান না হয়।'[২]

[২.২] খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারেও সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা পরিমাণে অবশ্যই সমান হতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একটি উট যবেহ্ করে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো। এক ব্যক্তি বললেন—'একটি ছাগলের বিনিময়ে উটের এক ভাগ আমাকে দিতে পারেন।'[৩] শোনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'তা জায়েয নয়।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ জন্য নিষেধ করেছিলেন, গোশ্‌ত এবং জীবিত পশু সমান হতে পারে না। তাই তিনি জীবিত পশুর বিনিময়ে গোশ্‌ত খরিদ করাকে অপছন্দ করেছেন।[৪]

৩. উম্মু ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয়

ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শর্ত হলো—তা সম্পদ বলে গণ্য হতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে উম্মু ওয়ালাদ [যে বাঁদীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্ম নেয়]-তার সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই সে মুক্তিলাভ করে না বরং মালিক তাকে মুক্তি দিলেই সে মুক্তি লাভ করে। তাছাড়া মালিকের ইন্তেকালের পর সন্তানরা তার সম্পদের মালিক হওয়া মাত্র উম্মু ওয়ালাদ মুক্তিলাভ করে।[৫] এ জন্য সন্তান জন্মের পরও সে মালিকের মালিকানাভুক্ত থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যতোক্ষণ সে সম্পদ বলে পরিগণিত হবে ততোক্ষণ তার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের প্রথম দিকে এ ধরনের বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় হতো।[৬] পরবর্তীতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের বাঁদী ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং সন্তান প্রসবের সাথে সাথে সে মুক্ত বলে ঘোষণা করে দেন।-(ফিক্‌হে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বায় [ক্রয়-বিক্রয়] শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

৪. কুরআন মজীদের ক্রয়-বিক্রয়

সাবাহাগণ কুরআন মজীদের কপি ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ্ মনে করতেন। কারণ, আল কুরআনের মর্যাদা অনেক উর্ধে, কাজেই তার কোনো মূল্য নির্ধারণ হতে পারে না। এ মতের বিপরীত কোনো মত সাহাবাদের থেকে প্রমাণিত নেই।[৭]

বাইতুল মাল [بيت المال]—ট্রেজারী

১. সংজ্ঞা

বাইতুল মাল ঐ প্রতিষ্ঠানকে বলে যেখানে জনসাধারণের অর্থসম্পদ [রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে] জমা হয়।

২. বাইতুল মালের জায়গা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় তাঁর বাড়ীতে বাইতুল মাল ছিলো। কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে বাইতুলমাল সান্‌হ নামক স্থানে ছিলো। যেখানে তিনি বসবাস করতেন। বাইতুল মালের কোনো তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন না। একবার তাঁকে বলা হলো—'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা! আপনি বাইতুলমালের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করেন না কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কোনো ভয় নেই।' প্রশ্নকারী বললেন—'কেন?' 'সেখানে তালা লাগানো আছে।'—আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রতিউত্তরে বললেন। বাইতুলমালে যা কিছু এসে জমা হতো তিনি তা জনগণের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। বণ্টনের পর কোনো মাল আর অবশিষ্ট থাকতো না। যখন তিনি সেখান থেকে মদীনায় [সদরে] স্থানান্তরিত হলেন তখন তিনি বাইতুলমালকেও মদীনায় নিয়ে এলেন এবং পূর্বের জায়গায় স্থাপন করলেন।[৮]

৩. বাইতুল মালের আয়ের উৎস

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে বাইতুল মালের উৎসগুলো ছিলো নিম্নরূপ—যাকাত, জিযিয়া, খারাজ, ওশর, গানিমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ এবং ঐ সমস্ত সম্পদ যার কোনো ওয়ারিস নেই।

৪. বাইতুল মালের খরচের খাতসমূহ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে বাইতুল মালের খরচের খাতসমূহ তাই ছিলো যা আল কুরআনে যাকাত, গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ, জিযিয়া, খারাজ, ওশর প্রভৃতি খরচের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এজন্য বাইতুল মালের ব্যয় নিম্নোক্ত লোকদের মধ্যেই করা হতো। ফকীর, মিসকীন, যাকাত, জিযিয়া, খারাজ, ওশর ইত্যাদির সংগ্রহকারী, এমন ধরনের লোক যাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে কিংবা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্যের প্রয়োজন, ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান, ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণমুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান, ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের এবং ইসলামের ওপর ষড়যন্ত্রের মুকাবেলা করার জন্য, পথিক বা পর্যটকদের সাহায্যার্থে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম তাদের জন্য।

৫. যদি খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তিনি বাইতুলমাল থেকে ঋণগ্রহণ করতে পারেন। যেমন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গ্রহণ করেছিলেন।

-['ইমারাত' শিরোনাম দেখুন]

বাইয়াহ্ [بيعه]—বাইয়াত

১. ইমাম বা খলীফাকে সহযোগিতা এবং তাঁর আনুগত্য করার শপথকে বাইয়াহ বা বাইয়াত বলে।

২. বাইয়াত গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। যদি কোনো মুসলমান বাইয়াত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করে- তবে ধরে নেয়া হবে সে জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। এজন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ় ইচ্ছে রাখতেন, প্রতিটি মুসলমান যেন অবশ্যই বাইয়াত গ্রহণ করেন। কেউ যেন বাইয়াত ছাড়া না থাকেন। ইবনু সিরীন (রহ) বলেন—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামে প্রবেশকারী প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকেই এই বাইয়াত নিতেন—"তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখবে, কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাবে না, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর যে নামায ফরয করেছেন তা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করবে। কেননা নামাযে অলসতা প্রদর্শন করা সর্বনাশের কারণ। সন্তুষ্টচিত্তে নিজের মালের যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ করবে, নিজের দায়িত্বশীল [নেতা]-দের কথা শুনবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।" একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির কাছ থেকে অতিরিক্ত একথা বলে বাইয়াত নিয়েছিলেন যে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাবতীয় কাজ করবে, কোনো মানুষের সন্তুষ্টির জন্য করবে না।'[৯]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হওয়ার দিন লোকদের থেকে যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিলো আনুগত্যের বাইয়াত। ইবনু আফীফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ঐ সময় এলাম যখন তিনি লোকদের থেকে বাইয়াত নিচ্ছিলেন।' তিনি বললেন—'আমি তোমাদের থেকে একথার বাইয়াত নিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্, তাঁর কিতাব এবং নিজের দায়িত্বশীল [খলীফা]-দের কথা শুনবে।' ইবনু আফীফ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন—'আমি কথাগুলো ভালোভাবে স্মরণ করে নিলাম। তারপর তাঁর কাছে এসে বললাম—আমি আল্লাহ্, তাঁর কিতাব এবং দায়িত্বশীল [খলীফা বা আমীর]-দের কথা শুনার জন্য এবং মানার জন্য আপনার কাছে বাইয়াত হতে চাই।' তিনি পা

থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে গভীরভাবে অবলোকন করলেন। সম্ভবত আমার কথাটি তাঁর বেশ ভালো লেগেছিলো। অতপর তিনি আমার বাইয়াত নিলেন।[১০]

বাকারাহ্ [بقر]—গরু

হাদী [বাইতুল্লাহ্‌য় কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশু] অথবা ঈদুল আযহায় কুরবানীর জন্য একটি গরু সাতজন অংশীদারের জন্য যথেষ্ট হওয়া।-[দেখুন, 'হাজ্জ' এবং 'ঈদুল আযহা' শিরোনাম]

দিয়াত হিসেবে প্রদেয় গরুর সংখ্যা।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

বাগইয়ুন [بغى]—বিদ্রোহ

কোনো দল যারা শক্তি সামর্থ অর্জন করে প্রাশসকের বিরুদ্ধে কোনো অজুহাতের ভিত্তিতে তৎপরতা প্রদর্শন করলে তাকে 'বিদ্রোহ বলে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং রীতিমত যুদ্ধ করেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—তারা মুরতাদ ছিলো না বিদ্রোহী ?

মুরতাদ তো ইসলামের সীমা থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু বিদ্রোহী ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় না।

কতিপয় ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ—যেমন ইবনু কুদামা তাঁর গ্রন্থ আল মুগনীতে—তাদেরকে বিদ্রোহী বলেছেন।[১১] কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে বর্ণনা করেছেন। আমার [গ্রন্থকার] গবেষণার আলোকে আমি বলতে চাই, তারা মুরতাদ ছিলো। কারণ, তারা যাকাতকে অস্বীকার করেছিলো। অথচ যাকাত আল্লাহ্‌র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ফরয। কাজেই সেই ফরযকে যারা অস্বীকার করে তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না। আমি 'রিদ্দাহ্' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের আচরণকে কীভাবে দেখেছেন।

বাস্‌মালাহ্ [بسملة]—'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা

'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' [আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি কৃপানিধান করুণাময়] বলাকে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে চুপি চুপি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তেন। উচ্চ শব্দে পড়তেন না। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই নামাযে চুপি চুপি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তেন।'[১৮] হযরত সিদ্দীকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আলহামদু' সূরা দিয়ে নামায আরম্ভ করতেন এবং প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে নিতেন। পরে পড়তেন না।[১৯]

ওযুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া।-['ওযু' শিরোনাম দেখুন]

খাবার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা।-['ত'আম' শিরোনাম দেখুন]

বাদ্‌ভুন [بدو]—বেদুঈন

বেদুঈন বলতে এমন লোককে বুঝায় যাদের নির্দিষ্ট কোনো আবাসস্থল নেই। যাযাবর। মরুভূমির মরুদ্যানকে কেন্দ্র করে যাদের আবাস গড়ে ওঠে। আবার কিছুদিন পর অন্য মরুদ্যানের অভিমুখে ছুটে চলে।

এ ধরনের লোকের ওপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা এরা লোকালয় ছেড়ে দূরে এক রকম বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করে থাকে। এ জন্য জিহাদের ঘোষণা তাদের পর্যন্ত পৌঁছে না। ফলে তারা গানিমাতের মালের কোনো অংশ পায় না। এমনকি খারাজ, জিযিয়া কিংবা ওশরের কোনো অংশও তাদের মিলে না। হাঁ, যদি কেউ মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে গানিমাতের মাল থেকে সে অংশ লাভ করবে।

একমাত্র জিহাদ ছাড়া ইসলামের আর কোনো নির্দেশের বেলায় তাদেরকে ছাড় দেয়া যাবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—যেসব মুসলমান বেদুঈন বা মরুচারী তাদের ওপর ইসলামের সকল বিধি-বিধান সেভাবেই কার্যকরী হবে যেভাবে একজন সাধারণ মুসলমানের ওপর কার্যকরী হয়ে থাকে। তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত গানিমাতের মালে অংশ পাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সাধারণ মুসলমানের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করবে।'[১২]

বাদাল [بدل]—পরিবর্তন, আদান-প্রদান

যাকাতে পরিবর্তন প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

বাহরুন [بحر]—সমুদ্র

- সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করা।-['ওযু' শিরোনাম দেখুন]
- সামদ্রিক প্রাণী খাওয়া।-['ত'আম' শিরোনাম দেখুন]

বিলায়াত [ولاية]—অধিকার, পৃষ্ঠপোষকতা

- জীবন বাঁচানো, লালন-পালন।-[দেখুন, 'হিদানাহ্' শিরোনাম]
- রাষ্ট্র প্রধান কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে অধিকতর হকদার।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

বুকা [بكاء]—কান্না, কান্নার আওয়ায

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে কান্না সেতো উত্তম কথা। কারণ, এটি দৃঢ় ঈমানের পরিচায়ক। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র ভয়ে এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ে কেঁদেছেন। এবং তিনি বলেছেন—'দু' ধরনের চোখ এমন যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক. ঐ চোখ যা আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে অশ্রু ঝরায়। দুই. যে চোখ অতন্দ্র থেকে আল্লাহ্‌র পথে পাহারা দেয়।'

আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নার চেষ্টা করা করা ভালো। কেননা এটি ভালো কাজের অনুশীলন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে থাকে তার কাঁদা উচিত আর যার কান্না না আসে তার কাঁদার চেষ্টা করা উচিত।'[১৩]

বুসাক [بصاق]—থুথু

সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে—মানুষ তার বাম দিকে থু থু ফেলবে। ডানদিক এবং সামনের দিক ফেলবে না। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কোনো মতবিরোধ প্রমাণিত নেই।[১৪]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার অসুস্থতার কারণে ওজরবশত ডানদিকে থু থু ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন—'আমি এর আগে কখনো এরূপ করিনি।'[১৫]

বিদ'আহ্ [بدعة]—বিদআত

দীনি ব্যাপারে এমন নতুন কাজকে বিদ'আত বলে যা সাহাবায়ে কিরাম কিংবা তাবিঈগণ করেননি এবং যা শরীয়াতের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ'আত বলতে উপরোক্ত কথাই বুঝতেন। একদিন তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে এক বক্তৃতায় বলেছেন—'মুসলমানের নেতা [একই সাথে] দু'জন হওয়া জায়েয নেই। এরূপ হলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আদেশ নির্দেশে বৈপরিত্য দেখা দেবে, জামায়াতী জিন্দেগী নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। পরিণতিতে তারা সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাবে। বিদ'আত মাথাচারা দিয়ে ওঠবে এবং ফিতনা-ফাসাদ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়বে। যা কারো কল্যাণেই আসবে না।'[১৬]

তাই বলে নিম্নোক্ত ঘটনাকে বিদ'আত মনে করা ঠিক হবে না। কারণ, এ ঘটনার দ্বারা মুসলিম মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে শরঈ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। ঘটনাটি এই—'একদিন ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, মহিলাদের ইন্তিকালের পর যেভাবে তাদেরকে গোসল দেয়া হয়, তা আমার কাছে ভালো মনে হয় না। একটি চাদর দিয়ে তাদেরকে ঢেকে দেয়া হয় কিন্তু তার ভেতর দিয়ে শরীরের উঁচু নিচু জায়গাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।' একথা শুনে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—'আমি হাবশায় [অর্থাৎ আবিসিনিয়ায়] দেখেছি, মৃত মহিলাদেরকে গোসল দেয়ার জন্য একটি হাওদা বানানো হয়, যা বিয়ের কনে বসার হাওদার মতো। সেখানে তাদেরকে গোসল দেয়া হয়।' তখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ আনহা বললেন—'আমার মৃত্যুর পর যেন সেইরূপ করা হয় এবং লাশের কাছে যেন কাউকে আসতে দেয়া না হয়।'

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের পর আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী গোসলের আয়োজন করলেন। তখন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখানে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে অনুমতি দিলেন না। যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, ফাতিমা এরূপ করার জন্য বলে গেছেন। শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'যেভাবে ফাতিমা তোমাকে বলেছে সেভাবেই কর।'[১৭]

বিদা [وداع]—বিদায় জানানো

০ মৃতকে বিদায় জানানো।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]
০ জিহাদে রওয়ানাকারী সৈন্যদের বিদায় জানানো।-['জিহাদ' শিরোনাম দেখুন]

তথ্যসূত্র

১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৪ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫১৪।
২. কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৮৫।
৩. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩২ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৫।
৪. আল মাজমু, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৫।
৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২১৯।
৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৮৭ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২১৮।
৭. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৯৫ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬৩।
৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬১৪।
৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৩০।
১০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৩২।
১১. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০৪।
১২. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮৫।
১৩. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭৭।
১৪. আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৩।
১৫. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৫২৫।
১৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৬।
১৭. সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৫।
১৮. –আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫২।
১৯. আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫২ ; আল ই'তিবার ফিল নাসিখ ওয়া মানসুখ মিনাল আছার, পৃ-৮১।

ম

মাউ'ন [ماء]—পানি

সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং অপরকেও পবিত্রকারী। এ জন্য সেই পানিতে ওযু করা জায়েয। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমুদ্রের পানির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছিলেন—'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তাতে মৃত প্রাণী (অর্থাৎ মাছ) হালাল।'[১]

মাওত [موت]—মৃত্যু

১. মৃতের জন্য শোক প্রকাশ

এমন অনেক ব্যাপার আছে যা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। সে জন্য আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণ করবেন না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দুঃখ-বেদনা। দ্বিতীয়টি চোখের পানি, যা দুঃখ, ভারাক্রান্ত চোখে বয়ে যায়। এছাড়াও আরো অনেক ব্যাপার আছে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই আমরা দেখতে পাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর তিনি শুধু দুঃখই প্রকাশ করেননি বরং চোখের পানিও ফেলেছেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—যখন হযরত সা'দ ইবনু মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করলেন, তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন হাউমাউ করে কাঁদছিলেন, তাদের কান্নার আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিলো।'[২]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক অশ্রু ঝরিয়েছেন।[৩]

কিন্তু মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা কিংবা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা জাহেলী যুগের কাজ। শরীয়াতে এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃতের জন্য বিলাপ করা ভীষণ অপছন্দ করতেন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদুল্লাহর ইন্তিকাল হলো, তখন মহিলারা বিলাপ করা শুরু করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘর থেকে বেরিয়ে যারা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এসেছিলেন তাদেরকে বললেন—'মহিলারা ভেতরে বিলাপ করছে এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কেননা জাহেলী যুগ থেকে আমরা ইসলামী যুগে সবেমাত্র প্রবেশ করেছি। খুববেশী দিনের কথা নয়। এজন্যই তারা এরূপ করছে। অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি—জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে গরম পানির ছিটে দেয়া হয়।[৪] এখানে কান্নাকাটি বলতে বিলাপ করা এবং ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদার কথা বুঝানো হয়েছে।

২. মৃত ব্যক্তিকে বিদায় জানানো এবং তাকে চুমো খাওয়া

মৃত ব্যক্তিকে বিদায় জানানো এবং তাকে চুমো খাওয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাকে

বিদায় জানিয়েছেন এবং চুমো খেয়েছেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সংবাদ শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সোজা তাঁর লাশের কাছে যান। তাকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো। তাঁর মুখ থেকে চাদর সরিয়ে ঝুকে গিয়ে চুমো খেলেন এবং বললেন—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক ; আল্লাহ্ কখনো আপনাকে দুটো মৃত্যুর সম্মুখীন করবেন না।' (অর্থাৎ আর কখনো আপনাকে মৃত্যু কষ্ট ভোগ করতে হবে না)। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনার জীবন কতো পবিত্র ছিলো এবং আপনার মৃত্যুও কতো না পবিত্র !'[৫]

৩. মৃতকে গোসল দেয়া

[৩.১] মৃতকে গোসল দেয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকার তার আত্মীয়-স্বজনের। আবার তাদের মধ্যে যে যতো বেশী কাছের গোসলের অধিকার তার ততো বেশী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কে তাঁর গোসল দেবে ? তিনি বলেছিলেন—'আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে তাঁর কাছের সেই গোসল দেয়ার ব্যাপারে বেশী হক রাখে।'[৬] অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের বন্ধু ! সত্যিই কি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন ?' তিনি সম্মতিসূচক জবাব দিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাইরে এসে বললেন—'যান, আপনারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের ব্যবস্থা করুন।'[৭]

[৩.২] গোসল দেয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে ওসিয়ত করে যাওয়া জায়েয আছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিয়ত করেছিলেন, তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা গোসল দেন।[৮] এজন্য তাঁর ইন্তিকালের পর আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে গোসল দিয়েছেন।[৯] এ থেকে ঐ মাসয়ালা জানা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন তাকে গোসল দিতে পারে। তাছাড়া একথাও প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর সাথেই সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায় না।

৪. মৃতকে কাফন পরানো

মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে তাকে তিনটি সাদা কাপড় দিয়ে কাফন পরাতে হবে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—আমি আমার পিতা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে এসেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়টি কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছে। আমি বললাম—তিনটি সাদা কাপড়। যার মধ্যে জামা এবং পাগড়ী ছিলো না। তিনি বললেন—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত কোন্ দিন হয়েছিল ? উত্তরে বললাম—রবিবার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আজ কি বার ? আমি বললাম—আজ রবিবার। তিনি বললেন—আমি আশা করি আমার এক রাত অবশিষ্ট আছে। তারপর তিনি পরনের কাপড়ের দিকে চাইলেন। কাপড়ের মধ্যে একটু জাফরানের দাগ লেগেছিলো। বললেন—আমার এ কাপড়টি ধুয়ে দাও, এর সাথে আরো দু'টো কাপড় মিলিয়ে আমাকে কাফন দেবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ কাপড় তো পুরোনো হয়ে গেছে। তিনি বললেন—জীবিতদের জন্য নতুন কাপড়ের বেশী প্রয়োজন। কাফন তো মৃতদের দেহ থেকে নির্গলিত রক্ত ও পূঁজের জন্য।

সোমবার রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং প্রভাতের আগেই তাঁকে দাফন করা হলো।[১০] কাফনের কাপড়ের ওপর সুগন্ধি ছিটানো যাবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিয়ত করেছিলেন—'আমার কাফনের কাপড়ের ওপর যেন কোনো সুগন্ধি লাগানো না হয়।'[১১]

৫. জানাযার সাথে চলা

[৫.১] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো জানাযার সাথে যেতেন তখন জানাযার আগে আগে চলতেন।[১২] হযরত আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সম্পর্কে বলেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন জানাযার আগে চলার চেয়ে তার পিছে চলা উত্তম। তবু তিনি এরূপ করেছেন শুধু লোকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য।[১৩]

[৫.২] **জানাযা দ্রুতবেগে নিয়ে যাওয়া ঃ** হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন জানাযা দ্রুতবেগে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। উয়াইনাহ্ ইবনু আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন—'আমরা হযরত ওসমান ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আমাদের সাথে মিললেন এবং চাবুক ঘুরাতে ঘুরাতে আমাদেরকে দ্রুত হাটার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন—'আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জানাযা নিয়ে এমনভাবে চলতাম মনে হতো আমরা রমল* করছি।

৬. জানাযার নামায

কাদেরকে জানাযা পড়াতে হবে ? জানাযা পড়ানোর ব্যাপারে অধিক হকদার কে ? মসজিদে জানাযার নামায। জানাযা নামাযের বিবরণ ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম।

৭. মৃত ব্যক্তিকে দাফন

[৭.১] দিন বা রাতের যে কোনো সময় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা যায়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাফন রাতের বেলায় হয়েছিল।[১৪]

[৭.২] স্ত্রীর লাশ কবরে রাখার ব্যাপারে স্বামীর হক সবচেয়ে বেশী। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীর কবরে নিজে নেমেছিলেন। কোনো আত্মীয়কে নামতে দেননি।[১৫]

[৭.৩] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো কবরে নামতেন তখন বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْيَقِيْنِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

"আল্লাহর নামে এবং তাঁর রাসূলের মিল্লাতের ওপর এবং ঈমান ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস রেখে (কবরস্থ করলাম)।"[১৬]

৮. কারো পরিত্যক্ত সম্পদে ওয়ারিস হতে হলে তার পূর্বে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া শর্ত। -[দেখুন, 'ইরূছ' শিরোনাম]

---

* 'রমল' সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন 'তাওয়াফ' শিরোনাম।—অনুবাদক

মাগরিব [مغرب]—মাগরিব নামাযের সময়

০ মাগরিব নামাযের পূর্বে নফল নামায না পড়া।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
০ মাগরিবের সময় ইফতার করা।-['সিয়াম' শিরোনাম দেখুন]

মাজুস [مجوس]—অগ্নি উপাসক

অগ্নি উপাসকদেরকে যিম্মী বানানোর জন্য সন্ধি এবং তাদের থেকে জিযিয়া নেয়া।
-['জিযিয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

মারআহ্ [مرأة]—মহিলা

১. সৌন্দর্যের প্রতি মহিলাদের প্রকৃতিগত আকর্ষণ চিরন্তনী। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'দু'টো লাল জিনিস মহিলাদেরকে ডুবিয়েছে। সোনা এবং জাফরান।'[১৭]
২. হদ প্রয়োগের প্রশ্নে মহিলাদের সাক্ষ্য প্রদান।-['হদ' এবং 'শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন]
০ পুরুষের মহিলাদেরকে সালাম দেয়া।-['সালাম' শিরোনাম দেখুন]
০ মুরতাদ মহিলাদেরকে হত্যা।-[দেখুন, 'রিদ্দাহ্' শিরোনাম]
০ মহিলাদের জন্য পর্দা।-['হিজাব' শিরোনাম দেখুন]
০ মহিলাদের ঈদের নামায।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
০ হায়েয নিফাস ওয়ালা মহিলাদের হাজ্জের ইহ্‌রাম বাধার জন্য গোসল করা।
-('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

মারাদুন [مرض] -অসুস্থতা

১. আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কুষ্ঠরোগীর সাথে খানা খেতেন।[১৮]
২. মারজুল মাওত (মৃত্যু শয্যায় শায়িত) ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা।-['হাজর' শিরোনাম দেখুন]
০ অসুস্থ ব্যক্তির নামায।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
০ অসুস্থ ব্যক্তির দান।-['হিবা' শিরোনাম দেখুন]

মাশ্‌ইউন [مشى]—পায়ে হেটে চলা

০ জানাযার সাথে দ্রুত হাটা।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]
০ জানাযার আগে আগে চলা।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]

মাশিয়াহ্ [ماشية]—গৃহপালিত পশু

গৃহপালিত পশুর যাকাত।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

মাসহুন [مسح]—মাসেহ করা

ওযু করার সময় মোজা, জুতো, পাগড়ি ও ওড়নার ওপর মাসেহ্ করা।
-[দেখুন, 'ওযু' শিরোনাম]

মাসজিদ [مسجد]—মসজিদ

১. মসজিদে ওযু করা

ইবনু সিরীন (রহ) বলেছেন—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য খলীফাগণ মসজিদে ওযু করতেন।'[১৯]

২. মসজিদে খেলাধুলা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদকে খেলাধুলার জায়গা বানাতে এবং সেখানে বাজে কথা বলা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতেন। কারণ, মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে —আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁর ইবাদাত। একবার তিনি বক্তৃতায় [খুতবায়] বলেছেন—'অচিরেই সিরিয়া বিজয় হবে। তোমরা এক নরম ভূমিতে প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা পেট পুরে খাওয়ার রুটি ও তেল প্রচুর পরিমাণে পাবে। সেখানে অনেক মসজিদ বানানো হবে। আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে মনে হয় তোমরা সেখানে খেলাধুলার জন্য যাবে। মসজিদ তো কেবল আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য তৈরী করা হয়।'[২০]

৩. মসজিদে জানাযার নামায আদায়।

-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

মা'সিয়াত [معصية]—অপরাধ, গুনাহ্

গুনাহ্‌র কাজে মানত করা।-['নাযর' শিরোনাম দেখুন]

মিনা [منى]—হাজ্জের এক স্থানের নাম

মিনায় গিয়ে হাজীগণ কি কি অনুষ্ঠান পালন করেন।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

মাকাসাহ্ [مقاصة]—ফিরিয়ে নেয়া

যাকাত এবং দান ফিরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

মাহর [مهر]—মোহরানা

নিভৃতে সাক্ষাত, যৌন মিলন এবং মৃত্যুর কারণে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়।-[দেখুন, 'নিকাহ্' এবং 'ইদ্দাত' শিরোনাম]

মুছলাহ্ [مثله]—নাক কান কেটে বিকলাঙ্গ করা

১. সংজ্ঞা

শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করাকে 'মুছলাহ্' বলে।

২. মুছলাহ্ এর ব্যাপারে বিধান

কিসাস অথবা হদ ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায়ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করার অনুমতি নেই। কিসাসে এরূপ করা যাবে। যেমন কেউ কারো হাত কেটে দিলো, কিসাস স্বরূপ তার হাত কেটে দেয়া যাবে। যে চুরি করবে হদ স্বরূপ তারও হাত কেটে দেয়া হবে। যদিও হাত কাটার ফলে সে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে। হযরত মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় ইয়ামামার গভর্নর ছিলেন। তাঁর সামনে দু'জন মহিলাকে হাজির করা হলো। একজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুৎসামূলক গান করছিলো এবং অন্যজন মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি করছিলো। তিনি তাদেরকে হাত কেটে দেয়ার এবং সামনের দাঁত উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি ইয়ামামার গভর্নরকে লিখলেন ঃ

'আমি জানতে পারলাম, তুমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুৎসামূলক কবিতা আবৃত্তির কারণে অমুক শাস্তি দিয়েছো। যদি তুমি এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে না যেতে তাহলে আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। কারণ, নবী-রাসূলদের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শাস্তি সাধারণ শাস্তির মতো হতে পারে না। যদি কোনো মুসলমান এরূপ করে সে মুরতাদ হয়ে যায় আর যদি কোনো যিম্মী এরূপ করে, তাহলে সে হারবী* হয়ে যায় এবং তার নিরাপত্তা চুক্তি নষ্ট হয়ে যায়। [কাজেই তাকে হত্যা করা বৈধ–অনুবাদক]। এখন রইলো সেই মহিলা যে মুসলমানকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে। যদি সে নিজেকে মুসলমান দাবী করে, তাহলে তাকে এমন শাস্তি দেয়া উচিত যা মুছ্‌লাহ্ [বিকলাঙ্গ]-এর চেয়ে কম হয়। আর যদি সেই মহিলা যিম্মী হয়, তাহলে আমার জীবনের শপথ তাকে মাফ করে দেয়া শিরকের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। আমি যদি তোমার এ ব্যাপারটি নিয়ে অগ্রসর হই তাহলে তুমি বিপদে পড়বে।' তিনি সে পত্রে এটিও লিখেছিলেন, মানুষকে বিকলাঙ্গ করা থেকে বিরত থেকো কেননা এটি গুনাহ্‌র কাজ এবং এতে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। হাঁ, যদি কিসাসের ব্যাপারে হয়, তার অনুমতি আছে।'[২১]

মুবাশারাত [مباشرة]—যৌন মিলন

ইহ্‌রাম অবস্থায় যৌন উত্তেজনায় স্ত্রীকে স্পর্শও করা যাবে না।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

মুযদালিফাহ্ [مزدلفة]—মুযদালিফা

হাজীগণ মুযদালিফা গিয়ে কি কি অনুষ্ঠান পালন করবেন।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

মুযারাআহ [مزارعة]—বর্গাচাষ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো—মুযারাআত (বর্গাচাষ) ও মুসাকাত (উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে চাষাবাদ) জায়েয। একথা তো ঐতিহাসিক সত্য যে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয় করেন, তখন সেখানকার অধিবাসীকে এই শর্তে জমি ও গাছ-পালা চাষাবাদের জন্য দিয়েছিলেন, তারা উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও খায়বারবাসীর সেই চুক্তি বলবত রেখেছিলেন।[২২] এমনকি তিনি নিজের জমিও এক-তৃতীয়াংশ ফসল দেয়ার শর্তে তাদেরকে বর্গা দিয়েছিলেন।[২৩] এসব আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জমির ওপর পরিশ্রমকারী উৎপাদিত ফসলের একটি অংশের মালিক হয়। যেমন এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু উৎপন্ন ফসলের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে চাষাবাদ করা যাবে না। যেমন ২০ ওসক প্রভৃতি। কেননা হতে পারে

* মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফির–অনুবাদক

জমিতে মাত্র সেই পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হবে কিংবা তার চেয়ে কম। এ জন্য তিনি এক-তৃতীয়াংশ ফসল প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিয়েছিলেন।

মুযিহাহ্ [موضحة]—গুরুতর জখম

এমন জখম যার কারণে হাড় দৃষ্টিগোচর হয়–তার দিয়াত।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

মুসহাফ [مصحف]—কুরআন মজীদ

আল কুরআনের ক্রয়-বিক্রয়।-['বায়' শিরোনাম দেখুন]

মুয়াল্লিফাতুল কুলুব [مؤلفة قلوبهم]—হৃদয় আকৃষ্ট করা

ইসলামের প্রতি কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত প্রদান করা।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২২।
২. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৪৬।
৩. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৭০, ৫৪৬।
৪. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭২৯।
৫. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৪৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭৫০।
৬. সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৯৫।
৭. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৫।
৮. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫২৩ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৩।
৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪০৮।
১০. সহীহ্ আল বুখারী ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪২৩ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২২৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩১ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১১৪, ১১৯ ; আল মাজমু, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৫৩ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬৫)।
১১. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৬৬।
১২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৫ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৪৫ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২২৫ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭২১ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৬৫ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৬ ; আল মাজমু, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৩৮।
১৩. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৪৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৫।
১৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫২ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫২১ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৫৫।
১৫. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫০২।
১৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৭।
১৭. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬০০।
১৮. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪০৫।
১৯. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৬ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬।
২০. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১৪।
২১. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৪০৯ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮-৫৬৯।
২২. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৬০, পৃ-৩৮৪ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৪।
২৩. কিতাবুল খারাজ, পৃ-১০৭ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৫৩৩।

য

যবাহ্ [ذبح]—যবেহ করা

গলা এবং ঘাড়ের রগ কেটে ফেলাকে 'যবাহ' বলা হয়। কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবীর বক্তব্য ছিলো —'মা পশুকে যবেহ করার সাথে সাথে তার গর্ভস্থ শাবকেরও যবেহ হয়ে যায়।'[১]

যাওজ [زوج]—স্বামী

- স্বামী মৃত স্ত্রীকে গোসল দেয়া।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]
- মৃত স্ত্রীকে দাফন করার ব্যাপারে স্বামীর অধিকার সবচে' বেশী।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]
- স্ত্রীর অধিকারের প্রশ্নে স্বামীর সাক্ষ্য প্রদান।-['শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন]

[আরো দেখুন–'নিকাহ্', 'তালাক', ইদ্দাত, রাজায়াহ্' এবং 'হিদানা' শিরোনাম]

যাওজাহ্ [زوجة]—স্ত্রী

এ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, 'যাওজ' শিরোনাম।

যাকাত [زكاة]—যাকাত

১. সংজ্ঞা

ধনী ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে আদায় করে নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় করার জন্য পৃথক করার নাম যাকাত।

২. যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা

যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন বা বুনিয়াদী স্তম্ভ। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করা কোনো মুসলিম শাসকের জন্য বৈধ নয়। কেউ তা প্রদানে অস্বীকার করলে প্রশাসন জোর করে আদায় করতে পারে। যদি কোনো দল বা গোষ্ঠী যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে, চাই তা যাকাত ফরয হবার ব্যাপারে করুক কিংবা অন্য কোনো ব্যাপারে, তারা কাফির বা মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য ফরয হবার ব্যাপারটি অস্বীকার না করে শুধু যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আমীরুল মুমিনীন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আর যদি যাকাত ফরয হবার ব্যাপারেই অস্বীকার করে বসে তবে তারা ফাসিক,* বিদ্রোহী এবং আমীরের আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া ব্যক্তি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন— 'আল্লাহ্‌র শপথ ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হচ্ছে—সম্পদে আল্লাহ্‌র অংশ। আল্লাহ্‌র কসম! যদি এরা আমাকে

* নেকী ও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়।

যাকাত বাবদ একটি ছাগল ছানাও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় দিতো, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।[২]

৩. যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

[৩.১] নিসাব পুরো হওয়া। সম্পদে ততোক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ফরয হয় না যতোক্ষণ তা নিসাব পরিমাণ না হয়। নিসাব এবং তার পরিমাণ নিয়ে আমরা সেখানে আলোচনা করবো যেখানে যাকাত হিসেবে প্রদেয় সম্পদের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩.২] এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। এ শর্ত নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের সম্পদ এবং গবাদী পশুর জন্য প্রযোজ্য। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'কোনো সম্পদের ওপর ততোক্ষণ যাকাত ফরয হবে না, যতোক্ষণ তা এক বছর অতিবাহিত না হবে।[৩]

এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সম্পদের মূলনীতি হচ্ছে—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট যদি একই প্রকার সম্পদ নতুন ভাবে হস্তগত হয় এবং সব মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তবে ধরে নিতে হবে সমস্ত সম্পদই তার নিকট এক বছর পর্যন্ত ছিলো। কাজেই সমস্ত সম্পদ থেকেই যাকাত পৃথক করতে হবে। আর যদি অন্য প্রকার সম্পদ বছরের মাঝামাঝি হস্তগত হয়, তাহলে যখন থেকে সেই সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে ঐ সম্পদের বছর গণনা শুরু করতে হবে এবং বছর শেষে তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে।[৪] এজন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন লোকদের মাঝে বাৎসরিক ভাতা প্রদান করতেন তখন তার গ্রহণকারীকে জিজ্ঞেস করতেন, এ ধরনের সম্পদ তার আরো আছে কিনা যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে। যদি হাঁ সূচক জবাব দিতেন তাহলে ভাতা কমিয়ে দিতেন। আর যদি না সূচক জবাব দিতেন তাহলে তাকে পুরো ভাতা প্রদান করতেন।[৫]

৪. যেসব সম্পদে যাকাত ফরয হয় এবং তার পরিমাণ

[৪.১] নগদ অর্থের যাকাত ঃ টাকা, সোনা এবং রূপা নগদ অর্থের অন্তর্ভুক্ত। সোনার নিসাব ২০ মিছকাল [অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা–অনুবাদক] এবং রূপার নিসাব ২০০ দিরহাম [বা সাড়ে বায়ান্না তোলা–অনুবাদক]। যাকাত আদায়ের পরিমাণ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহ্‌রাইনে পাঠান তখন তিনি তাকে যে লিখিত হিদায়াত দিয়েছিলেন, সেখানে ছিলো—'দুইশো' দিরহামে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পাঁচ দিরহাম আদায় করবে। আর যদি কারো নিকট একশ' নব্বই দিরহাম থাকে [অর্থাৎ নিসাব থেকে দশ দিরহাম কম] তার কোনো যাকাত নেই। যদি আল্লাহ্ মনযুর করেন, তবে ভিন্ন কথা।[৬]-[অর্থাৎ যদি সে সাহেবে নিসাব না হয়েও যাকাত আদায় করে দেন তবে তা ভিন্ন কথা।-অনুবাদক]

[৪.২] ব্যবসার মালের যাকাত ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ব্যবসার মালের যাকাত নগদ অর্থের যাকাতের অনুরূপ। অর্থাৎ ব্যবসায়িক পণ্যের বাজার মূল্য হিসেব করে নগদ টাকায় তার যাকাত আদায় করা।

ব্যবসার মালের যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব প্রশাসকের। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেরাই ব্যবসার মালের যাকাত সংগ্রহ করতেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় যখন

ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করে তখন তিনি অনুভব করলেন শুধু যাকাত আদায়ের জন্যই তাদের পিছু লেগে থাকতে হবে, তারচেয়ে বরং মালিকদেরকে তা আদায় এবং বণ্টনের ভার দেয়া যেতে পারে। এভাবে তিনি মালিকদেরকে যাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য আমীরুল মু'মেনীনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করেছিলেন।[৭]

[৪.৩] গবাদি পশুর যাকাত

[৪.৩ক] ফরয হওয়ার শর্ত ঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গবাদি পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহের প্রয়োজন মনে করতেন।

০ পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হওয়া ঃ এ ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—'কোনো সম্পদে এক বছর অতিবাহিত না হলে তার যাকাত নেই।'

০ নিসাব পূর্ণ হওয়া ঃ আমরা উটের নিসাব আলোচনার সময় এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করবো। সাধারণত পাঁচটি উটে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে প্রদেয়। আর ছাগল ভেড়া প্রতি চল্লিশে একটি প্রদেয়।

০ চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো পশু ঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো ছাগল ভেড়া চল্লিশ থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত যাকাত স্বরূপ একটি ছাগল প্রদেয়।'

[৪.৩খ] উটের যাকাত ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐ পত্র[1] যা তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহ্‌রাইনে পাঠানোর সময় দিয়েছিলেন। এটি যাকাত ধার্য করার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সেখানে লিখা ছিল—

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

এ যাকাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ওপর ফরয হিসেবে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই যে মুসলমানদের কাছে সঠিক পরিমাণে যাকাত চাওয়া হবে সে তা যথাযথভাবে আদায় করবে। আর যার কাছে সঠিক পরিমাণের চেয়ে বেশী চাওয়া হবে, তা আদায়ে অস্বীকার করার অধিকার তার আছে। চব্বিশ বা তারচেয়ে কম উটে প্রতি পাঁচটির পরিবর্তে একটি ছাগল যাকাত (স্বরূপ) দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন একটি বিনতে মাখায[2] যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। যদি এ ধরনের উট পালে না থাকে তবে ইবনু লাবুন[3] প্রদান করতে হবে। আর যখন উটের সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে তখন তার জন্য একটি বিনতে লাবুন[4] উট ছিচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত হলে একটি 'হিক্কাহ্'[5] যাকাত প্রদান করতে হবে। একষট্টি থেকে পচাত্তর পর্যন্ত এক জুয্‌আহ্[6] যাকাত দিতে হবে। ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দু'টো বিনতে লাবুন দিতে হবে।

---

1. ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ যাকাত অধ্যায়ে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
2. উটনীর মাদী বাচ্চা, যা এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দু বৎসরে পা দিয়েছে।
3. উটনীর নর বাচ্চা, যা দু বৎসর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়েছে।
4. উটনীর মাদী বাচ্চা, যা দুঃ বৎসর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়েছে।
5. তিন বছর পুরো হয়ে চতুর্থ বছরে পা দিয়েছে এমন মাদী উট। এ সময় এর ওপর আরোহণ করা যায় বিধায় একে 'হিক্কাহ্' বলে।
6. যা চার বছর অতিবাহিত হয়ে পাঁচ বছরে পড়েছে এমন উট।

সংখ্যা একানব্বই থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত যাকাত বাবদ দু'টো 'হিক্কাহ' প্রদান করতে হবে। যদি উটের সংখ্যা একশ' বিশের চেয়েও বেড়ে যায় তবে বাড়তি প্রতি চল্লিশ উটের জন্য একটি বিনতে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য একটি করে 'হিক্কাহ' যাকাত বাবদ প্রদান করতে হবে। যদি কারো কাছে চারটি উট থাকে তার কোনো যাকাত নেই। যদি আল্লাহ্ চাহে তো দেন তবে ভিন্ন কথা। উটের সংখ্যা পাঁচে গিয়ে দাঁড়ালেই একটি ছাগল যাকাত বাবদ দিতে হবে।

যে ব্যক্তির ওপর যাকাত হিসেবে 'জুয্‌আহ্' ওয়াজিব কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং 'হিক্কাহ্' আছে তার কাছ থেকে 'হিক্কাহ' গ্রহণ করলেও চলবে, তবে সম্ভব হলে তার সাথে দু'টো ছাগল গ্রহণ করতে হবে। ছাগল গ্রহণ সম্ভব না হলে অতিরিক্ত বিশ দিরহাম আদায় করতে হবে। আর যদি কারো ওপর যাকাত বাবদ 'হিক্কাহ্' ওয়াজিব হয় কিন্তু তা তার কাছে নেই বরং 'জুয্‌আহ্' আছে, তাহলে তার কাছে জুয্‌আহ্' আদায় করে দু'টো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম তাকে ফেরত দিতে হবে। যদি কারো ওপর যাকাত বাবদ 'হিক্কাহ্' ওয়াজিব হয় আর তার কাছে শুধু বিনতে লাবুন থাকে, তাহলে তার থেকে তা নিয়ে অতিরিক্ত দু'টো ছাগল বা বিশ দিরহাম ফেরত দিতে হবে। তদ্রূপ যার ওপর বিনতে লাবুন প্রদান করা ওয়াজিব তার নিকট তা নেই, আছে 'হিক্কাহ্' তাহলে তার কাছ থেকে 'হিক্কাহ্' নিয়ে তাকে দু'টো ছাগল বা বিশ দিরহাম ফেরত দিতে হবে। তদ্রূপ যদি কারো ওপর বিনতে লাবুন প্রদান ওয়াজিব হয় এবং তা তার কাছে না থাকে, বরং বিনতে মাখায থাকে তাহলে তা নিয়ে দু'টো ছাগল অথবা বিশ দিরহামও তার কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করতে হবে। আর যদি কারো ওপর যাকাত বাবদ বিনতে মাখায ওয়াজিব হয় কিন্তু তার কাছে বিনতে লাবুন থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বিনতে লাবুন নিয়ে দু'টো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম তাকে ফেরত দিতে হবে। যদি তার কাছে বিনতে মাখায না থেকে ইবনু লাবুন থাকে তাহলে তার কাছ থেকে ইবনু লাবুন নিতে হবে। কিন্তু তার সাথে আর কিছু নেয়া যাবে না।[৮]-(পুরো পত্রটি ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ যাকাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।)

[৪.৩গ] ছাগল-ভেড়ার যাকাত ঃ ছাগল ভেড়ার নিসাব চল্লিশ। এরচেয়ে কমে যাকাত নেই। যদি চল্লিশটি ছাগল কিংবা ভেড়া হয় তবে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই পত্র যা আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে লিখেছিলেন। তাতে এও লিখা ছিল ঃ

আর যদি চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো ছাগল চল্লিশটি হয়, তাহলে একশ' বিশটি পর্যন্ত যাকাত বাবদ একটি ছাগল দিতে হবে। একশ' একুশ থেকে দু'শ পর্যন্ত দু'টি ছাগল। দু'শ এক থেকে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি ছাগল। উর্ধে প্রতি শ'য়ে একটি করে ছাগল প্রদেয়। আর যদি চরে বেড়ানো ছাগল চল্লিশের চেয়ে একটিও কম হয় তবে কোনো যাকাত নেই। অবশ্য তার প্রতিপালকের ইচ্ছে হলে ভিন্ন কথা।[৯]

[৪.৩ঘ] ঘোড়া ও গোলামের যাকাত ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া ও গোলামের যাকাত আদায় করতেন না। অবশ্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐচ্ছিক হিসেবে এর যাকাত আদায় করেছেন, বাধ্যতামূলক নয়। নিম্নের ঘটনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য। সিরিয়ার কতিপয় মুস্তাকী লোক গভর্নর আবু উবায়দা ইবনু জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন—'আমাদের ঘোড়া

ও গোলামের যাকাত গ্রহণ করুন।' তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘটনা লিখে জানালেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—'ঘোড়া ও গোলাম তো আমাদের সম্পদ, কাজেই এর যাকাত গ্রহণ করুন।' তিনি বললেন—'আমি তোমাদের থেকে তা আদায় করতে পারি না যা আমার পূর্ববর্তী দু' হযরত (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু) আদায় করেননি।' অতপর তিনি সাথীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'ঠিক আছে, তারা যখন ইচ্ছে করে দিতে চায় তাহলে গ্রহণ করুন। তবে এটি যেন জিযিয়ার মত না হয় যে, আপনার পরও তা সংগ্রহ অব্যাহত রাখবে।'[১০]

[৪.৩৬] গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রহ ঃ গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব সরকারের।[১১] সরকারী কালেক্টরের এ অধিকার নেই, সে যাকাতের পশু সংগ্রহের সময় বেছে বেছে ভালো পশু নেবে কিংবা খারাপ পশু নেবে। বরং মাঝারী ধরনের পশু গ্রহণ করবে। সমস্ত পশুকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রথম ভাগে ভালো পশু, দ্বিতীয় ভাগে দুর্বল পশু এবং তৃতীয় ভাগে মাঝারী ধরনের পশু। তারপর যাকাতের জন্য তৃতীয় ভাগ থেকে পশু সংগ্রহ করতে হবে।[১২] বুড়ো এবং কানা পশু যাকাত বাবদ সংগ্রহ করা যাবে না। কারণ, তা দুর্বল পশুর অন্তর্ভুক্ত। খাসী বা ভেড়াও নেয়া যাবে না, কেননা তা উত্তম পশুর মধ্যে গণ্য। হাঁ, যদি মালিক খুশী হয়ে দেয়, তবে তা নেয়ায় কোনো দোষ নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন —'যাকাত বাবদ কানা ও বুড়ো পশু নেয়া যাবে না। এমনকি খাশীও নেয়া যাবে না। তবে যদি মালিক স্বেচ্ছায় দেয়, তাহলে কোনো দোষ নেই।'[১৩]

৫. যে পরিমাণ যাকাত প্রদান ওয়াজিব তারচেয়ে বেশী প্রদানে অস্বীকার করার অধিকার

যাকাত এমন একটি ফরয ইবাদাতযার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাকাত প্রদানকারী যেমন তাতে কম করার ক্ষমতা রাখে না তদ্রূপ যাকাত কালেক্টরও তাতে বাড়িয়ে নেবার কোনো অধিকার রাখে না। যদি সরকারী কালেক্টর নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী দাবী করে, তবে মালিক তা আদায়ে অস্বীকার করতে পারেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখেছিলেন—'যে মুসলমানের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত তলব করা হবে তা সে আদায়ে বাধ্য কিন্তু পরিমাণের চেয়ে বেশী দাবী করলে সে তা আদায়ে বাধ্য নয়।'[১৪]

৬. যাকাতের মাল বৃদ্ধি করার উদ্‌যোগ

যাকাতের মাল বৃদ্ধি করার উদযোগ নেয়া ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। বিশেষ করে যতোক্ষণ সে সম্পদ তাঁর দায়িত্বে থাকে। যদি বণ্টন হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাতের উটকে রাব্‌যা নামক অঞ্চলে এবং তার আশপাশে চরে বেড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিতেন। যদি কোনো উট কৃশ বা দুর্বল হয়ে যেত তা সেখানে চরে মোটাতাজা হতো।[১৫]

৭. যাকাত বণ্টনের খাত

[৭.১] আল্লাহ্ তাআলা সূরা আত তাওবায় যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, তাদের দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

যে ব্যক্তি নির্ধারিত আটটি খাতের যে কোনো একটি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করবে, ইনশাআল্লাহ্ তার যাকাত কবুল হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত খাতের বাইরে কোনো খাতে খরচ করবে তার যাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনরায় সেই পরিমাণ টাকা বা সম্পদ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন —'যে ব্যক্তি তার যাকাত এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবে যে তার হকদার নয়—এমন ব্যক্তির যাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই সে সমস্ত পৃথিবীই যাকাত বাবদ দিক না কেন।'[১৬]

[৭.২] সেই ব্যক্তি যার মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য তাকেও যাকাত প্রদান করা যাবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাতের মাল খরচ করে লোকদেরকে নেকীর দিকে মনোযোগী করে তুলতেন। বর্ণিত আছে তিনি আদী ইবনু হাতিম তাঈ এবং যবরকান ইবনু বদরকে যাকাতের সম্পদ থেকে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এরা উভয়েই ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন—আদী ইবনু হাতিম তার গোত্র থেকে তিনশ' যাকাতের উট নিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি ত্রিশটি উট তাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন—তোমার গোত্রের অনুগত লোকদেরকে একত্রিত করে খালিদ ইবনু ওয়ালিদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায় এক হাজার লোক নিয়ে শামিল হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। ইমাম বাইহাকী বলেন —বর্ণনায় একথা উল্লেখ করা হয়নি যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আদীকে এ ত্রিশটি উট কোথেকে দিয়েছিলেন। তবে বর্ণনার স্পষ্টতায় বুঝা যায়, তিনি হযরত আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার মন জয় করার জন্য যাকাতের উট থেকেই প্রদান করেছিলেন।[১৭]

যাকাতুল ফিতর [زكاة الفطر]—ফিত্‌রা

১. সংজ্ঞা

রমযান মাসে (রোযার শেষে) ধনী কর্তৃক তার রোযার পবিত্রতা বিধানের জন্য গরীবদেরকে প্রদেয় দানকে যাকাতুল ফিত্‌র বলে।-[একে সাদকাতুল ফিত্‌রও বলা হয়।-অনুবাদক]

২. যাকাতুল ফিত্‌র কী বস্তু দিয়ে আদায় করতে হবে

যাকাতুল ফিত্‌র দেশের প্রধান ও জাতীয় খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আদায় করতে হয়। ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন—'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুঈনদের থেকে যাকাতুল ফিত্‌র বাবদ পনির গ্রহণ করেছেন।'[১৮]

৩. যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ অর্ধ সা' গম বা আটা। সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় অর্ধ সা' গম আদায় করা হতো।'[১৯] -[অর্ধ সা' আমাদের দেশীয় হিসেবে পৌনে দু' সেরের মতো।-অনুবাদক]

যামান [ضمان]—জামিন হওয়া, ক্ষতিপূরণ প্রদান

মুরতাদ কিংবা বিদ্রোহী থেকে সেই সম্পদের জরিমানা আদায় যা তারা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

-[দেখুন, 'রিদ্দাহ্' এবং 'সুলহ্' শিরোনাম]

যারব [ضرب]—প্রহার করা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় হচ্ছে—থাপ্পর দিলে কিংবা বেত অথবা চাবুক দিয়ে মারলে কিসাস ওয়াজিব হয়ে যায়।[২০]

যাহাব [ذهب]—সোনা

সোনার যাকাত।-[দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

যিকরুল্লাহি তাআলা [ذكر الله تعالى]—আল্লাহ্‌র স্মরণ, যিকির

১. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে রত থাকতেন। মনকে আল্লাহ্‌মুখী করে রাখতেন এবং বিভিন্ন দু'আ করতে থাকতেন। আমরা তার সবগুলো দু'আ জানতে পারিনি তবে একটি দু'আ ছিল নিম্নরূপ ঃ

'হে আল্লাহ্ আমার জীবনের শেষ অংশকে উত্তম বানিয়ে দাও। শেষ দিকের আমলকে উত্তম আমলে পরিণত করে দাও। আমার এ জীবনব্যবস্থাই আমার কাছে উত্তম যার ওপর চলে আমি তোমার নিকট হাজির হবো।'[২১]

২. নামাযের দ্বিতীয় রাকায়াতে আল কুরআনের দু'আ সংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে দু'আ করা।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

নামাযের পর তাসবীহ্ তাহলীল পড়া।-['সফর' শিরোনাম দেখুন]

যিনা [زنا]—ব্যভিচার

১. সংজ্ঞা

বয়সপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান, যে বৈধ অবৈধ সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন (মুকাল্লাফ) ব্যক্তি কর্তৃক যে মহিলার সাথে তার বিয়ে হয়নি অথবা যে মহিলা তার নিজ মালিকানায় নেই এমন মহিলার সাথে যৌন মিলন করার নাম 'যিনা'।

অবশ্য আমরা অচিরেই জানতে পারবো যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ মহিলার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করেননি যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

২. এ ধরনের অপরাধের গোপনীয়তা রক্ষা করা

যিনা এমন একটি অপরাধ যার কারণে হদ [শরীয়াহ্ নির্ধারিত শাস্তি] জারী করা অপরিহার্য (ওয়াজিব) হয়ে পড়ে। যেসব অপরাধ আল্লাহ্‌র হকের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং হদ প্রয়োগ করা ওয়াজিব, সেসব অপরাধের গোপনীয়তা রক্ষা করা অধিকতর শ্রেয়। এজন্য যিনার অপরাধে অপরাধী এমন ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করা তা প্রকাশ কিংবা তার সাক্ষ্য প্রদানের চেয়ে উত্তম।-[আরো দেখুন, 'হাদ' শিরোনাম]

৩. যিনার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আলামত

যিনার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যেসব আলামত প্রয়োজন তার কয়েকটি নিচে দেয়া হলো ঃ

[৩.১] তখনই কোনো ব্যক্তির ওপর যিনার অভিযোগ প্রমাণিত হবে যখন সে চারবার তার অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদান করবে।-['ইকরার' শিরোনাম দেখুন]

অথবা চারজন লোক তার অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।-['হদ' শিরোনাম দেখুন]

অবশ্য ব্যভিচারীর প্রকৃতি ভেদে 'হদ' প্রয়োগে বিভিন্নতা হয়। যদি ব্যভিচারী মুহ্‌সিন* হয়, তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। বেত্রাঘাত করা যাবে না। আর যদি ব্যভিচারী মুহ্‌সিন না হয় তবে তাকে একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে। এবং তাকে দেশান্তরও করা যাবে। সে পুরুষ অথবা মহিলা যা-ই হোক না কেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করেছেন এবং দেশান্তরও করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এরূপ করেছেন।[২২]

এক ব্যক্তি বনী বকর গোত্রের এক মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করলো। অবশ্য সে মুহ্‌সিন ছিলো না এ জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে একশ' বেত্রাঘাত করে এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।[২৩]

এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে দাওয়াত করলেন। মেহমান এসে সুযোগ বুঝে তার বোনকে ধর্ষণ করলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবান বন্দী দিলো। তিনি তাকে একশ' বেত্রাঘাত করে ফাদাক এলাকায় নির্বাসন দিলেন। তিনি মহিলাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। কারণ, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ কাজ করা হয়েছিলো। তারপর তিনি ঐ ব্যক্তির সাথে সেই মহিলার বিয়ে দিয়ে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন।[২৪]

একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে কিছু বললো। কথাগুলো বুঝা যাচ্ছিলো না। তাছাড়া তাকে খুব ভীতু দেখাচ্ছিলো। তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—'যাও, তার কাছে জিজ্ঞেস কর, সে কি বলতে চায়। কোনো জরুরী বিষয় হতে পারে।' ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট

* যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় মুহ্‌সিন বলা হয়। যথা ঃ (১) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, (২) বুদ্ধিমান হওয়া, (৩) স্বাধীন হওয়া এবং (৪) বৈধ বিবাহের পর স্ত্রী মিলনের সুযোগ থাকা।

গেলেন, সে বললো—'এক ব্যক্তি আমার বাড়িতে মেহমান হয়েছে। সে আমার মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করে দিয়েছে।' একথা শুনে তিনি তার বুকে হাত মেরে বললেন—'আরে হতভাগা ! তোমার মেয়ের গোপনীয়তা তুমি কেন রক্ষা করছো না ? অতপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে তাদের দু'জনকে বেত্রাঘাত করা হলো এবং উভয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়া হলো। তারপর তাদেরকে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হলো।[২৫]

এক ব্যক্তি এক কুমারী মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করে দেয়। পরে উভয়েই স্বীকারোক্তিমূলক জবান বন্দী প্রদান করে। তিনি তাদেরকে বেত্রাঘাত করে সেখানেই দু'জনের মধ্যে বিয়ে পড়িয়ে দেন এবং এক বছরের জন্য উভয়কে এলাকা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন।[২৬]

এক ব্যক্তি এক মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। উভয়েই অবিবাহিত ছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে একশ' করে বেত্রাঘাত করে এক বছরের নির্বাসনে পাঠালেন। নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দু'জনকে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।[২৬]

ওপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল [অবিবাহিত] প্রত্যেক ব্যভিচারীকেই নির্বাসন দেয়া হয়েছে। চাই সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা।

[৩.২] ব্যভিচারী মহিলাকে বিয়ে ঃ ব্যভিচারী মহিলা যদি তাওবা করে এবং তার জরায়ু পবিত্র করে নেয় অথবা ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে প্রসবের পর তাকে বিয়ে করা জায়েয।[২৭] ব্যভিচারী নারী পুরুষ উভয়েই যদি স্বীকারোক্তিমূলক জবান বন্দী দেয়। তবে তাদের দু'জনের সম্মতিতে পরস্পর বিয়ে হতে পারে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের যে ঘটনাগুলো ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তাতে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি এ ধরনের পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর কথা ছিলো—'ব্যভিচারী পুরুষ এবং মহিলার সবচেয়ে বড়ো তাওবা হচ্ছে—তারা পরস্পরকে বিয়ে করবে।'[২৮] তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে এক মহিলার সাথে যিনা করে তাকে আবার বিয়ে করতে চায়। তিনি বলেছিলেন—'তারা দু'জন পরস্পরকে বিয়ে করে নেবে এর চেয়ে বড়ো কোনো তাওবা নেই।'[২৯] বিয়েই একমাত্র মাধ্যম যা দিয়ে দু'জনের অবৈধ কাজকে বৈধতার সনদ দেয়া যায়।

[৩.৩] ব্যভিচারী মহিলার ইদ্দত ঃ ইদ্দত শুধু বিয়ের কারণে পালনীয়, তাই ব্যভিচারী মহিলার কোনো ইদ্দত নেই। তার জন্য শুধু এতটুকুই প্রয়োজন যে, সে এক হায়েয অতিবাহিত করে জরায়ুকে গর্ভ থেকে পবিত্র করে নেবে।[৩০]

যিনাত [زينة]—সৌন্দর্য

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ওয়াশমুন' শিরোনাম

যিম্মাহ্ [ذمة]—নিরাপত্তা, যিম্মাদারী

যদি কোনো যিম্মী [জিযিয়া প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম] রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোনো ধরনের কটুক্তি করে, তাহলে তার প্রাপ্ত নিরাপত্তা বাতিল হয়ে যাবে এবং সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একজন কাফিরের সমতুল্য গণ্য হবে। কাজেই তখন তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি

কোনো মুসলমানকে গালি দেয়, তাহলে তার অর্জিত নিরাপত্তা বাতিল হবে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনু মুহাজিরকে লিখেছিলেন—'যে যিম্মী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্বা সম্পর্কে কোনোরূপ কটুক্তি করবে সে যেন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং সে যুদ্ধাপরাধী। আর যদি তাদের মধ্যে কেউ কোনো মুসলমানকে গালি দেয় তবে আমার জীবনের শপথ তাকে মাফ করা শির্‌কে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।[৩১]

যুফ্‌রুন [ظفر]—নখ

যিনি হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেধেছেন নখ কাটা তার জন্য নিষিদ্ধ।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

যুলম [ظلم]—অত্যাচার, যুল্‌ম

এমন জিনিস দিতে অস্বীকার করা যা দেয়া তার ওপর অপরিহার্য নয়।-[আরো জানতে হলে দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম]

যুহ্‌রন [ظهر]—দুপুর, যোহর নামায

- যোহর নামাযের সময়।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
- জুম'আর নামাযের সময় যোহরের সময়ের অনুরূপ।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]
- আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর নামায একত্রে আদায় করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

যুহা [ضحى]—দিনের প্রথম প্রহর

চাশ্‌তের নামায।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪১৯।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী যাকাত অধ্যায়ে যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতা অনুচ্ছেদে, ইমাম মুসলিম ঈমান অধ্যায়ে যুদ্ধের নির্দেশ অনুচ্ছেদে, ইমাম মালিক, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম আবু দাউদ, স্ব স্ব গ্রন্থে যাকাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩১ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৭৬ ; মুসান্নাফ-আবুদর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৭৪ ; আল মাজমু' পৃ-৩২৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭৪ ; আরো দেখুন-'রিদ্দাহ্‌' শিরোনাম।

৩. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৫ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৪৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১-২ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৭৬ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৭৪ ; আল মাজমু' পৃ-৩২৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড।

৪. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬২৬।

৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৭৬ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১-৯ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৪১১।

৬. সহীহ্ আল বুখারী, যাকাত অনুচ্ছেদ, সুনানু আবু দাউদ যাকাত অধ্যায়, নাসাঈ যাকাত অধ্যায় আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৫।

৭. বাদাইউস সানায়ি', ২য় খণ্ড, পৃ-৭।

৮. বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৮১ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৯, ২৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭৫।

৯ সহীহ্ আল বুখারী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসাঈ, যাকাত অধ্যায় ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৮৬ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৯, ২৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭৬।

১০. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৫ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৪ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭৭ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠ-২২৭, ২২৯ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৪৬৫ ; বাদাইউস সানাইউ, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬২০ ; ফিক্‌হে হযরত ওমর (রা) যাকাত শিরোনাম।

১১. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৩।

১২. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৭৫।

১৩. আল মাজমু', ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৫ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৩।

১৪. সহীহ্ আল বুখারী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসাঈ, এবং জামি আত তিরমিযি কিতাবুয যাকাত ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৮৪ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড ; পৃ-৩০৯।

১৫. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬১৭।

১৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৫ ; আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫২।

১৭. সুনানু বাইহাকী ৭ম খণ্ড, পৃ-১৯।

১৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৯।

১৯. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৯ ; আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫৪৫।

২০. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৮, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৫৬।

২১. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪১৯।

২২. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৩৩।

২৩. জামিউত তিরমিযি, হুদুদ অধ্যায় ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৮৩ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৬৮।

২৪. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২২৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৮ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১০।

২৫. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২২২ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১১ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৭৬।

২৬. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৫।

২৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৪, ২১৯।

২৮. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৬০৩।

২৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০৪ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪।

৩০. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫০।

৩১. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৪০৯ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।

র

রমল [رمل]—তাওয়াফের সময় কাধ উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলা

০ তাওয়াফের সময় 'রমল' করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

০ জানাযাকে দ্রুত নিয়ে চলা।-[দেখুন, 'মাওত' শিরোনাম]

রমাদান [رمضان]—রমযান

রমযানের রোযার গুরুত্ব।-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

রমি [رمى]—নিক্ষেপ করা

০ জুম্‌রাতুল ওকবায় কংকর নিক্ষেপ করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

০ জুমরাতুল ওকবায় কংকর নিক্ষেপের পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেয়া।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

রাজ'আত [رجعة]—তালাক প্রত্যাহার করা

১. রাজআত বলা হয় স্বামী স্ত্রীকে রিজঈ তালাক প্রদানের পর পুনরায় (তালাক প্রত্যাহার করে) স্ত্রীকে বিয়ে বন্ধনে নিয়ে নেয়া।

২. স্ত্রীকে তালাকে রিজঈ [প্রত্যাহার যোগ্য তালাক] প্রদানের পর স্ত্রী তৃতীয় হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তাকে প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে। সর্বোচ্চ দু'বার এরূপ করতে পারে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'পুরুষ তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে [যদি তালাকে রিজঈ প্রদান করা হয়] তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে অধিক হকদার। যতোক্ষণ স্ত্রী তৃতীয় হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জন না করবে।'[১]

রাদ্ [رد]—পুনরাবৃত্তি

পরিত্যক্ত সম্পদে যাবিল ফুরূযদের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পদ পুনরায় তাদের মাঝে তাদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়াকে 'রাদ্' বা পুনরাবৃত্তি বলে।

-[দেখুন, 'ইর্‌ছ' শিরোনাম]

রা'সুন [رأس]—মাথা

মলমূত্র ত্যাগের প্রাক্কালে মাথা ঢেকে রাখা।-(দেখুন, 'তাখাল্লুয়ুন' শিরোনাম)

রাহ্‌বাহ [رهبة]—সন্ন্যাস ব্রত

মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পার্থিব সবকিছু পরিত্যাগ করে পৃথকভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মনোনিবেশ করাকে 'রাহবাহ্' অথবা রুহ্‌বানিয়াত বলে।

যুদ্ধের সময় রাহিবদের (সংসার বিরাগীদেরকে) হত্যা করা নিষিদ্ধ।

–(দেখুন, 'জিহাদ' শিরোনাম)

রাহিম [رحم]—আত্মীয়তা

১. সংজ্ঞা

ঐসব আত্মীয়কে 'রাহিম' বলে যারা একই ঔরসজাত।

২. আত্মীয়তার প্রকার

আত্মীয় দু' প্রকার। **প্রথমতঃ** মুহাররাম আত্মীয় স্বজন। যেমন উর্ধতন বংশধর, যথা—পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী প্রমুখ। অধঃস্তন বংশধর, যথা—সন্তান, সন্তানের সন্তান প্রমুখ। তদ্রূপ ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতার পক্ষের অধঃস্তন বংশধর যেমন—ভাই, বোন, ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের ছেলে, বোনের মেয়ে প্রমুখ। দাদা এবং নানার অধঃস্তন বংশধরদের শুধু প্রথম ধাপ। যেমন—চাচা, ফুফু, খালা এবং মামা। উল্লেখিত পুরুষ ও মহিলা আত্মীয়ের মধ্যে পরস্পর বিয়ে হারাম।

দ্বিতীয় ঃ গাইর মুহাররাম। যেমন—চাচার সন্তান, মামার সন্তান, ফুফুর সন্তান, খালার সন্তান প্রমুখ। এদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে শাদী জায়েয।

৩. আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ওয়ারিস ['ইর্‌ছ শিরোনাম দেখুন]। **আত্মীয় স্বজনের জন্য** ব্যয় করা।–('নাফাকাহ্‌ শিরোনাম দেখুন)

গোলাম অথবা বাঁদী ক্রয়-বিক্রয়ের সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা।-[দেখুন, 'রিককুন' শিরোনাম]

আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালন।–['হিদানাহ্‌' শিরোনাম দেখুন]

রিককুন [رق]—দাসত্ব

১. সংজ্ঞা

'রিক্‌কুন' এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার নাম যা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও কুফরী শক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের শাস্তি স্বরূপ প্রদান করা হয়।

২. উম্মু ওয়ালাদ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো—উম্মু ওয়ালাদকে [যে বাঁদীর গর্ভে মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করে] যদি মালিক মুক্ত করে দেয় তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে।[২] এজন্য তিনি তার বিক্রির অনুমতি দিয়েছিলেন।-[আরো জানতে হলে দেখুন, বায় শিরোনাম]

৩. দাস-দাসীর সাথে আচরণ

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় হচ্ছে—দাস-দাসীর সাথে শরীয়াহ্‌ নির্দেশিত পদ্ধতিতে ভালো আচরণ করা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা তিনি নিজেই দাস-দাসীকে তার দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। উবাদা ইবনু ওয়ালিদ ইবনু উবাদা ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি আবুল ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যিনি ইয়েমেনী চাদর ও পশমী টুপি পরতেন এবং তার চাকরকে তদ্রূপ পরাতেন—বলতে শুনেছেন,

আমার দু' চোখ দেখেছে, দু' কান শুনেছে এবং আমার হৃদয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা স্মরণ রেখেছে যে—'তোমাদের দাস- দাসীকে তাই খেতে দাও যা তোমরা খাও, তাই পরতে দাও যা তোমরা পর।' আবুল ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলতেন—'গোলাম বাঁদীকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে দেয়া অধিকতর সহজ, কিয়ামতের দিন নেকী থেকে প্রদান করার চেয়ে। ইবনু হাযাম (রহ) বলেন—আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এরূপ রিওয়ায়েত করেছি।[৩]

৪. সন্তানকে তার মা থেকে পৃথক করা

গোলাম বাঁদীর সাথে এটিও সদাচারণের অন্তর্ভুক্ত, মা থেকে সন্তানকে পৃথক না করা, বিশেষ করে যে সন্তান মায়ের তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী। যদি সন্তান বড়ো হয়ে যায় এবং মা-বাপের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে পৃথক করা যেতে পারে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এরূপ করেছেন। সালমা বিন ওকু' রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠান। তা ছিল ফুযারা গোত্রের বিরুদ্ধে। যখন আমরা ফুযারা গোত্রের কূপের কাছে পৌঁছুলাম তখন রাতের শেষ ভাগ। তিনি আমাদেরকে বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। ফযর নামাযের পর আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করলাম। এতে বহু লোক হতাহত হলো। আমি কিছু লোককে মহিলা ও শিশুসহ পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে দেখলাম। সাথে সাথে আমি তাদের পিছু ধাওয়া করলাম। ভয় হলো হয়তো তারা আমার আগেই পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। আমি একটি তীর নিক্ষপ করলাম। যা তাদের ও পাহাড়ের মাঝামাঝি গিয়ে বিদ্ধ হলো। তারা ভয় পেয়ে ফিরে দাঁড়ালো। আমি তাদেরকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাড়িয়ে নিয়ে এলাম। তাদের মধ্যে ফুযারার একজন মহিলা ছিল, পুরনো চামড়ার পোশাক পরিহিতা। তার সাথে তার এক কন্যা ছিলো। অত্যন্ত সুন্দরী। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কন্যাটি আমাকে পুরস্কার স্বরূপ দান করলেন। আমি তাকে নিয়ে মদীনায় চলে এলাম। রাস্তায় তার সাথে দৈহিক সম্পর্কস্থাপন করিনি। মদীনায় এসেও প্রথম রাতে তার কাছে গেলাম না। সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাজারে দেখা। তিনি বললেন—'সালমা ! ঐ মেয়েটি আমাকে দান করে দাও।' আমি আরজ করলাম—'তাকে আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া আমি এখনো তার সাথে বিছানায় যাইনি।' একথা শুনে তিনি চুপ করে রইলেন এবং চলে গেলেন। পরদিন আবার বাজারে তাঁর সাথে দেখা। তিনি বললেন—'হে সালমা ! তোমার পিতা তো কত ভালো লোক ছিলেন। তুমি মেয়েটিকে আমাকে দান করে দাও।' আমি বললাম—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি তাকে দিয়ে দিলাম।' সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন—তিনি মেয়েটিকে নিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। এবং সেখানে একজন মুসলিম বন্দী ছিল। তাকে মেয়েটির বিনিময়ে মুক্ত করে আনলেন।[৪]

আমি [লেখক] হযরত সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা—'আমি এখনো তার সাথে বিছানায় যাইনি' হতে এই বুঝেছি, মেয়েটি প্রাপ্ত বয়স্কা ছিলো। এ জন্যই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মা থেকে তাকে পৃথক করেছিলেন।

৫. গোলাম বাঁদীর শাস্তি স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক।-['হদ' শিরোনাম দেখুন]

০ চুরির অপরাধে গোলাম বাঁদীর হাত কাটা।-['সারিকাহ্' শিরোনাম দেখুন]

০ ফাই [জিযিয়া, খারাজ, ওশর প্রভৃতি] এ গোলামের অধিকার।-['ফাই' শিরোনাম দেখুন]

০ গোলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ।-['জিনাইইয়া' দ্রষ্টব্য]

০ গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

০ ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে গোলামের অন্তরায়।-['ইরছ' শিরোনাম দেখুন]

রিজলুন [رجل]—পায়ের পাতা থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ

পায়ের পাতা থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ ক্ষতি গ্রস্ত করার অপরাধ।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম]

রিদ্দাহ্ [ردة]—ফিরে যাওয়া, পরিত্যাগ করা.

১. সংজ্ঞা

কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এরূপ কথা বের হওয়া অথবা এরূপ আকীদা [বিশ্বাস] পোষণ করা যা ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাকে 'রিদ্দাহ্' বলে।

২. যেসব কথা বললে একজন মুসলমান মুরতাদ [ইসলাম ত্যাগী] হয়ে যায়

[২.১] যদি কোনো মুসলমান আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্‌র কোনো নবী রাসূলকে গালি দেয় বা তাদের কুৎসা রচনা করে, তাহলে সে ইসলাম ত্যাগী বলে গণ্য হবে। মুহাজির ইবনু আবী উমাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার গভর্নর ছিলেন। তাঁর কাছে দু'জন মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হলো। একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটাক্ষ করে কুৎসা মূলক কবিতা আবৃত্তি করছিলো। তিনি তার হাত কেটে দিলেন এবং সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। অপরজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো—সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক গান গেয়ে বেড়ায়। মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহু তারও হাত কেটে দিলেন এবং সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেললেন। সংবাদ পেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে লিখলেন —'আমি জানতে পারলাম রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা আবৃত্তির দণ্ড স্বরূপ মহিলাকে এরূপ শাস্তি দিয়েছো ----------। যদি তুমি এ ব্যাপারে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত না দিতে তাহলে আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। কারণ, নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার শাস্তি সাধারণ অপরাধের শাস্তির মতো হতে পারে না। যদি কোনো মুসলমান এ কাজ করে তবে সে মুরতাদ হয়ে যায় আর যদি কোনো যিম্মী এরূপ করে তবে সে গাদ্দার ও হরবী [যুদ্ধরত কাফির] হিসেবে গণ্য হয়। [কাজেই তাদেরকে হত্যা করা বৈধ।-অনুবাদক]। বাকী রইলো সেই মহিলা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক গান গেয়ে বেড়ায়। যদি সে মুসলমান হয় তবে তাকে বিকলাঙ্গ করার চেয়ে কম শাস্তি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা। আর যদি যিম্মী হয় তবে আমার জীবনের শপথ তাকে ক্ষমা করা শির্‌কের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। যদি আমি এ ব্যাপারে তোমাকে পাকড়াও করি তবে তুমি বিপদে পড়ে যাবে।'[৫]

[২.২] ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ও যদি কোনো মুসলমান অস্বীকার করে তবে সে মুরতাদ হয়ে যায়। যেমন—নামায অথবা যাকাতকে অস্বীকার করা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি

বলেছিলেন—'আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যারা নামায ও যাকাতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাবে।'

আবদুর রাজ্জাক রিওয়ায়েত করেছেন—'যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন—'হে আবু বকর ! আপনি কী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এই কালিমার সাক্ষ্য দেবে তাদের জান-মাল আমাদের থেকে হিফাযত করে নেবে। শুধু ন্যায়সংগত কোনো কারণে হত্যা করা যেতে পারে। অবশিষ্ট হিসাব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন—'আল্লাহ্‌র শপথ ! যারা নামায ও যাকাতে পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। নিসন্দেহে যাকাত হচ্ছে সম্পদে আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্‌র কসম ! যদি তারা যাকাত হিসাবে প্রদেয় ছাগলের একটি বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় দেয়া হতো, আমি সেই ছাগল ছানার জন্যও যুদ্ধ করবো।'[৬]

নামায পরিত্যাগ করার কারণে মুরতাদ হওয়া।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

৩. মুরতাদকে তাওবার জন্য আহ্বান জানানো

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আন্তরিক ইচ্ছে ছিলো মুরতাদকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে একা হোক কিংবা যুদ্ধের আগে পুরো গোত্র, তাদেরকে তাওবা করার জন্য আহ্বান জানানো। যদি তারা ইসলামে ফিরে আসে তাহলে তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যাবে। উয়াইনিয়াহ্ ইবনু হাসানের সাথে যেরূপ করা হয়েছিলো। হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উয়াইনিয়াহ্ ইবনু হাসান ফায্‌যারীকে তার দু' হাত ঘাড়ের সাথে বেধে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে মদীনায় আনা হলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছিলো আর বলছিলো—'ওরে আল্লাহ্‌র দুশমন ! তুই নাকি ইসলাম ত্যাগ করেছিস ?' সে উত্তর দিতো —'আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তো কখনো ঈমানই আনিনি।' যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাকে হাজির করা হলো, তিনি তাকে তাওবা করার আহ্বান জানান। সে তাওবা করে। তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকী জীবন সে ইসলামের ওপর ভালো অবস্থায় কাটিয়ে দেয়।[৭] আর যদি মুরতাদ ব্যক্তি তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে তবে একা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর শক্তিশালী গোত্র হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী সেনাবাহিনী প্রধান ও মুরতাদদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিলো—'হে মুরতাদ সম্প্রদায় ! আমি তোমাদের বিরুদ্ধে মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত সত্যনিষ্ঠ একদল সৈন্যবাহিনী পাঠালাম। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান গ্রহণ ছাড়া তোমাদের নিকট থেকে আর কিছু গ্রহণ করবে না। আর ততোক্ষণ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করা হবে না যতোক্ষণ তার কাছে দাওয়াত পৌছানো না হবে। যদি সে দাওয়াত কবুল করে মুখে সাক্ষ্য দেয় এবং আমলে সালেহ্ করে। তাহলে এটি গ্রহণ করা হবে এবং তাকে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। যদি কেউ দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে না আসে। আর যদি পরাস্ত হয় তবে তাকে কোনোরূপ অনুকম্পা দেখানো হবে না। এ ধরনের লোকদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে, চতুর্দিক থেকে হামলা করে হত্যা করা হবে

এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হবে। তাদের নিকট থেকেও ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না।'[৮]

৪. মুরতাদের শাস্তি

মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে—প্রথমে তাকে তাওবার জন্য আহ্বান জানানো হবে, যদি সে তাওবা করতে অস্বীকার করে তবে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এ শাস্তি পুরুষ এবং মহিলার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি মহিলা মুরতাদকেও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯] তিনি উম্মে কারফা নাম্নি এক মহিলা মুরতাদকে মৃতদণ্ড দিয়েছিলেন।[১০]

যদি মুরতাদ একটি শক্তিশালী দল বা গোত্র হয় তবে তাদেরকেও তাওবার জন্য আহ্বান জানানো হবে। যদি তারা তাওবা না করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। পুরুষদেরকে হত্যা করে মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে। মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মনীতিও এরূপ ছিলো।[১১] বনী হানফিয়াহ্‌র মহিলা ও শিশুদেরকেও অন্যান্য মুরতাদ মহিলা ও শিশুদের সাথে বন্দী করে রেখেছিলেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন মহিলাকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যিম্মায় বাঁদী হিসেবে দিয়েছিলেন। যার গর্ভে মুহাম্মদ ইবনু হানফিয়াহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১২]

মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তলোয়ার ব্যবহার করতে হবে, এটি জরুরী নয় বরং মৃত্যুদণ্ডকে এমনভাবে কার্যকরী করা উচিত যাতে সাধারণ লোক দেখে কেউ মুরতাদ হওয়ার সাহস না পায়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী সেনা অফিসার ও মুরতাদদের কাছে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, মুরতাদদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে এবং যে কোনোভাবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।[১৩] হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের সাথে এরূপ আচরণই করতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে কোনো আপত্তি করেননি। বরং যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ ব্যাপারে বললেন —'আপনি কি তাকে [অর্থাৎ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে] এমনিই ছেড়ে দেবেন, যে আল্লাহ্‌র শাস্তি দেবার মাধ্যমকে [অর্থাৎ আগুনকে] মানুষের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ব্যবহার করে?' তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায় আপত্তি করে জবাব দেন—'আমি ঐ তরবারীকে কোষবদ্ধ করবো না যা আল্লাহ্ মুশরিকদের ওপর তুলে রেখেছেন।'[১৪]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাতে দেখা গেছে তিনি মুরতাদ পুরুষদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। মুরতাদ একক কোনো ব্যক্তি হোক কিংবা দলবদ্ধ। অবশ্য সেই বর্ণনার সাথেও কোনো বৈপরিত্ব নেই যেখানে বুযাখা, আসাদ ও গাতফান গোত্রত্রয়ের সাথে সন্ধির কথা বলা হয়েছে। সন্ধির প্রস্তাবে তিনি তাদেরকে দেশান্তর কিংবা অপমানকর সন্ধির যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার জন্য বলেছিলেন। তারা বলেছিলো—আমরা দেশান্তর বা বহিষ্কার সম্পর্কেতো বুঝলাম, কিন্তু অপমানকর সন্ধি সম্পর্কে বুঝতে পারলাম না। তিনি জবাবে বলেছিলেন—তোমরা সমস্ত অস্ত্র ও পশু আমাদের কাছে হস্তান্তর করে তোমরা নিরস্ত্র হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিকে বাছাই করবে যারা উট চরানোর কাজ করবে। ইতোমধ্যে হয়তো আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের খলীফা এবং মু'মিনদেরকে এমন কিছু দেখিয়ে দেবেন যার ভিত্তিতে আমরা তোমাদের ওজর গ্রহণ করে নিতে পারি। তাছাড়া তোমরা আমাদের নিহতদের দিয়াত [রক্তপণ] পরিশোধ করবে কিন্তু আমরা তোমাদের নিহতদের কোনো দিয়াত আদায় করবো না। তোমরা একথাও স্বীকার করে

নেবে যে, আমাদের যারা নিহত তারা জান্নাতী আর তোমাদের যারা নিহত তারা জাহান্নামী। আমাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ তোমাদের ফেরত দিতে হবে, পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে থেকে জোরপূর্বক আদায়কৃত সম্পদও আমাদের কাছে গানিমাতের মাল হিসেবে গণ্য হবে।' এ কথাবার্তার সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন —'আপনি তো আপনার মতামত প্রকাশ করলেন এবার আমার একটি পরামর্শ শুনুন। আপনার সমস্ত কথার সাথে আমি একমত শুধু আমাদের নিহতদের ব্যাপারে দিয়াত আদায় করার কথা বলেছেন, আমি তার সাথে একমত নই। কারণ, আমাদের নিহতরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয় তাদের আবার দিয়াত কি ?' একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন।[১৫]

উপরোক্ত কথাবার্তা থেকে যা প্রমাণিত হলো তা হচ্ছে—তারা নিরস্ত্র হয়ে মুসলমানদের সামনে মাথা নিচু করে চলবে। তবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐ কথাটি ভেবে দেখার মত, তিনি বলেছিলেন—'যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তার রাসূলের খলীফা এবং মুসলমানদের নিকট এমন কিছু না দেখান যার ভিত্তিতে তোমাদের ওজর গ্রহণ করা যেতে পারে।'

রইলো একথা যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদ পুরুষদেরকে সদলবলে হত্যা করতে এবং মহিলাদেরকে বন্দী করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ কোনো মহিলা যদি এককভাবে মুরতাদ হয়ে যেত, তাকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতেন। তার কারণ—দলবদ্ধভাবে মুরতাদ হলে তাদেরকে দলবদ্ধভাবেই তাওবা করার আহ্বান জানানো হবে। আর এ ব্যাপারে তারা যে বক্তব্য প্রদান করবে তা দলীয় বক্তব্য হিসেবেই গৃহীত হবে। এবং তা শুধু পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারণ, যুদ্ধ করার সামর্থ শুধু পুরুষরাই রাখে, মহিলারা নয়। এ নীতির ভিত্তিতেই পুরুষদেরকে হত্যা করে মহিলাদেরকে বন্দী করে রেখে সুযোগ দেয়া হয়, যেন তারা মুসলমানদের আচার-আচরণের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

৫. মুরতাদের মীরাস

কোনো মুরতাদের মৃত্যু হলে কিংবা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে পরিত্যক্ত সম্পদ তার মুসলমান আত্মীয়-স্বজন নির্দিষ্ট হারে পেয়ে যাবে।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ইর্‌ছ' শিরোনাম]

রিবা' [ربا]—অতিরিক্ত

১. সংজ্ঞা

রিবা ঐ অতিরিক্ত বস্তু বা মুদ্রাকে বলে যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে (বা পরিমাণে) আদায় করা হয়। কিন্তু সেই অতিরিক্ত জিনিস প্রচলিত বিনিময়ের বিপরীত হবে না।

২. রিবা (অতিরিক্ত জিনিস) আবার দু' প্রকার।

[২.১] রিবান নাসীয়াহ্*, এটি হারাম। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

* ঋণের ওপর সুদ। আল কুরআন অবতীর্ণের সময় যে ধরনের সুদী লেনদেন প্রচলিত ছিলো এবং আরবগণ যাকে রিবা বলতো তা এরূপ। যেমন—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে থেকে একটি জিনিস ক্রয় করলো এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিলো। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলো কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হলো না। এমতাবস্থায় উক্ত মূল্যের সাথে অতিরিক্ত টাকা ধার্য করে সময় আরো বাড়িয়ে দেয়া হলো। অথবা এক ব্যক্তি অপর আরেক ব্যক্তিকে টাকা ধার দিলো। চুক্তি হলো এতদিন পর এত টাকা অতিরিক্তি সহ পরিশোধ করতে হবে। অথবা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে পরিশোধের চুক্তি হলো। দেখা গেল ঋণগ্রহীতা সময় মতো তা পরিশোধ করতে পারলো না। তখন পূর্বের চেয়ে বর্ধিত হারে সুদ ধার্য করে সময় বাড়িয়ে দেয়া হলো।-[তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, টীকা ৩১৫]। উপরোক্ত সবক'টি অবস্থাকেই 'রিবা বিন নাসীয়াহ' বলে।-অনুবাদক।

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ـ

"তবে তোমরা যদি তাওবা করো, তাহলে মূলধন তোমরা ফিরে পাবে। এতে তোমরা অত্যাচারী হবে না কিংবা তোমাদের ওপর যুলুম করাও হবে না।"–(সূরা বাকারা ঃ ২৭৯)

[২.২] রিবাল ফাদ্‌ল**, এ সম্পর্কে 'বায়' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

রুইয়া [رؤيا]—স্বপ্ন

১. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—'আমার কাছে ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে ভালো মনে হয় যিনি শুদ্ধভাবে ওযু করেন। স্বপ্ন আমার কাছে অমুক অমুক জিনিসের চেয়ে বেশী পছন্দনীয়।'[১৬]

২. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত ছিলো—'স্বপ্ন সত্য হয়'। তিনি স্বপ্নের উত্তম তা'বীর বর্ণনা করতে পারতেন। নিম্নে তার বর্ণিত কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

[২.১] একবার হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর মহান পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—'আমি স্বপ্নে দেখেছি চাঁদ আমার কোলে এসে পড়লো। আমার স্মরণ আছে, একই স্বপ্ন তিনবার দেখেছি।' তিনি জবাব দিলেন—'তোমার স্বপ্ন সত্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিন সন্তানের কবর তোমার ঘরে হবে।'[১৭] [অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু]

[২.২] আরেক দিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—'আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার চারপাশে গরু যবেহ্ হচ্ছে।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাখ্যা দিলেন—'যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয় তবে তোমার আশেপাশে বসবাসরত লোকদের একটি দলকে হত্যা করা হবে।'[১৮] [অর্থাৎ তা সত্য হয়েছিলো উষ্ট্রের যুদ্ধের মাধ্যমে। এক পক্ষে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অন্য পক্ষে জামাতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই যুদ্ধে।-অনুবাদক]

[২.৩] একবার শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'এইযে ব্যস্ত মানুষ ! কী হয়েছে ? আমার পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু ঘটেছে কি ? শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'না, আল্লাহ্‌র শপথ ! তেমন কিছু হয়নি, তবে এর মধ্যে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কী দেখেছো ? জবাব দিলেন—'আমি দেখেছি আপনার হাত গলার সাথে বাধা এবং আপনি আবুল হাসান আনসারীর ঘরের দরোজার সামনে দাঁড়ানো।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'তুমি খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছো। হাশর পর্যন্ত আমার সমস্ত গুনাহকে জমা করে দেয়া হয়েছে।'[১৯]

[২.৪] আবদুল্লাহ্ ইবনু বুদাইল স্বপ্ন দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বললেন। তিনি ব্যাখ্যা স্বরূপ জবাব দিলেন—'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয় তবে বিশৃঙ্খল এক পরিবেশে

** একই প্রকার জিনিস লেনদেনের সময় কমবেশী করাকে 'রিবাল ফাদ্‌ল' বলে। যেমন—এক মণ গমের পরিবর্তে দেড় মণ গম ক্রয় করা।-[অনুবাদক]

এবং বিনা অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হবে।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তা'বীর সঠিক হয়েছিলো। আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হন।

[২.৫] হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—'আমি স্বপ্নে দেখলাম সম্ভবত শারীক (এক ব্যক্তি)কে হত্যা করে তার লাশ পাশে রেখে দিয়েছি। আমার পেছনের কিছু লোক তা খাচ্ছে।' তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলতে গিয়ে বললেন—'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয় তবে তুমি সন্তানসহ এক মহিলাকে বিয়ে করবে যারা তোমার উপার্জন থেকে প্রতিপালিত হবে।' আরেক দিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন —'আমি স্বপ্নে দেখেছি গর্ত থেকে একটি আলো বেরিয়ে পুনরায় গর্তে ফিরে যেতে চাচ্ছে কিন্তু যেতে পারছে না।' তিনি জবাব দিলেন—'এর অর্থ হচ্ছে কোনো মহান কথা যা মানুষের মুখ থেকে বের হয় কিন্তু তা আর ফিরে যেতে পারে না।'-[অর্থাৎ তা দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে।-অনুবাদক]

আরেক দিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আমি স্বপ্নে দেখলাম, দাজ্জালের বের হওয়ার ঘোষণা হয়ে গেছে। শুনে আমি একটি দেয়াল খুলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলাম। ইত্যবসরে আমি পেছন ফিরে দেখলাম সে আমার কাছে দাঁড়ানো। তখন আমার সামনের মাটি ফাঁক হয়ে গেল এবং আর আমি সেখানে ঢুকে পড়লাম।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন —'যদি তুমি সত্যি স্বপ্ন দেখে থাকো তবে দীনের ব্যাপারে তুমি দুর্বলতা প্রদর্শন করবে।'[২০]

[২.৬] এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো—'আমি স্বপ্নে দেখলাম সম্ভবত একটি খেক শিয়ালের বাচ্চার পেছনে দৌড়াচ্ছি।' তিনি বললেন—'তুমি খারাপ এবং মিথ্যেবাদী। আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল আর মিথ্যে বলা পরিহার কর।'[২১]

[২.৭] এক ব্যক্তি এসে বললো—'আমি স্বপ্নে দেখলাম রক্তবর্ণ প্রস্রাব করছি।' তিনি বললেন—'আমার ধারণা তুমি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস কর।' সে একথার সত্যতা স্বীকার করলো। অতপর তিনি বললেন—'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কখনো আর এরূপ করো না।'[২২]

রুকইয়াহ্ [رقية]—তাবীয, ঝাড়ফুঁক

১. সংজ্ঞা

কোনো জীবিত মানুষকে এই বিশ্বাসে কোনো কিছু পড়ে ঝাড়ফুঁক করা যে, সে এতে ভালো হয়ে যাবে। আরবীতে একে 'রুকইয়াহ্' বলে।

২. কী দিয়ে ঝাড়ফুঁক ও তাবীয করা জায়েয

ঝাড়ফুঁক করতে যেসব কথা বলা হয়, তার জন্য শর্ত হচ্ছে—তা ইসলামী শরীয়াহ্‌র শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। এজন্য উত্তম ঝাঁড়ফুঁক হচ্ছে—আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো কথা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন। সেখানে একজন অসুস্থ মহিলা বসা ছিলো। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে ঝাড়ফুঁক করছিলেন। তিনি মেয়েকে বললেন—'আল্লাহ্‌র কালাম দিয়ে ঝাড়ফুঁক কর।'[২৩]

রুকূ' [ركوع]—রুকূ'

নামাযের সময় পেছনে একাকী রুকূ' করে তারপর হাটতে হাটতে কাতারে এসে শামিল হওয়া।-[দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. মুসান্নাফ–সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৯০ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫১ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৫৯ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৮০ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৬৪]
২. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২১৯।
৩. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৫০।
৪. ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়, ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬৭ ; নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৬২ ; বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যের হাদীস এটি।
৫. আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।
৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৮ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৩ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১-৪।
৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৮।
৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০১।
৯. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৪ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৩।
১০. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৪ ; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৫।
১১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৫ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৬ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০১ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৬৬।
১২. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৩, আরো দেখুন, 'জিহাদ' শিরোনাম এবং 'সাবিয়্যুন' শিরোনাম।
১৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৫।
১৪. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-২১২।
১৫. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৮ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১১৩।
১৬. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৫১৪ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬৯।
১৭. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬৯।
১৮. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬৯ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৬৬।
১৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৬৯।
২০. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৫১৬।
২১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৫১৬।
২২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৮ ; ২য় খণ্ড, পৃ-১৬৯ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৩০ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৫১৫।
২৩. মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৪৩ ; আল মাজমু' পৃ-৬৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৪৯।

ল

লাত্বমুন [لطم]—চপেটাঘাত, থাপ্পর

কাউকে থাপ্পর দেয়া এবং বাড়াবাড়ি করার শাস্তি।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

লা'ন [لعن]—অভিশাপ দেয়া

সর্বাবস্থায় মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ।-[দেখুন, 'হদ' শিরোনাম]

লিওয়াতাত [لواطة]—সমকামিতা, পুং মৈথুন

১.সংজ্ঞা

একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের মলদ্বার দিয়ে যৌনবাসনা চরিতার্থ করাকে 'লিওয়াতাত' বলে।

২. লিওয়াতাতের শাস্তি

আল্লাহ্ তাআলা দু'টো শর্তে যৌনবাসনা পরিতৃপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি শর্ত হচ্ছে —মহিলা হতে হবে এবং তাকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে নিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—এ কাজের জন্য শুধু বিশেষ অঙ্গ ব্যবহার করা যাবে, স্ত্রী হলেও অন্য কোনো অঙ্গ এ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে—

نِسَآءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ز

"তোমাদের স্ত্রীগণ হচ্ছে তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ, যেভাবে খুশী তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যাও"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩)।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীদের বিশেষ অঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অঙ্গ নির্দিষ্ট, তবে যেভাবে খুশী তা ব্যবহার করা যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি এ কাজ স্ত্রীর পেছন দিয়ে করতে চায় তবে তা হবে হারাম। কেননা পেছনের রাস্তা এ কাজের জন্য দেয়া হয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'যে ব্যক্তি এ কাজের জন্য স্ত্রীর পেছনের রাস্তা ব্যবহার করবে সে অভিশপ্ত।'[১] এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিমত হচ্ছে—"এ কাজ লূত জাতির মত ঘৃণিত মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।"[২] যখন কোনো পুরুষ অপর কোনো পুরুষের সাথে এ কাজে লিপ্ত হয় সে জঘন্যতম গুনাহ্‌র কাজেই লিপ্ত হয়। এ কারণেই স্ত্রীর সাথেও অস্বাভাবিক পথে এ কাজ করা যাবে না। কারণ তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্বভাবজাত প্রয়োজন পূরণের জন্য। তাহলে পুরুষের সাথে একাজ সম্ভব হতে পারে কী করে ! তাদেরতো আর এ কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি।

আরবগণ এ ধরনের কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তারা একে অত্যন্ত লজ্জাস্কর কাজ মনে করতেন। আরবের এক এলাকায় যখন এ কাজ সংঘটিত হবার সংবাদ পেলেন তখন হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি জানতে পারলেন সেখানে এক ব্যক্তি আছেন যাকে স্ত্রীর মত ব্যবহার করা হয়। সাথে সাথে তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সমাধান চেয়ে পত্র পাঠালেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পত্র

পাওয়া মাত্র আকাবির সাহাবাদেরকে একত্রিত করে এ সমস্যার সমাধান জানতে চাইলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—"এটি এমন একটি অপরাধ যা শুধু একটি সম্প্রদায় করেছিলো, যারা ছিল লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছেন তা বিশ্ববাসী অবহিত আছে। তাই আমার মত হচ্ছে—তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক।" সকল সাহাবাগণ এতে ঐকমত্য পোষণ করলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে উক্ত শাস্তি প্রদানের কথা লিখে জানালেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ পেয়ে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলেন।[৩]

লিবাস [لباس]—পোশাক পরিচ্ছদ

০ খলীফার জাঁকজমপূর্ণ পোশাক না পরা।-[দেখুন, 'ইমারাত' শিরোনাম]

০ হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাধার পোশাক।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

০ আংটি ব্যবহার।-['খাতাম' শিরোনাম দেখুন]

লিসান [لسان]—জিহ্বা

জিহ্বাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ ও তার দণ্ড।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

লিহ্‌য়াহ্ [لحية]—দাড়ি

০ তা'যীর (বা দণ্ড) হিসেবে দাড়ি মুড়িয়ে দেয়া।-['সারিকাহ্' শিরোনাম দেখুন]

০ গানিমাতের মাল চুরির অপরাধে দাড়ি কামিয়ে দেয়া।-['গুলূল' শিরোনাম দেখুন]

লুআব [لعاب]—লালা, থু থু

লালা বা থুথু শরীর থেকে উৎপন্ন হয়। যদি পশু পবিত্র হয় তবে তার মুখ নিঃসৃত লালাও পাক। লালার ব্যাপারে এটিই সর্বসম্মত অভিমত। এ কারণে মানুষের লালাও পাক। কারণ মানুষ পবিত্র। সে অমুসলিম বা কাফিরই হোক না কেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার হাসান ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাধে তুলে নিয়েছিলেন তখন তার কাধ বেয়ে লালা পড়ছিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও সাথে ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন—'বাহ্‌বা, বাহ্‌বা ! আমার পিতা তোমার জন্য কুরবান হোক, তোমার সাদৃশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, আলীর সাথে নয়।' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে হাসতে লাগলেন। যদি লালা নাপাক হতো তবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা কখনো কাধে বইতে দিতেন না।

তথ্যসূত্র

১. সুনানু আবী দাউদ ; মুসনাদে আহমদ।

২. মুসনাদে আহমদ ইবনু হাম্বল।

৩. কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৬৯ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৮৮।

শ

শাক্কুন [شك]—সন্দেহ

১. সংজ্ঞা

দু'টো কথার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে শাক্কুন বলে যার কারণে কোনোটিকে কোনোটির ওপর প্রাধান্য দেয়া যায় না।

২. সন্দেহ ইয়াকীনের [দৃঢ় আস্থার] ভিতকে নষ্ট করতে পারে না

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু اليقين لايزول بالشك [সন্দেহ ইয়াকীনকে নষ্ট করতে পারে না] একথার ওপর আস্থাশীল ছিলেন। এই সূত্রের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—নামাযে যার রাকায়াত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হবে, তার যে কয় রাকায়াতের ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা [ইয়াকীন] জন্মাবে, সেই কয় রাকায়াতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট নামায আদায় করে নেবে। যদি তার চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে নামায চার রাকায়াত পড়েছে, না তিন রাকায়াত এ অবস্থায় তাকে আরো এক রাকায়াত নামায পড়ে নিতে হবে। [কারণ, তিন রাকায়াতের ওপর তো তার ইয়াকীন ছিলোই—অনুবাদক] যদিও তার সন্দেহ দু' দিকেই সমান হয়ে থাকে। এমনকি চার রাকায়াতের দিকে মন বেশী ঝুঁকে থাকলেও। সন্দেহের অবস্থায় নামায আদায়কারী প্রবল ধারণার ওপরও আমল করবে না। চাই এ সন্দেহ তার প্রথমবারের জন্য হোক কিংবা বার বার।[১]

কোনো ব্যক্তির ধারণা হলো সে সুবহে সাদিকের পর সাহ্‌রী খেয়েছে কার্যত তা প্রমাণিত না হলে তার ওপর রোযার কাযা আদায় অপরিহার্য নয়। যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এখনো সুবহে সাদিক হয়নি, তাহলে তার ইয়াকীন অনুযায়ী সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া অব্যাহত রাখতে পারে।[২] দু' ব্যক্তি সুবহে সাদিকের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলো। একজন সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলো। এমতাবস্থায় দু'জনই সাহ্‌রী খেতে পারবে যতোক্ষণ সুবহে সাদিক শুরু হয়েছে বলে মনে না করবে।[৩]

শাজ্জাহ্ [شجة]—মাথায় আঘাত

মাথা অথবা মুখমণ্ডলের আঘাতকে 'শাজ্জাহ্' বলে।-[দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম]

শাতাম [شتم]—গালি দেয়া

'সাব্‌বুন' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

শাফাতুন [شفة]—ঠোঁট

দুটো ঠোঁট এমন অঙ্গ যা মুখকে ঘিরে রাখে। ঠোঁট ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

শা'রুন [شعر]—চুল

১. চুলে খিযাব [কলপ] ব্যবহার করা।-['খিযাব' শিরোনাম দেখুন]

২. পেষ্ট অথবা পাউডার দিয়ে লোম পরিষ্কার করা। শরীরে এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানকার লোম পরিষ্কার করে পরিচ্ছন্ন হওয়া সুন্নাত। যেমন–বগলের লোম, নাভীর নিচের লোম ইত্যাদি। পুরুষদের প্রকৃতি ও দৈহিক গঠন মহিলাদের চেয়ে কিছুটা কঠিন, তাই লোসন ব্যবহার তাদের জন্য বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া এটি সুন্নাতেরও খিলাফ। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরুষদের বগলের ও নাভীর নিচের লোম পেষ্ট অথবা পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করাকে অপছন্দ করতেন। ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবায় বর্ণনা করেছেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শরীরের লোম পরিষ্কার করার জন্য পেষ্ট অথবা চুনা ব্যবহার করেননি।[৪]

৩. হাজ্জ অথবা ওমরার জন্য ইহ্‌রাম পরিহিত ব্যক্তির লোম পরিষ্কার করা নিষিদ্ধ।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন] মাথার চুল পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হয়।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

০ গানিমাতের মাল থেকে চুরি করলে তার চুল দাঁড়ি চেছে দেয়া।-['গুলুল' এবং 'সারিকাহ্' শিরোনাম দেখুন]

শালাল [شلل]—প্যারালাইসিস

প্যারালাইসিস রোগীকে চুরির অপরাধে হাত কাটা।-['সারিকাহ্' দ্রঃ]

শাহাদাত [شهادة]—সাক্ষ্য

১. সংজ্ঞা

কাজীর দরবার বা বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের চোখে সংঘটিত হতে দেখা কোনো ঘটনার বর্ণনা করাকে সাক্ষ্য বলে।

২. সাক্ষ্য ক'জন দেবে ?

[২.১] সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় কমপক্ষে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার অকাট্য নির্দেশ এসেছে আল কুরআনে [বলা হয়েছে–তোমরা দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও, আর যদি দু'জন পুরুষ না পাও তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলাকে সাক্ষী হিসেবে নির্বাচন করো তোমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী। আল বাকারা ঃ ২৮২] এ জন্য যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার অধিকারের প্রশ্নে সাক্ষ্য প্রদান করলেন এবং সেই সাথে উম্মে আয়মন রাদিয়াল্লাহু আনহার সাক্ষ্য দিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—"হে আলী ! যদি আপনার সাথে আরেকজন পুরুষ কিংবা আরেকজন মহিলা সাক্ষ্য দিত, তাহলে আমি ফাতিমার পক্ষে রায় দিতে পারতাম।"[৫]

[২.২] ব্যভিচারের মামলায় চারজন পুরুষ সাক্ষী হতে হবে। কোন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে সূরা আন নিসায় আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন—"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে, তাদের ব্যাপারে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৬)

[২.৩] **মহিলাদের সাক্ষ্য ঃ** হদ প্রদানের ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তাদের সংখ্যা যতোই হোক না কেন। ইমাম যহুরী বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দু'জন খলীফা [হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু] এ সুন্নাতই বহাল রেখেছিলেন যে, হদূদ এর ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৬]

[২.৪] সন্তান জন্মের পর কোনো শব্দ করেছে কিনা শুধু এ ব্যাপারে ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৭] এর ওপর 'কিয়াস' করে মেয়েলী ব্যাপারে যেসব ব্যাপারে মহিলারা ছাড়া আর কেউ জানে না, মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'রিযাআত' [দুধ পান করানোর] এর সাক্ষ্যের ব্যাপারটিকে ব্যতিক্রম মনে করেছেন কিনা, যেভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু করতেন। এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

[২.৫] একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে রায় দেয়া।-[দেখুন, 'কাযা' শিরোনাম]

৩. স্বামীর সাক্ষ্য

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীর অধিকারের প্রশ্নে স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। তিনি হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষে এ জন্য রায় দিতে পারেননি যে, সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ হয়নি। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—"যদি আপনার সাথে আরেকজন পুরুষ অথবা মহিলার সাক্ষ্য দিতে পারতেন তবে আমি ফাতিমার পক্ষে রায় দিতাম।"[৮]

শি'রুন [شعر]—কবিতা

১. কবিতা চর্চা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কবি ছিলেন না। এমনকি তিনি সারা জীবনে একটি কবিতাও আবৃত্তি করেননি। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—'আল্লাহ্‌র কসম ! হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলী যুগেও একটি কবিতা আবৃত্তি করেননি এবং ইসলামের যুগে তো নয়ই।'[৯] তাঁকে কবিতা থেকে যে জিনিস দূরে রেখেছিলো তা সম্ভবত কবিদের অপাঙতেয় বিষয়বস্তুর কবিতা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُنَ ـ اَلَمْ تَرَا اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ـ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ (الشعراء : ٢٢٤ـ ٢٢٦)

"বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে ? এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না।"

–(সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ২২৪-২২৬)

২. কবিতা পাঠ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো কবিতা আবৃত্তি করেননি, তবে কবিতা পাঠ করতেন। তিনি পাঠ করার জন্য এমন কবিতা সংকলন করে নিয়েছিলেন, যেগুলো আকর্ষণীয়

ছন্দ এবং সুন্দর অর্থ সম্বলিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দু'টো কবিতা পড়তেন।[১০]

দীন বেশে ঘুড়ে বেড়ান যে শাসক সদা,
তার চেয়ে বিনম্র ও ভদ্র কে আছে কোথা ?
দেখো তার অনাহারেও সৌন্দর্য অপার
তারাইতো কল্যাণ এই দীন দুনিয়ার ॥

শুক্‌রুন [شكر]—শোকর করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদা করা।-[দেখুন, 'সুজূদ' শিরোনাম]

শূরা [شورى]—পরামর্শ সভা, উপদেষ্টা পরিষদ

১. সংজ্ঞা

ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণের পরামর্শকে 'শূরা' বলে।

২. শূরা সদস্য কারা হবেন ?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে উলামা ও ফতোয়াদাতাদেরকে শূরা সদস্য মনে করা হতো। কাসেম থেকে বর্ণিত, যদি কখনো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কতিপয় বুদ্ধিজীবি এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাই ইবনু কা'ব এবং হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখকে ডেকে নিতেন। এসব মহাত্মাগণ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে ফতোয়া দিতেন। সাধারণ লোকও তাদের নিকট এসে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ ধারাকে বলবত রাখেন।[১১]

৩. শূরার কার্যাবলী

যেসব নির্দেশের বেলায় আল কুরআনের 'নস' (অকাট্য প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত সেসব ব্যাপারে শূরা সদস্যদের কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। অবশ্য যেসব ব্যাপারে অকাট্য দলিল-প্রমাণ নেই—সেইসব ব্যাপারে শূরার প্রয়োজন। নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

[৩.১] গভর্নর বা প্রশাসক নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো প্রদেশের গভর্নর বা শাসক নিয়োগ করতে চাইতেন তখন সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। যখন বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগ করার প্রয়োজন হলো তখন তিনি পরামর্শ নিলেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন—আপনি তাকেই নিয়োগ করুন যাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সেখানকার লোকদেরকে ইসলাম ও রাসূলের আনুগত্যের দিকে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানকার লোকজন তাকে চেনে এবং তিনিও সেখানকার মাটি ও মানুষের সাথে পরিচিত। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলা ইবনু হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মতের বিপরীত মত প্রকাশ করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, আবান ইবনু সাঈদ ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার জন্য। কেননা সেখানকার জনসাধারণের সাথে আবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চুক্তি ছিলো। কিন্তু তিনি দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছিলেন। এজন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাধ্য করার ব্যাপারে অস্বীকার করে বললেন—"আমি তাকে বাধ্য করতে পারি না, বলে দিয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো জন্য কাজ করবে না।" অতপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলাকে বাহরাইনের গভর্নর করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।[১২]

[৩.২] বিচারের রায়ের ব্যাপারে পরামর্শ ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি ছিল, যখন তার কাছে কোনো মামলা দায়ের করা হতো তখন তিনি তার ফায়সালা আল্লাহ্‌র কিতাবে খুঁজতেন। যদি সেখানে ফায়সালা পেয়ে যেতেন তবে সেই অনুযায়ী রায় দিতেন। আল্লাহ্‌র কিতাবে না পেলে সুন্নাতে রাসূলে অনুসন্ধান করতেন। যদি ফায়সালা পেয়ে যেতেন তবে সেই অনুযায়ী মামলার রায় দিয়ে দিতেন। সুন্নাতে রাসূলে সে বিধান না পেলে তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতেন—"আমার কাছে মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু কুরআন সুন্নাহ্‌য় আমি তার কোনো ফায়সালা পাইনি। সুন্নাহ্‌য় এ ধরনের কোনো ফায়সালার কথা তোমাদের জানা আছে কি ?" কখনো দেখা যেত একদল এসে বলতেন—আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে ফায়সালা করতে দেখেছি। তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে রায় দিতেন এবং বলতেন—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি আমাদের মধ্যে এমন লোকও সৃষ্টি করেছেন যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ রাখে।" যদি এভাবেও কোনো পথনির্দেশ না পেতেন তখন আলিম ও চিন্তাবিদদেরকে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন দেখতেন কোনো কথার ওপরে সবাই একমত হয়েছেন তখন তিনি সেই আলোকে রায় দিতেন।[১৩]

–(আরো দেখুন, 'কাযা' এবং 'লিওয়াতা' শিরোনাম)

[৩.৩] সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখেছিলেন—"আমি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য তোমার নিকট যাবার নির্দেশ দিয়েছি। যখন সে তোমার কাছে পৌঁছুবে তখন খুব ভালোভাবে তার সাথে সময় কাটাবে, ঔদ্ধত্বপূর্ণ কোনো আচরণ তার সাথে করবে না। যদিও আমি তোমাকে তার ওপর ও অন্যান্যদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। তবু কোনো কাজ তার সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে করবে না। তাদের সাথে পরামর্শ করবে এবং সেই পরামর্শ মুতাবিক কাজ করবে।"[১৪]

৪. পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—যদি শূরা সদস্যগণ কোনো বিষয়ে ঐকমত্য হতে না পারে তবে তাদের পরামর্শ মুতাবিক কাজ করা জরুরী নয়। ইমাম বা খলীফার এ অধিকার আছে, তাদের মধ্যে যে পক্ষের মতামত তাঁর কাছে পছন্দনীয় হয় সেই অনুযায়ী তিনি কাজ করতে পারেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়ার পর দেখা গেল সবাই একমত হতে পারলেন না, তখন তিনি উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।-[দেখুন, 'শূরা' শিরোনাম ৩নং প্যারা]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন—কোনো বিষয়ে যদি শূরা সদস্যগণ একমত হয়ে যান তবে সেই অনুযায়ী কাজ করা ইমাম বা খলীফার জন্য অপরিহার্য। কেননা এ অবস্থায় খলীফার মতবিরোধ করা জায়েয হবে না। মামলার রায় সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সকল পরামর্শদাতাকে ঐকমত্যে পেতেন তখন তিনি সেই অনুযায়ী মামলার রায় প্রদান করতেন। এমনকি তিনি এ নির্দেশ হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও দিয়েছিলেন। যখন তাঁর নিকট হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন।-[দেখুন, শূরা শিরোনাম']

তথ্যসূত্র

১. আল মাজমূ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃ–৪৩।
২. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ–১৩৬।
৩. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৭২।
৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৯।
৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪১৫-৪১৭।
৬. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩২।
৭. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৯৯।
৮. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪১৭।
৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৬৬।
১০. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৬৩।
১১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬২৭ ; আল মাহযাব, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৭।
১২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬২ ; আরো দেখুন, 'ইমারাত'।
১৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০০ ; আরো জানার জন্য 'কাযা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।
১৪. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬২১।

স

সগীরুন [صغير]—অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে

১. সংজ্ঞা

সগীর ঐসব নর-নারীকে বলে যারা এখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের মৃত্যু হলে তাদের জন্য জানাযা নামায।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

- ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ করা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]
- অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করা।-['নাফকাহ্' শিরোনাম দেখুন]
- শিশুদের প্রতিপালন।-['হিদানাহ্' শিরোনাম দেখুন]
- ছোট বাচ্চাদের অনুভূতিতে আঘাত না দেয়া।-['কালবুন' শিরোনাম দেখুন]

সরফ [صرف]—আবর্তন, ব্যয় করা

মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়।-['বায়' শিরোনাম দেখুন]

সাইদুন [صيد]—শিকার

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'মাছ চাই জীবিত হোক কিংবা মৃত তা হালাল।' তিনি আরো বলেছেন—'পানিতে ভাসমান মৃত মাছও হালাল, যার ইচ্ছে সে তা খেতে পারে।'[১] ইহ্‌রাম পরিহিত ব্যক্তির শিকার নিষিদ্ধ।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

সাওম [سوم]-চরে বেড়ানো

পশুর যাকাতের বেলায় তা মাঠে চরে বেড়ানো শর্ত।-['যাকাত' শিরোনাম দেখুন]

সাতর [ستر]—সতর, গোপন করা

এমন অপরাধের গোপনীয়তা রক্ষা করা, যার কারণে হদ প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

-['হদ' শিরোনাম দেখুন]

সাফার [سفر]—সফর, ভ্রমণ

১. সংজ্ঞা

স্থায়ীভাবে বসবাসের জায়গা থেকে কোনো ব্যক্তির এতটুকু দূরে যাবার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হওয়া যার কারণে ফরয নামায তার জন্য কসর [সংক্ষিপ্ত] হিসেবে আদায় করা বৈধ হয়। একে ইসলামী আইনের পরিভাষায় সফর বলা হয়।

২. নামায কসর আদায় করার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—কোনো ব্যক্তি যদি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যুলহুলাইফা যতোটুকু দূরত্ব কমপক্ষে ঠিক ততোটুকু দূরত্বের পথ সফর করে। তিনি

একবার বক্তৃতায় বলেছেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা হচ্ছে, মুসাফিরের [ভ্রমণকারীর] জন্য নামায দু' রাকায়াত এবং মুকীমের [স্থায়ী অধিবাসীর] জন্য চার রাকায়াত। আমার জন্মস্থান মক্কা এবং হিজরতের স্থান মদীনা। যখনই আমি যুলহুলাইফা থেকে রওয়ানা হবো তখনই নামায দু' রাকায়াত করে পড়বো।[২]

৩. সফরকালিন সময়ে অবকাশ

সফরে কষ্ট ও শ্রমের কারণে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই তাদের জন্য অবকাশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিম্নে অবকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

[৩.১] চার রাকায়াত বিশিষ্ট [ফরয] নামায দু' রাকায়াত পড়া ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরে থাকাকালিন সময়ে নামায দু' রাকায়াতের বেশী পড়তেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আমি মিনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায দু' রাকায়াত পড়েছি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও অনুরূপ পড়েছি।'[৩] মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরে থাকাকালীন অবস্থায় নামায দু' রাকায়াত পড়েছেন।[৪] হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হাজ্জ করেছি। তিনি স্থানীয় অধিবাসীকে বলে দিয়েছিলেন, তোমরা নামায চার রাকায়াত পড়বে, আমরা তো মুসাফির। আমি তার সাথে তিনবার ওমরা করেছি। তিনি সবসময় নামায দু' রাকায়াতই পড়েছেন।'[৫]

[৩.২] সফরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সহ অন্যান্য সুন্নাত নামায না পড়লেও চলবে। শুধু দু' রাকায়াত ফরয নামায পড়তে হবে। ইবনু আবী শাইবা থেকে বর্ণিত—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরে ফরযের আগে কিংবা পরে কখনো সুন্নাত নামায পড়তেন না।[৬]

[৩.৩] নামাযের পর তাসবীহ্ তাহলীলও পড়া যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরে দিনের এক ওয়াক্ত নামায আদায় করলেন। তাঁর সাথে সফরে আরো লোক ছিলেন। তাদের কয়েকজনকে তাসবীহ্ পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমারা কি করছো?' বলা হলো—'তাসবীহ্ পড়ছি।' তিনি বললেন—'যদি তাসবীহ্ পড়া যেত তাহলে তো নামাযও পুরো আদায় করা যেত। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জ করেছি। দিনে তার সাথে নামায আদায় করেছি কিন্তু তাকে কখনো তাসবীহ্ পড়তে দেখিনি। তেমনিভাবে আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও হাজ্জ করেছি। দিনে নামাযের পর তাদেরকেও তাসবীহ্ পড়তে দেখিনি।' অতপর তিনি বললেন—'রাসূলের জীবন হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।'[৭]

৪. স্থানীয় লোক (মুকীম) থাকা সত্বেও মুসাফিরের ইমামতি করা

বিস্তারিত জানার জন্য 'সালাত' শিরোনাম দেখুন।

সাবিয়্যুন [سبى]—কয়েদী বানানো

১. যুদ্ধরত কাফির বা অমুসলিমদের মহিলা ও শিশুকে বন্দী করে নেয়াকে 'সাবিয়্যুন' বলে।

২. যুদ্ধরত অমুসলিমদেরকে পরাস্ত করার পর প্রধান সেনাপতি ইচ্ছে করলে যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকেও কয়েদী বানাতে পারেন। তারা আরব হোক কিংবা অনারব। কাফির হোক কিংবা মুরতাদ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনী নাজিয়াহ্‌র লোকদেরকে বন্দী করেছিলেন। অথচ তারা আরব ছিলো। তেমনিভাবে বনু হানাইফার মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে দাস-দাসী বানিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে এক বাঁদী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি দিয়েছিলেন। যার গর্ভে মুহাম্মদ ইবনু হানফিয়ার জন্ম হয়েছিলো।[৮] তিনি মুরতাদদের মহিলাদেরকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।-['রিদ্দাহ্' শিরোনাম দেখুন]

সবিয়্যুন [صبي]—শিশু

বিস্তারিত জানার জন্য 'সাগীরুন' শিরোনাম দেখুন।

সাব্বুন [سب]—গালি দেয়া

১. সংজ্ঞা

গালি-গালাজকে সাব্বুন বলে।

২. গালি দেয়ার বিধান

যাকে গালি দেয়া হয় তার মর্যাদানুযায়ী গালির বিধান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যদি কোনো মুসলমান আল্লাহ্ তাআলা কিংবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় [নাউযুবিল্লাহ্] তাহলে এটি ইসলাম বিরোধী কাজ। গালি দাতা মুরতাদ হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।-['রিদ্দাহ্' শিরোনাম দেখুন] আর যদি কোনো যিম্মী এরূপ করে তবে তার ওপর থেকে মুসলমানের যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায়। সে যুদ্ধরত অমুসলিমের মতো হয়ে যায়, তাকে হত্যা করলে শরঈ দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ হবে না।-['যিম্মাহ্' শিরোনাম দেখুন]

সাহাবায়ে কিরাম রিদওয়ানুল্লাহু আলাইহিম আজমাঈন এবং তাদের পরবর্তী লোকদেরকে গালিগালাজ করা ফাসেকী। এ জন্য তা'যীর প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে যায়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ পেলেন ইয়ামামার গভর্নর মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এমন দু'জন মহিলাকে হাজির করা হয়েছিল যাদের একজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অশ্লীল কথা সম্বলিত গান গাচ্ছিলো। তিনি তার হাত কেটে দিয়েছেন এবং সামনের দাঁত উপড়ে ফেলেছেন। অপর মহিলা মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করছিলো। তিনি তারও হাত কেটে সামনের দাঁত উপড়ে দিয়েছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুৎসামূলক গান গাওয়া মহিলাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে যদি তুমি আমার চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা না রাখতে তাহলে আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। কারণ, নবী-রাসূলদের সাথে বাড়াবাড়ির শাস্তি সাধারণ অপরাধের শাস্তির মত হতে পারে না। যদি কোনো মুসলমান এরূপ করে, সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর যদি কোনো যিম্মী এরূপ কাজ করে তবে সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী ও ধোকাবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এবার দ্বিতীয় মহিলা, যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি

করেছে। যদি সে মুসলমান দাবী করে তবে তাকে নাক কান কেটে বিকলাঙ্গ করার চেয়ে কম শাস্তি দিয়ে তাকে সংশোধন করার নির্দেশ দিতাম। আর যদি সে যিম্মী হয়, তাহলে আমার জীবনের শপথ, তাকে মাফ করে দেয়া শিরকের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। আমার পক্ষ থেকে যদি তোমার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে তুমি ফেঁসে যাবে।[৯]

আবু বারযাহ্ থেকে বর্ণিত—'এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিলে আমি আরজ করলাম, হে রাসূলের খলীফা ! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো না ?' তিনি বললেন—'না, এ শাস্তি শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য। তিনি ছাড়া আর কারো জন্য এ শাস্তি প্রদান করা যাবে না।'[১০]

৩. কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে—একবার দু' ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে একে অপরকে গালিগালাজ করলো। তিনি তাদেরকে কিছু বললেন না। ঘটনা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কানে গিয়ে উঠলো। তিনি তাদেরকে শাসিয়ে দিলেন।[১১] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে কিছু বলেননি, কারণ তিনি মনে করতেন গালাগালির কোনো শাস্তি নেই। যে সম্পর্কে একটু সামনে বর্ণনা করা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে এ জন্য শাসিয়েছেন যে, তারা আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে বেআদবী করেছে।

ইহ্‌রাম বাধা ব্যক্তির গালিগালাজ থেকে বিরত থাকা।–(বিস্তারিত দেখুন 'হাজ্জ' শিরোনাম।

৪. গালিগালাজের শাস্তি

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে গালিগালাজের নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নেই। তাছাড়া এ ব্যাপারে 'হদ' এর কোনো বিধানও নেই। অবশ্য এটি একটি গুনাহ্‌র কাজ। এজন্য কিয়ামতের দিন তাকে গুনাহ্‌র বোঝা বইতে হবে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যে অন্যজনকে খবীশ, ফাসিক প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে গালি দিচ্ছিলো—'তুমি খুব খারাপ কথা বললে, যদিও এজন্য কোনো শাস্তি কিংবা কোনো হদ নির্দিষ্ট নেই।'[১২]

৫. গালির জন্য তা'যীর প্রয়োগ।-['তা'যীর শিরোনাম দেখুন]

সামার [سمر]—রাত জেগে কথাবার্তা বলা

ইশার নামাযের পর জেগে থাকা এবং গল্পগুজব করা মাকরূহ্। তবে জ্ঞান চর্চা কিংবা সামাজিক কোনো প্রয়োজনে জেগে থাকলে তাতে দোষের কিছু নেই। মুসলমানদের সামাজিক ব্যাপার নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে রাত জেগে কথাবার্তা বলতেন। এমনকি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেখানে উপস্থিত থাকতেন।[১৩]

সায়িমাহ্ [سائمة]—চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো গবাদী পশু

সেসব পশুকে 'সায়িমাহ্' বলা হয় যা বছরের অধিকাংশ সময় চারণ ভূমিতে চরে থাকে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে যেসব চারণ ভূমিতে চরে বেড়ায় শুধু সেইসব পশুর ওপর যাকাত ফরয হয়।-('যাকাত' শিরোনাম দেখুন)

সারিকাহ্ [سرقة]—চুরি করা

১. সংজ্ঞা

মুকাল্লাফ ব্যক্তি কর্তৃক সংরক্ষিত জায়গা থেকে গোপনে এমন কোনো জিনিস নেয়া, যার ওপর তার কোনো অধিকার নেই। একে 'সারিকাহ্' বলে। তবে শর্ত হচ্ছে—সেই বস্তুটি যেন এতটুকু মূল্যবান হয় যা চুরির শাস্তি প্রদানের জন্য ন্যূনতম মূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট।

২. চোরের গোপনীয়তা রক্ষা করা

চুরি ঐ ধরনের অপরাধ যার কারণে হদ প্রয়োগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এ রকম অপরাধের গোপনীয়তা রক্ষা করা উত্তম।-['হদ' শিরোনাম দেখুন]

৩. চুরির অপরাধে হদ প্রয়োগের শর্তাবলী

[৩.১] **চোরের জন্য শর্ত ঃ** যতোক্ষণ চোর বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বাধীন (অর্থাৎ মুকাল্লাফ) না হবে ততোক্ষণ তার ওপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না। এর মধ্যে পুরুষ, মহিলা, মুসলমান, কাফির, মুক্ত এবং গোলাম সবাই অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুরি করার অপরাধে এক ক্রীতদাসের হাত কেটে দিয়েছিলেন।[১৪]

[৩.২] **চুরি হয়ে যাওয়া সম্পদের বেলায় শর্ত ঃ** চুরির অপরাধে হদ প্রয়োগের জন্য চোরাই মালে নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকতে হবে।

[৩.২ক] চুরির অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের জন্য চোরাই মালের মূল্য ন্যূনতম সেই পরিমাণ হতে হবে যে পরিমাণ সম্পদ চুরির অপরাধে হদ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ বা স্বল্প মূল্যের কোনো বস্তু চুরির অপরাধে হদ প্রয়োগ করা যাবে না। একটি ঢালের যে মূল্য তার সম পরিমাণ মূল্যমানের কোনো বস্তু চুরি করলে হদ প্রয়োগ করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ঢাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। চোরাই ঢালের মূল্য ছিলো পাঁচ দিরহাম।[১৫] তার চেয়ে স্বল্প মূল্যের ঢাল চুরির অপরাধেও চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন ঢাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে দিয়েছেন যার মূল্য তিন দিরহামও ছিলো না। তা আমি তিন দিরহামে কেনা পছন্দ করতাম না।[১৬]

[৩.২খ] সেই জিনিস সংরক্ষিত জায়গা থেকে গোপনে চুরি যেতে হবে। কেননা খিয়ানতের অপরাধে হাত কাটা যাবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য হচ্ছে—'খিয়ানতের অপরাধে কোন অপরাধীর হাত কাটা যাবে না।'[১৭]

[৩.২গ] চোরাই মালের মধ্যে চোরের সামান্য মালিকানাও যেন না থাকে। এ জন্য গানিমাতের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা যায় না। বরং অন্য শাস্তি দেয়া যায়। আবু ইউসুফ (রহ) বলেছেন—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গানিমাতের মাল থেকে চুরি করলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন।'[১৮]

আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—'কারো কাছে গানিমাতের চোরাই মাল পাওয়া গেলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাঁকে একশ' ঘা বেত লাগাতেন। তারপর চুল দাড়ি মুড়িয়ে দিতেন এবং বাহন ছাড়া তার সবকিছুকে জ্বালিয়ে দিতেন। আর কখনো সে মুসলমানদের সাথে অংশীদার হতো না।[১৯]

এ শাস্তি যাকাতের মাল কিংবা জনসাধারণের সম্পদ চুরির জন্যও। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একজন হাবশী আসতো। তিনি তাকে কাছে বসাতেন এবং কুরআন মজীদ পড়াতেন। একবার তিনি কিছু লোককে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। হাবশী বললো, আমাকেও তাদের সাথে নিয়োগ দিন। তিনি বললেন—'না, তুমি আমার সাথে থাকবে।' সে ব্যক্তি নাছোড় বান্দা যাবেই। অবশেষে তিনি তাকে তাদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন এবং অন্যদেরকে তার সাথে কোমল আচরণ করার জন্য বলে দিলেন। কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর সে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে এলো। দেখা গেল তার একটি হাত কাটা। তিনি ঝুকে পড়ে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—এটি কিভাবে হলো ? হাবশী বললো—তারা আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলো। আমি যাকাতের সম্পদ থেকে নিসাব পরিমাণ চুরি করি। ফলে তারা আমার হাত কেটে দেয়।' তিনি বললেন—'হে লোক সকল ! একে যে কারণে হাত কেটে দেয়া হয়েছে তোমরা দেখ তা পরিমাণে বিশ নিসাবের চেয়ে বেশী কিনা। আল্লাহ্‌র কসম এ যদি ঠিক বলে থাকে তবে যে এর হাত কেটেছে আমি অবশ্যই তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।' অতপর তিনি সেই হাবশীকে তার নিকটেই রেখে দিলেন। তার মর্যাদা ও স্থান একটুও ক্ষুণ্ন করলেন না। সে রাতের বেলা ওঠে কুরআন তিলাওয়াত করতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই তার তিলাওয়াত শুনতেন। বলতেন—'যে ব্যক্তি এ ভালো মানুষটির হাত কেটে দিয়েছে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্ বুঝবেন।' কিছুদিন পর তাঁর ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র খোয়া গেল। তিনি বললেন—'রাতে এ মহল্লায় কেউ এসেছিলো।' একথা শুনে হাবশী কাটা হাত এবং ভালো হাত উভয় হাত তুলে বললো—'আল্লাহ্ ! যে এ সৎলোকের সম্পদ চুরি করেছে তুমি তাকে প্রকাশ করে দাও।' দুপুরের আগেই চুরি যাওয়া সেই মাল হাবশীর কাছে পাওয়া গেল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'তোমার সর্বনাশ হোক, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই।' অতপর তাঁর নির্দেশে হাবশীর পা কেটে দেয়া হলো।[২০] [মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তির আগেই একটি হাত ও একটি পা কাটা ছিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অন্য হাতটি কেটে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।]

৪. চুরি প্রমাণ করা

সাক্ষ্যের দ্বারা চুরি প্রমাণিত হয়। এটি ঐকমত্যের মাসয়ালা, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। উপরন্তু চোর যদি নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে তবু চুরি প্রমাণিত হবে। বিচারক কিংবা আদালতের জন্য এটি জায়েয নয় যে, চোরকে স্বীকারোক্তিমূলক জবান বন্দী দেয়ার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। বরং এতটুকু পারে, তাকে স্বীকারোক্তিমূলক জবার বন্দী না দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা। এটি এমন এক পদক্ষেপ যা বিচারক বা আদালত শাস্তি প্রদানের পূর্বে সমস্ত অপরাধীর বেলায়ই নিতে পারে। ['হদ' শিরোনাম দেখুন]

৫. চুরির শাস্তি

[৫.১] চুরি করার পর হদ প্রয়োগের জন্য যখন সমস্ত শর্তাবলী পূরণ হয়ে যাবে তখন চোরের ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দিতে হবে।[২১] যদি সে দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার

বাম পা গোড়ালীর ওপরের গিট থেকে কেটে ফেলা হবে।[২২] আর যদি সে তৃতীয়বারও চুরি করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তাকে আজীবন বন্দী করে রাখতে হবে।[২৩] কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ মতটি প্রসিদ্ধ নয়। প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে—তৃতীয়বার চুরি করলে তার ডান পায়ের গিট থেকে কেটে দিয়ে হাত অবশিষ্ট রেখে দিতে হবে, যেন সে হাত দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথার বিরোধিতা করে হাত কেটে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি এরূপ ঃ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এমন এক চোর ধরা পড়লো, ইতোপূর্বে চুরির অপরাধে যার এক হাত এবং এক পা কেটে দেয়া হয়েছিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাত না কেটে পা কেটে দেয়ার অভিমত ব্যক্ত করলেন। বললেন—হাত দিয়ে পবিত্রতা অর্জন সহ প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে পারবে। একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'না, সেই সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ। আপনি তার অন্য হাতটি কেটে দিন।' তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে চোরের অন্য হাতটি কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[২৪] অতপর তৃতীয়বারের শাস্তিতে তার অবশিষ্ট হাত কেটে দেয়া হলো।[২৫] যদি সে চতুর্থবারও চুরি করে তবে তার অবশিষ্ট পা কেটে দেয়া হবে।[২৬] যদি তার পরও সে চুরি করে তবে তাকে হত্যার নির্দেশ দিতে হবে। মুহাম্মদ ইবনু হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক চোরকে ধরে আনা হলো। তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। বলা হলো—সেতো শুধু চুরি করেছে। তখন তার হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই চোরকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছেও পুনরায় চুরির অপরাধে হাজির করা হলো। তখন রীতিমত তার দু' হাত এবং দু' পা চুরির অপরাধে কর্তিত। তিনি বললেন—তোমার জন্য আমার কাছে সেই শাস্তি ছাড়া আর কোনো শাস্তি নেই যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড। কারণ, তোমার সম্পর্কে তিনিই ভালো জানতেন।' অতপর তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।[২৭]

[৫.২] **ঐ ব্যক্তির শাস্তি যার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত ঃ** যার ডান হাত প্যারালাইসিসে আক্রান্ত এমন চোরকে শাস্তি প্রদান সম্পর্কে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—যখন এমন ব্যক্তি চুরি করবে যার ডান হাত পক্ষাঘাত (প্যারালাসিস) রোগে আক্রান্ত, শাস্তি স্বরূপ তার অচল হাতটিই কেটে দিতে হবে। যদি তার বাম হাত প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয় তবে তার ডান হাত এই যুক্তিতে কাটা যাবে না যে, তাহলে তার অবশিষ্ট হাতটি অকেজো হয়ে থাকবে। তদ্রূপ যদি তার ডান পা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয় তবে তার ডান হাত কাটা যাবে না। কারণ, তাহলে শরীরের অর্ধাংশ অকেজো হয়ে যাবে। অবশ্য যদি তার ডান পা ভালো থাকে এবং বাম পা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয় তবে তার ডান হাত কেটে দেয়া যাবে। কারণ, অকেজো পা তার শরীরের অন্য অর্ধাংশে অবস্থিত। যদি সে পুনরায় চুরি করে তবে তার বাম পা কেটে দেয়া যাবে। তারপরও যদি সে চুরি করে তবে শরীরের কোনো অংগ কেটে আর তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না বরং তাকে বন্দী করে এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে সে চুরির রাস্তা থেকে ফিরে আসে।[২৮]

৬. চোরাই মাল উদ্ধার

যদি চোরের কাছে মালিক তার চোরাই মালের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে কোনো বিনিময় ছাড়াই মালিক তা গ্রহণ করবে। আর যদি সেই মাল চোরের কাছে না পেয়ে অন্য কারো কাছে পায় এবং তাকেও চুরির অপরাধে জড়ানো হয়, তবে সেই মালও কোনো বিনিময় ব্যতিরেকে মালিক নিয়ে আসতে পারবে। আর যদি তার ওপর চুরির অপবাদ আরোপ না করা হয়, তাহলে মালিক তার থেকে সেই মূল্যে ক্রয় করে নিতে পারে যে মূল্যে সে চোরের কাছ থেকে কিনেছে। অথবা সে চোরের সন্ধান করে তার মাধ্যমে সেই মাল উদ্ধার করবে। আবদুর রাজ্জাক উসাইদ ইবনু হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ামামার প্রশাসক থাকাকালীন মারওয়ানের একটি পত্র পান, মারওয়ানকে আবার হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেছিলেন। মারওয়ান লিখেছিলেন—আমাকে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মর্মে পত্র দিয়েছেন যে, যার কোনো মাল চুরি যাবে, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, ঐ ব্যক্তি সেই মালের অধিক হকদার। উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি মারওয়ানকে লিখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ তো এরূপ, যে ব্যক্তি চোরের কাছ থেকে চোরাই মাল খরিদ করবে, যদি তার ওপর চুরির অভিযোগ না থাকে, তাহলে প্রকৃত মালিকের উচিত সে যে মূল্যে কিনেছে সেই পরিমাণ মূল্য তাকে দিয়ে মাল নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়া অথবা চোরের পেছনে লেগে যাওয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই ফায়সালা দিয়েছেন। আমার জবাব মারওয়ান মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠালেন। অতপর তিনি মারওয়ানকে আবার লিখলেন—'না, তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করতে পারো আর না উসাইদ। আমার হুকুমাতে, তোমাদের উভয়ের মতের বিপরীত ফায়সালা দেয়ার অধিকার আমার আছে। তাই আমি যে নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা সেই মুতাবিক কাজ করবে।' মারওয়ান আমাকে এ উত্তর পাঠালেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যতোক্ষণ ইয়ামামার প্রশাসন আমার হাতে থাকবে ততোক্ষণ আমি এ নির্দেশ মানবো না।[২৯]

সালবুন [سلب]—ছিনিয়ে নেয়া,

নিহত কাফিরের সমস্ত সম্পদ গ্রহণের অধিকারী তিনি, যিনি সেই কাফিরকে হত্যা করবেন।-[দেখুন, গানীমাত শিরোনাম]

সালাত [صلاة]—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আগুন যেমন পানিকে নিভিয়ে দেয়, তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ গুনাহ্‌সমূহকে দেয়। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও উত্তম। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভালোবাসা রাখা জীবনদান করার চেয়েও শ্রেয় [অথবা তিনি বলেছেন] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌র পথে তরবারী চালানোর চেয়েও উত্তম।'

সালাত [صلاة]—সালাত, নামায

আমরা নামায সম্পর্কিত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতামতগুলো নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহে আলোচনা করবো। শিরোনামগুলো হচ্ছে—

(১) নামাযের গুরুত্ব
(২) নামাযের নির্দেশ
(৩) নামাযের ওয়াক্ত
(৪) খালি মাটিতে নামায
(৫) এক কাপড়ে নামায
(৬) ওযু নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় ওযু করে অবশিষ্ট নামায আদায় করা
(৭) নামাযের নিয়ম
(৮) অসুস্থ ব্যক্তির নামায
(৯) জামায়াতে নামায
(১০) জুমআর নামায
(১১) ঈদের নামায
(১২) ইস্তিস্কার নামায
(১৩) নফল নামায [মাগরিবের পূর্বের এবং চাশ্‌তের]
(১৪) সফরে নামায
(১৫) জানাযার নামায

১. নামাযের গুরুত্ব

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—নামায অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এ জন্য নামায আত্মশুদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। মানুষ যখন নামায পড়া ছেড়ে দেয় তখন তার মনে কলুষতা সৃষ্টি হয়, ফলে তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। শুরু করে একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি। এ জন্য তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন—'নামায হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা।'[৩০] তিনি এ লক্ষ্যে লোকদেরকে তালীম দিতেন—'আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করি, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করি না। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ফরয হওয়া নামায আমরা আদায় করি। কেননা নামায আদায়ে অলসতা প্রদর্শন ধ্বংসের কারণ।'[৩১]

২. নামাযের নির্দেশ

আল কুরআনের নস [نص] এবং সুন্নাতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত—নামায ফরয। কিন্তু নামায পরিত্যাগকারী কি কাফির নাকি ইসলাম থেকে বহির্ভূত না ফাসিক? এ প্রসঙ্গে শি'রানী কাশফুল গুম্মাহ আনিল আয়িম্মা'য় লিখেছেন—'খুলাফা-ই-রাশিদীনের কেউ নামায ছাড়া অন্য কিছু পরিত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।'[৩২] কিন্তু এ কুফরী কি ইসলাম থেকে মুরতাদ হওয়ার নামান্তর না আমলের ব্যাপারে কুফরী (যা আমলকারীকে ফাসিক বানিয়ে দেয়), এ বিতর্কের হদিশ মিলাতে আমি পারিনি।

৩. নামাযের ওয়াক্ত

[৩.১] নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে। প্রতিটি মুসলমানের ওপর দায়িত্ব, নির্দিষ্ট সময় মত সে নামায আদায়ের চেষ্টা করবে। নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে যে কোনো ধরনের শিথিলতা নামাযকে অবজ্ঞা করার-ই নমান্তর। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথাটি পূর্বেও বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরযকৃত নামায ওয়াক্তমত আদায় কর, কারণ এটি না করলে ধ্বংস অনিবার্য।'

[৩.২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নেকীর কাজে অগ্রসরমূলক মনোভাব রাখতেন বিধায় তিনি সর্বাবস্থায় আওয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করা পছন্দ করতেন। তিনি সকালের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন। তিনি মনে করতেন সকালের নামায অন্ধকার থাকতে আদায় করা সহজতর এবং উত্তম। তিনি যোহর নামাযও আগে আদায়ের ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে (পৃথক পৃথকভাবে) বলেছেন—'আমি আগে ভাগে যোহর নামায আদায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।[৩৩] তাঁরা যোহর নামায আদায়ে বিলম্ব করাকে পছন্দ করতেন না।[৩৪]

জুমআর নামাযের ব্যাপারে কথা হচ্ছে—যোহর নামাযের ওয়াক্তের মতই জুমআর নামাযের ওয়াক্ত। রইলো আবদুল্লাহ্ ইবনু সাইদান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা। তিনি বলেছেন—'আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে জুমআর নামায আদায় করেছি। তিনি জুমআর খুতবা এবং নামায দুপুরের আগেই আদায় করেছেন।[৩৫] এটি জায়েয নেই। ইবনু হাজার আসকালানী (রহ) বলেছেন—ইবনু সাইদানের বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিত্‌র নামাযও তাড়াতাড়ি আদায় করা পছন্দ করতেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তথা সবসময় রাতের প্রথম ভাগে বিত্‌র নামায পড়ে নিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কাজকে অনুমোদন করেছেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কখন বিত্‌র নামায আদায় করেন?' জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'রাতের প্রথম ভাগে আমি তা পড়ে নেই।' পরে তিনি একই প্রশ্ন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'রাতের শেষ ভাগে আমি পড়ি।' অতপর তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন—'তিনি সতর্কতার পথ অবলম্বন করেছেন।' আর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে লক্ষ্য করে বললেন—'তিনি বলিষ্ঠতার পথ ধরেছেন।'[৩৬] এজন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি যখন ঘুমুতে যেতেন তখনই বিত্‌র পড়ে নিতেন।[৩৭] আর নিজেকে লক্ষ্য করে বলতেন—'সতর্ক থাকো, ভয় করো এবং নফল নামায পড়তে থাকো।'[৩৮]

[৩.৩] **এমন ওয়াক্ত, যে সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ ঃ** এমন কিছু সময় আছে যখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

[৩.৩ক] ফযর নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে নামায পড়েছি। ফযরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামায নেই।'[৩৮]

[৩.৩খ] মধ্যাহ্নের সময়, যখন সূর্য মধ্য গগনে অবস্থান করে।

[৩.৩গ] যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে। সে সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (অবশ্য সূর্য ওঠার সময়ও হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এ উভয় সময়ের মধ্যে) নামায পড়া নিষিদ্ধ। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি কখনো কোনো খেজুর কিংবা আঙ্গুর বিথীতে ঘুমিয়ে যেতেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতেন তখন তড়িঘড়ি করে নামায আদায় করতেন না। বরং সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষা করতেন। সূর্যাস্তের পর নামায আদায় করতেন।[৪০]

[৩.৪] আরাফাতের ময়দানে যোহর এবং আসর নামায একত্রিত করে পড়া।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

৪. খালি মাটিতে নামায

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিলো—সিজদা রাব্বুল আলামীনের কাছে বান্দার বিনয় প্রকাশের সঠিক প্রতিচ্ছবি। আর বিনয় ততোক্ষণ পুরোপুরি প্রকাশিত হয় না যতোক্ষণ বান্দা তার কপাল সিজদার মাধ্যমে ধূলোমলিন না করে। এ জন্য তিনি অন্য কিছুর ওপর সিজদা করতে বাধা দিতেন।[৪১] তিনি মাটিতে এমনভাবে সিজদা করতেন, তার কপাল মাটির সংস্পর্শে পৌঁছে যেত।[৪২] আবু হাযাম তাঁর বাঁদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—'আমরা আসহাবে সুফ্‌ফার মধ্যে শামিল ছিলাম। আমাদের কাছে রশি থাকতো। যখন অলসতা আসতো কিংবা নামাযে ঝিমুনি আসতো তখন সেই রশি ধরে ঝুলে থাকতাম। আমাদের কাছে বিছানা থাকতো আমরা তা বিছিয়ে তার ওপর নামায পড়তাম। কারণ, মাটি বড়ো শক্ত ছিলো। একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের কাছে এলেন। বললেন—'ঐ রশি কেটে দাও, আর তোমাদেরকে মাটি পর্যন্ত পৌঁছাও।'[৪৩]-[অর্থাৎ বিছানা গুটিয়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যাও]

৫. এক কাপড়ে নামায

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক কাপড়ে নামায আদায় করা জায়েয মনে করতেন। তাতে দোষের কিছু মনে করতেন না। তেমনিভাবে শরীরের গোপনীয় কোনো অংশ যদি সামান্য প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে তাও মার্জনীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এক কাপড়ে নামায আদায় করেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি হুজরা থেকে বের হয়ে এসে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নামায পড়েছেন। আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—'আমি আমার পিতাকে এক কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেছি অথচ তখন তার আরো কাপড় ছিলো।' তিনি বলতেন—'বেটি ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নামায আমার পেছনে পড়েছেন তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত ছিলেন।'[৪৪]

৬. ওযু নষ্ট হওয়ার পর ওযু করে পুনরায় অবশিষ্ট নামায শেষ করা

নামাযের মধ্যে ওযু ভঙ্গের এমন কারণ ঘটে যাওয়া যা দূর করা সম্ভব হয় না। যেমন—নামাযের মধ্যে নাক দিয়ে রক্ত বেরুলো। তখন নামায ছেড়ে বাইরে এসে ওযু করে অবশিষ্ট

নামায পুরো করা। যাদের নামাযের ভেতর নাক দিয়ে রক্ত পড়বে তাদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য—'সে নাক পরিষ্কার করে ওযু করে নেবে, ফিরে এসে অবশিষ্ট নামায পুরো করবে। নামায নতুন করে আরম্ভ করার কোনো প্রয়োজন নেই।[৪৫]

৭. নামাযের নিয়ম

[৭.১] তাকবীরে তাহ্‌রীমা ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করা। তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় নামাযী তার দু' হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের শুরুতে দু' হাত উঠিয়েছেন।[৪৬]

[৭.২] কিয়াম ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমা দাঁড়িয়ে বলতে হবে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরায়াত পাঠ করতে হবে। ডান বায়ে তাকানো যাবে না। অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হওয়া যাবে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে দাঁড়িয়ে ডান বায়ে তাকাতেন না।[৪৭] তিনি এমন মনযোগদিয়ে নামায পড়তেন, মনে হতো একটি খুঁটি দাড়িয়ে আছে।[৪৮] কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো তিনি মাকরূহ্ মনে করতেন। তিনি কতিপয় সাহাবার ঐ রশিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে রশির সাহায্যে তারা দাঁড়াতেন।[৪৯] তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় হাত বেধে রাখতেন। ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।[৫০]

[৭.৩] দুআয়ে ইস্তিফ্‌তাহ্ পড়া ঃ অতপর নামাযী ব্যক্তি দুআয়ে ইস্তিফ্‌তাহ্ বা সানা পড়বে। সানা নিম্নরূপ ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"হে আল্লাহ ! তুমি পবিত্র। যাবতীয় প্রশংসা তোমার। তোমার নাম মহান এবং তোমার মর্যাদা সুউচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সানা হিসেবে এ দুআ পড়তেন।[৫১]

[৭.৪] বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া ঃ অতপর নামাযী ব্যক্তি চুপি চুপি 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়বেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মুফাচ্ছাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেকে নামাযে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম (উচ্চশব্দে) পড়তে শুনে বললেন—'বেটা ! দীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকো। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নামায পড়েছি। তাদের কাউকে এভাবে পড়তে শুনিনি। হাঁ, যখন কিরায়াত পড়বে তখন আলহামদু লিল্লাহ্-------পড়ো।'[৫২] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি এভাবে বলেছেন—'আমি তাদের কাউকে জোরে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তে শুনিনি। হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নামায পড়েছি। এঁরা সবাই 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' জোরে জোরে পড়তেন এবং 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' চুপি চুপি পড়তেন।'[৫৩]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এ রিওয়ায়েতটিও বর্ণিত হয়েছে যে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর

রাদিয়াল্লাহু আনহু আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পড়ে নামায শুরু করতেন।[৫২] ইমাম তাহাবী তো এতটুকু বলেছেন যে, এ বিষয়ে দু'টো বর্ণনাই মুতাওয়াতির পর্যায়ের।[৫৫]

এককভাবে ইমাম নববী (রহ) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে রিওয়ায়েত করেছেন—'তিনি জাহেরী নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' জোরে এবং সির্‌রী নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' আস্তে বলতেন।[৫৬] তিনি তাঁর রিওয়ায়েতের ভিত্তি হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐ বর্ণনার ওপর রেখেছেন যা শায।[৫৭] অর্থাৎ ঐ রিওয়ায়েত বর্ণনাকারীদের মধ্যে এক পর্যায়ে একজন এককভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম নববী এ রিওয়ায়েতটিকে তার মাযহাবের পক্ষে দলিল স্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

[৭.৫] কিরায়াত ঃ ফরয নামাযে প্রথম দু' রাকায়াতে সূরা ফাতিহা এবং কুরআন মজীদের কিছু আয়াত পাঠ করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফযর নামাযে সাধারণত দীর্ঘ কিরাত পাঠ করতেন। হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে ফযর নামায পড়েছি। তিনি সূরা আল বাকারা শুরু করলেন। দু' রাকায়াতে তিনি সূরা আল বাকারা শেষ করে সালাম ফেরালেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন—আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন। আপনার সালাম ফেরানোর পূর্বেই তো সূর্য ওঠার কথা। তিনি জবাব দিলেন—'যদি সূর্য ওঠেই যেত তাহলে আমাকে অমনোযোগী পেতেন না।[৫৮]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ দু' রাকায়াতে সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছুই পড়তেন না। রইলো আবু আবদুল্লাহ্‌র এই বর্ণনা—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মদীনায় এসেছিলাম। তার পেছনে মাগরিব নামায আদায় করলাম। তিনি প্রথম দু' রাকায়াতে সূরা ফাতিহা এবং কিসারে মুফাসসাল* সূরাসমূহ থেকে একটি সূরা পড়লেন। তারপর তিনি তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়ালেন। আমি তার এতো কাছাকাছি ছিলাম যে, আমার কাপড় তার কাপড় স্পর্শ করছিলো। আমি তাকে সূরা ফাতিহা এবং এই আয়াত পড়তে শুনলাম।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদেরকে হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের মনকে আবার বাঁকা করে দিয়ো না। তুমি আমাদেরকে রহমত দান কর। নিসন্দেহে একমাত্র তুমিই দাতা।"[৫৯]

এর জবাব হচ্ছে—তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে কাকুতি মিনতি করে দুআ করতে গিয়ে এ আয়াত পড়েছিলেন। এ জন্য মাকহুল দামেস্কী (রহ) বলেছেন—'এ আয়াত তিনি কিরায়াত হিসেবে পড়েননি বরং দুআ হিসেবে পড়েছিলেন।'[৬০]

[৭.৬] অবস্থার পরিবর্তনে তাকবীর [তাকবীরাতে ইন্তিকাল] ঃ নামাযী ব্যক্তি রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে। তাছাড়া এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময়ও তাকবীর

---

* সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাস্‌সাল বলে। এগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিওয়ালে মুফাস্‌সাল, আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং কিসারে মুফাস্‌সাল। সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাস্‌সাল বলে।-অনুবাদক

বলতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে দাঁড়ানোর সময়, প্রতিবার ঝুকে পড়ার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর বলতেন।[৬১] আর তাকবীর বলার সাথে সাথে রাফে' ইয়াদাইন করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলার সময় দু' হাত ওপরে ওঠাতেন। এমনিভাবে যখন রুকূ'তে যেতেন এবং রুকূ' থেকে দাঁড়াতেন তখনো দু' হাত ওপরে ওঠাতেন এবং বলতেন—'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন দু' হাত ওপরে ওঠাতেন। আর যখন রুকূ'তে যেতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতেন তখনো রাফে ইয়াদাইন করতেন।'[৬২]

[৭.৭] **তাশাহুদের জন্য বসা ঃ** নামাযী ব্যক্তি অতপর তাশাহুদ পড়ার জন্য বসবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে বসে এভাবে তাশাহুদ পড়া শেখাতেন যেভাবে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে শেখানো হয়।[৬৩]

তাশাহুদ নিম্নরূপ ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ وَعَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"সকল মৌখিক, শারিরীক ও সম্পদের ইবাদাত আল্লাহ্‌র জন্য। আমার ওপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল।"

[৭.৮] যদি নামায চার রাকায়াত বিশিষ্ট হয় তাহলে নামাযী ব্যক্তি তাশাহুদ পড়া শেষ করে অবিলম্বে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য ওঠে দাঁড়াবে। আবদুল্লাহ্ ইবনু হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে মাগরিবের নামায পড়েছি। যখন তিনি দু' রাকায়াত পড়ে বসলেন, তখন তিনি এমনভাবে বসলেন মনে হলো তিনি পাথরের ওপর বসলেন [অর্থাৎ হাল্কাভাবে বসলেন]। তারপর তিনি তৃতীয় রাকায়াতের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং সূরা ফাতিহা পড়লেন।[৬৪]

[৭.৯] **সালাম ফেরানো ঃ** নামাযী ব্যক্তি যখন শেষ বৈঠকের শেষের দিকে পৌঁছে যাবে তখন ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফেরানোর সময় 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে সালাম ফেরাতেন।[৬৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি শুধু একদিকে সালাম ফেরাতেন।[৬৬] এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, তিনি অন্যদিকে সালাম ফেরানোর সময় আওয়াজ এতো নিচু করে ফেলতেন, কেউ শুনলে মনে করতো তিনি বুঝি শুধু একদিকে সালাম ফেরালেন।

[৭.১০] **সালাম ফেরানোর পর স্থান ত্যাগ করা ঃ** সালাম ফেরানোর পর নামায থেকে পৃথক হয়ে দ্রুত ওঠে দাড়ানো কিংবা সেখান থেকে ওঠে চলে যাওয়া। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের সালাম ফিরিয়ে এতো দ্রুত সেখান থেকে ওঠে চলে যেতেন, মনে হতো তিনি গরম পাথরের ওপর বসেছিলেন।[৬৭]

[৭.১১] ফযর নামাযে কুনূত পড়া ঃ ফযর নামাযে কুনূত পড়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বলিত রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এক রিওয়ায়েতে আছে—'তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনো ফযর নামাযে কুনূত পড়েননি।[৬৮] আবার অনেকে বর্ণনা করেছেন—তিনি ফযরের নামাযে কুনূত পড়েছেন। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কাতাদা (রহ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযর নামাযে কুনূত পড়েছিলেন। তদ্রূপ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও পড়েছেন।[৬৯] আবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ বর্ণনায় ও ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি রুকূ'তে যাবার পূর্বে না পরে কুনূত পড়েছেন ? এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে বলেছেন তিনি রুকূ'তে যাবার পূর্বে কুনূত পড়েছেন আবার অনেকে রুকূ'তে যাবার পরে কুনূত পড়ার কথা বলেছেন।[৭০]

[৭.১২] বিত্‌র নামাযে কুনূত ঃ [৭.১২ক] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে, বিত্‌র নামায এক রাকায়াত। যা ঘুমানোর পূর্বে এবং অন্যান্য নফলের পরে আদায় করতে হয়।[৭১] একথার ভিত্তিতে নামাযী ব্যক্তি প্রথমে দু' রাকায়াত নফল নামায পড়ে সালাম ফেরাবেন তারপর এক রাকায়াত বিত্‌র নামায পড়বেন।

[৭.১২খ] বিত্‌রের শেষ রাকায়াতে রুকূ' থেকে দাঁড়ানোর পর কুনূত পড়তে হবে।[৭২]

[৭.১২গ] বিত্‌র নামায পড়ে কেউ ঘুমিয়ে গেলে এবং রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগ্রত হলে তাকে পুনরায় বিত্‌র নামায পড়তে হবে না। এমন কি এক রাকায়াত পড়ে বিজোড় বানাতেও হবে না। বরং তাহাজ্জুদ নামায দু' রাকায়াত করে পড়তে থাকবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতের প্রথম ভাগে বিত্‌র নামায পড়ে নিতেন এবং যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন তখন দু' রাকায়াত দু' রাকায়াত করে পড়তেন।[৭৩]

৮. অসুস্থ ব্যক্তির নামায

যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হন তাহলে তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন। নইলে যেভাবে তিনি বসে নামায পড়তে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন সেভাবে বসে নামায আদায় করবেন। যদি বসেও না পারেন, তাহলে শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করবেন। মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে এবং ঠেস দিয়ে বসে নামায আদায় করতে দেখেছি।'[৭৪]

৯. জামায়াতে নামায

[৯.১] ইমামতের জন্য অধিক যোগ্য ব্যক্তি ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন যিনি দীনের ব্যাপারে বেশী জ্ঞান রাখেন তিনিই ইমামতের জন্য অধিক যোগ্য ব্যক্তি। যদিও তিনি কোনো মুক্তাদীর সন্তান হন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তার পেছনে ইক্তিদা করে নামায আদায় করেছেন।[৭৫]

[৯.২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে প্রবেশ করলেন। সাথে যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। উভয়ে ইমামকে তখন রুকূ'তে পেলেন। তাঁরা কাতারের পেছনে নিয়ত বেধে রুকূ' অবস্থায় হেটে এসে কাতারে শামিল হলেন।[৭৩]

[৯.৩] মুক্তাদী ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাত পড়বেন না। বরং নিরব থেকে মনযোগ দিয়ে ইমামের কিরাত শুনবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া থেকে বিরত থাকতেন।[৭৭]

[৯.৪] যদি কোনো মুসাফির মুকীমের ইমামত করেন তাহলে তার উচিত দু' রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরিয়ে মুসুল্লিদেরকে নামায পুরো করার জন্য বলে দেয়া। ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হাজ্জ করেছি। তিনি নামাযে ইমামত করলে স্থানীয়দেরকে বলে দিতেন—তোমরা নামায চার রাকায়াত পুরো কর। কারণ, আমি মুসাফির।'[৭৮]

[৯.৫] মুক্তাদীদের জন্য আবশ্যক, তারা কাতারের মধ্যে ফাঁক রাখবেন না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমআর দিন কিছু লোককে মসজিদের আঙিনায় নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বললেন—'তাদের জুমআর নামায হয়নি।' জিজ্ঞেস করা হলো—'কেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করার সুযোগ তাদের ছিলো কিন্তু তারা মসজিদে প্রবেশ করেনি।'[৭৯]

[৯.৬] যখন ইমাম সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন তখন তিনি সাথে সাথে সেখান থেকে ওঠে দাঁড়াবেন কিংবা অন্য কোথাও সরে যাবেন। এ আলোচনা অবশ্য পূর্বেও করা হয়েছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযের সালাম ফিরিয়ে এতো দ্রুত সেখান থেকে ওঠে যেতেন মনে হতো তিনি গরম কোনো পাথরের ওপর বসা ছিলেন।-['সালাত' শিরোনাম দেখুন]

১০. জুমআর নামায

[১০.১] **জুমআর নামাযের ওয়াক্ত ঃ** জুমআর নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন 'সালাত' শিরোনাম তৃতীয় প্যারা।

[১০.২] **জুমআর নামাযের খুতবা ঃ** জুমআর নামাযের প্রথমে খুতবা [বক্তৃতা] প্রদান করতে হবে।

[১০.২ক] যখন খুতবা প্রদানের জন্য খতীব মিম্বারে ওঠবেন তখন মুসুল্লীদেরকে লক্ষ্য করে 'আসসালামু আলাইকুম' বলবেন। তারপর মিম্বারের ওপর বসে পড়বেন এবং মুয়াজ্জিন জুমআর নামাযের আযান দেবেন।-['আযান' শিরোনাম দেখুন] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিম্বারে ওঠতেন তখন লোকদেরকে লক্ষ্য করে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতেন।[৮০]

[১০.২খ] আযান শেষ হলে খতীব দাঁড়িয়ে খুতবা দেবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।[৮১]

[১০.২গ] খতীব দু'টো খুতবা দেবেন এবং দু' খুতবার মাঝে বিশ্রামের জন্য বসবেন। দু' খুতবার মাঝে বিরতিকালে মুসুল্লীগণ খতীবের সাথে কথা বলতে পারবেন। সাইয়িদ ইবনু মুসায়্যিব (রহ) থেকে বর্ণিত—একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দিয়ে মিম্বারে বসলেন তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—হে আবু বকর! তিনি 'লাব্বাইক' বললেন। অতপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আমাকে বলুন আপনি কি আল্লাহ্‌র জন্য আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন না আপনার জন্য?' তিনি বললেন—'আল্লাহ্‌র জন্য।' বিলাল

রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন—'তাহলে আমাকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার অনুমতি দিন।' তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া চলে গেলেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।[৮২]

১১. ঈদের নামায

[১১.১] ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা সুন্নাত। নামায পড়তে পারলে পড়বে, আর হায়েয নিফাস প্রভৃতির কারণে নামায না পড়তে পারলে নামাযের জায়গা থেকে দূরে বসে থাকবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন প্রত্যেক 'নাতাক* ওয়ালীর' অধিকার, সে ঈদের দিন ঈদগাহে যাবে।[৮৩]

[১১.২] ঈদের নামায আগে তারপর খুতবা প্রদান ঃ আগে ঈদের নামায পড়ে, তারপর ঈদের খুতবা প্রদান করতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে ঈদের নামায আদায় করতেন এবং তারপর ঈদের খুতবা দিতেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয় ঈদেই এরূপ করতেন।[৮৪]

[১১.৩] ঈদের নামাযে আযান ইকামাত ঃ আযান ইকামাত ছাড়াই ঈদের নামায পড়া হয়। কারণ আযান ও ইকামাত সেই নামাযের জন্য নির্দিষ্ট যা ফরযে আইন।-['আযান' শিরোনাম দেখুন]

[১১.৪] ঈদের নামাযে তাকবীর ঃ প্রথম রাকায়াতে কিরাত শুরু করার পূর্বে সাত তাকবীর বলা হয় এবং শেষ রাকায়াতে পাঁচ তাকবীর। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ করেছেন।[৮৫]

[১১.৫] ঈদের নামাযে কিরাত ঃ ঈদের নামাযে প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর কুরআন মজীদের যে কোনো স্থান থেকে সুবিধা মতআয়াত বা সূরা পড়া। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ঈদের নামাযে সূরা বাকারা পড়লেন। আমি আমার পাশে দাঁড়ানো এক বুড়োকে দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঝুকে পড়েছেন।'[৮৬]

১২. ইস্তিস্কার নামায

ইস্তিস্কার [বৃষ্টি প্রার্থনার] নামায ঈদের নামাযের মতো। প্রথম রাকায়াতে সাত তাকবীর এবং শেষ রাকায়াতে পাঁচ তাকবীর বলতে হবে। এই তাকবীরকে 'অতিরিক্ত তাকবীর' বলে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দু' ঈদের নামাযে এবং ইস্তিস্কার নামাযে প্রথম রাকায়াতে সাত তাকবীর এবং শেষ রাকায়াতে পাঁচ তাকবীর বলতেন।[৮৭]

১৩. নফল নামায

[১৩.১] মাগরিবের ফরযের পূর্বে নফল ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাগরিবের আযান দেয়া মাত্র ফরয নামায পড়তেন। মাগরিবের ফরয নামাযের আগে কোনো নফল নামায তিনি পড়তেন না। তাঁর সম্পর্কে একথাই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মাগরিবে ফরয নামাযের আগে দু' রাকায়াত নফল নামায পড়তেন না।[৮৮]

---

* 'নাতাক' এমন এক টুকরা কাপড়ের নাম, মহিলারা যা কোমরবন্ধ [বেল্ট] হিসেবে ব্যবহার করতো। যার এক মাথা কোমর থেকে পায়ের মাঝামাঝি ঝুলে থাকতো এবং অপর মাথা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

[১৩.২] চাশ্‌তের নামায ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাশ্‌তের নামায পড়তেন না। মুওরাক ওজাইলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি চাশ্‌তের নামায পড়েন ? তিনি জবাব দিলেন—না। আমি জিজ্ঞেস করলাম—হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি পড়তেন ? তিনি বললেন—না, তিনিও পড়তেন না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি পড়তেন ? তিনি এবারও নেতিবাচক উত্তর দিলেন। আমি বললাম—তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়তেন ? তিনি বললেন—'আমার মনে হয় তিনিও পড়তেন না।'[৮৯] আমি [অর্থাৎ লেখক] মনে করি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের নফল মোটেই পড়তেন না। কারণ, বেদুঈনগণ যেন ফরয মনে করে না বসে সে জন্য। কেননা লোকজন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণ করতো। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

১৪. সফরে নফল নামায

সফরে নফল নামায আদায়।-[দেখুন, 'সফর' শিরোনাম]

১৫. জানাযার নামায

[১৫.১] প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামায হওয়া উচিত ঃ যখন কোনো মুসলমান ইন্তিকাল করেন তখন তার জানাযার নামায পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। সে বড়ো হোক কিংবা ছোট। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'নিজের সন্তানদের জানাযার নামায পড়ো কারণ সে জানাযা নামাযের অধিক হকদার।' অন্য রিওয়ায়েতে আছে—'আমরা যাদের জানাযা পড়ে থাকি তার মধ্যে অধিক হকদার আমাদের বাচ্চারা।'[৮৭]

[১৫.২] জানাযা নামায পড়ানোর অধিকার কার বেশী ? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রায় ছিলো—মুসলমানদের জানাযা নামায পড়ানোর অধিকার ইমাম বা খলীফার সবচেয়ে বেশী। এমনকি মৃত ব্যক্তির ওলীর চেয়েও বেশী। আমরা দেখতে পাই—যখন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জানাযা নামায পড়ানোর সময় হলো, তখন মুসলমানদের ইমাম হওয়ার কারণে স্বেচ্ছায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে বেড়ে ইমামত করেছিলেন।[৯১]

[১৫.৩] জানাযার নামাযের জায়গা ঃ জানাযার নামায মসজিদে পড়া যায়। যদি মুসুল্লীদের স্থান সংকুলান না হয় তাহলে মসজিদের বাইরে পড়া যাবে। মসজিদের জায়গা অপ্রতুল মনে করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ থেকে বাইরে বেরিয়ে জানাযার নামায পড়তেন। মসজিদের ভেতর পড়তেন না।[৯২] কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর তাঁর জানাযার নামায মসজিদের ভেতর আদায় করা হয়েছে।[৯৩]

[১৫.৪] জানাযা নামাযের বিবরণ ঃ জানাযার নামায চার তাকবীর বিশিষ্ট।[৯৪] প্রতিটি তাকবীর এক রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত। শেষ তাকবীরে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা হয়। তবে এজন্য নির্দিষ্ট কোনো দুআ নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দুআ করতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ اَسْلَمَهُ الْاَهْلُ وَالْاٰلُ الْعَشِيْرُ وَالذَّنْبُ عَظِيْمٌ وَاَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"হে আল্লাহ ! এতো তোমার বান্দা, তার আহ্‌ল, তার সন্তানাদি, তার গোত্র পর্যন্ত তার সাহচর্য ছেড়ে দিয়েছে, তার তো অনেক গুনাহ্ কিন্তু তুমি তো মার্জনাকারী, করুণার আধার।"[৯৫]

১৬. সফরে নামায কসর পড়া

[এজন্য 'সফর' ও 'হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

সালাম [سلام]—সালাম, সম্ভাষণ

১. সংজ্ঞা

সালাম বলতে আমরা বুঝি আস্‌সালামু আলাইকুম বলে কাউকে সম্ভাষণ জানানো।

২. ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করা

ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করা মুসলমানদের জন্য সুন্নাত। কেননা সালাম প্রদানের মাধ্যমে ভালোবাসার বৃদ্ধি হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না, যার ওপর আমল করলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যাবে ? তাহলে তোমরা একে অপরকে সালাম দেবে।[৯৬] ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। যাহ্‌রা ইবনু খুযাইমা বলেন —আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সওয়ারীর পেছনে বসেছিলাম। যখন আমরা কোনো লোককে দেখতে পেতাম তখন 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতাম। লোকেরা এতো ব্যাপকভাবে সালামের উত্তর দিতে লাগলেন যে, তিনি বলতে বাধ্য হলেন—'সালামের ব্যাপারে আজ লোকেরা আমাকে ছাড়িয়ে গেলো।'[৯৭]

৩. অনেক লোকের মধ্যে কাউকে নির্দিষ্ট করে সালাম না দেয়া

যদি কোনো ব্যক্তি অনেক লোকের সমাবেশে যায় কিংবা অনেক মানুষের সামনে পড়ে যায় তাহলে কাউকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়া জায়েয নেই। সালাম সবাইকে লক্ষ্য করে দিতে হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তির কথাকে অপছন্দ করেছিলেন, যে বলেছিলেন—আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া খলীফাতুর রাসূল ! [হে রাসূলের খলীফা আপনাকে সালাম]। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন—'পুরো জলসার মধ্যে শুধু আমি !!'[৯৮]

৪. পুরুষ কর্তৃক মহিলাদেরকে সালাম দেয়া

পুরুষ কর্তৃক মহিলাদেরকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। যয়নাব বিনতে মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি হাজ্জের জন্য রওয়ানা হলাম। আমার সাথে আরেক মহিলাও ছিলেন যিনি আমার জন্য তাবু খাটিয়েছিলেন। আমি মানত করেছিলাম, কারো সাথে কোনো কথা বলবো না। এক ব্যক্তি আমাদের তাবুর দরোজার কাছে এসে আমাদের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন। আমার সাথী তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কেন তার সালামের জবাব দিলাম না। আমার সাথী তাকে বললেন—সে কথা না বলার জন্য মানত করেছে। তিনি বললেন—এতো জাহেলী যুগের প্রচলন। মানুষের সাথে তোমার কথা বলা উচিত। আমি একথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

—আপনি কে ?

—আমি একজন মুহাজির।

—কোন্ গোত্রের মুহাজির ?

—কুরাইশ গোত্রের।

—কুরাইশ গোত্রের কোন্ শাখার ?

—তুমিতো প্রশ্ন করে ঝালাপালা করে দিচ্ছো। আমি আবু বকর।

—মাত্র ক'দিন হয় জাহেলী সমাজের সাথে আমরা পাট চুকে দিয়েছি। এখনো অন্যদের মতো দৃঢ়তা আসেনি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাঠানো দীনের যে প্রভাব পড়েছে তা তো আপনি দেখছেন। এখন আমি জানতে চাই দীনের এ শান্তি ও নিরাপত্তার ধারা কতদিন পর্যন্ত বলবত থাকবে ?

—'যতদিন পর্যন্ত তোমাদের নেতৃবৃন্দ ঠিক থাকবেন।'

—'নেতা কাকে বলা হয় ?'

—তোমাদের মধ্যে এমন উত্তম লোক নেই যার কথা মতো চলা হয় ?

—'কেন নয় ?'

—ঠিক, ঐ ধরনের লোকদেরকেই তো নেতা বলা হয়।[৯৯]

৫. খতীব মিম্বারে পৌঁছে লোকদেরকে সালাম দেয়া

জুম'আর দিন অথবা জুম'আ ছাড়া অন্যদিন। যখন খতীব মিম্বারে দাঁড়াবেন তখন লোকদেরকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন তখন লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতেন।[১০০]
-(আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

সাহাবাহ্ [صحابة]—সাহাবা, সাথী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকে গালি গালাজ করা ফাসেকী।

-[আরো দেখুন, 'সাব্বুন' শিরোনাম]

সিদাক [صداق]—মোহরানা

মোহর সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, 'নিকাহ' শিরোনাম।

সিবগুন [صبغ]—রঙ

০ 'খিযাব' শিরোনাম দেখুন।

০ মৃত ব্যক্তির কাফন রাঙানো।-['মাওত' শিরোনাম দেখুন]

০ হাজ্জের সময় রঙিন কাপড় পরা।-['হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন]

সিয়াম [صيام]—রোযা, সিয়াম, বিরত থাকা

১. সংজ্ঞা

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনবাসনা পূরণ থেকে বিরত থাকাকে সিয়াম বা রোযা বলে।

২. রোযার সময়

[২.১] আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة : ١٨٥)

"রমযান সেই মাস যে মাসে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা মানুষের হিদায়াতের এবং সত্য পথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট বর্ণনা আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে।–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

এজন্য যে এ মাস পাবে এবং বিনা কারণে রোযা ছেড়ে দেবে, তার কাছ থেকে সে রোযার কাযা আল্লাহ্ কবুল করবেন না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলেছেন—'যারা তাদের যাকাত এমন লোকদেরকে দান করবে যারা যাকাত নেবার অধিকারী নয়, তাদের যাকাত কবুল হবে না। চাই তামাম পৃথিবী সে যাকাত বাবদ দিয়ে দিক না কেন। আর যে রমযানের রোযা অন্য মাসে রাখবে তার রোযাও কবুল করা হবে না, সারা জীবন রোযা রাখলেও না।[১০১]

[২.২] রোযাদার সুবহে সাদিক থেকে রোযা শুরু করবে। প্রকৃতপক্ষে সুবহে সাদিক নিরূপণকারী নিজের চোখে দেখে সুবহে সাদিকের সময় নিরূপণ করবেন তা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারে না যে, এই মুহূর্ত থেকে সুবহে সাদিক শুরু হয়ে গেলো। এ জন্য পূর্ববর্তী অনেক মনীষী যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও একজন, মনে করতেন—সুবহে সাদিক নিকটতর হয়ে যাওয়ার পরও সাহ্‌রী খাওয়া যেতে পারে।[১০২] হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সাহ্‌রী খেতে এতো বিলম্ব করে ফেলতেন, সুবহে সাদিক নিকটবর্তী হয়ে যেত, তখন বলতেন—দরোজা বন্ধ করে দাও, সুবহে সাদিক যেন হঠাৎ করে প্রকাশ পেয়ে না যায়।'[১০৩]

একবার তিনি সালিম ইবনু আবদুল্লাহ্ আশজায়ীকে বললেন—'যাও আমার জন্য পর্দা করে দাও যাতে সুবহে সাদিকের আলো এসে না পৌঁছে।' তারপর তিনি সাহ্‌রী খেলেন।[১০৪]

সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে রোযাদারের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলে ততোক্ষণ পর্যন্ত সে পানাহার চালিয়ে যাবে যতক্ষণ সুবহে সাদিকের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মে।[১০৫] প্রত্যয় সৃষ্টি হলে খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করবে। কারণ, সন্দেহ প্রত্যয়কে অপসারণ করতে পারে না।

যখন দু' ব্যক্তি রোযা রাখার জন্য সুবহে সাদিক হয়েছে কিনা দেখবে, তখন একজনের সন্দেহ সৃষ্টি হলে উভয়ে সাহ্‌রী খাবেন যতোক্ষণ উভয়ের কাছে সুবহে সাদিক হয়েছে বলে প্রতীয়মান না হয়।[১০৬]

দু' ব্যক্তির একজন সুবহে সাদিক হওয়ার সংবাদ দিলেন। অপরজন তা অস্বীকার করলেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয হবে। যতোক্ষণ উভয়ে সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে একমত না হন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সাহ্‌রী খাচ্ছিলেন। এমন সময় দু' ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। একজন বললেন—সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। দ্বিতীয়জন বললেন—না, এখনো হয়নি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে বললেন—'খেতে থাকো, কেননা সুবহে সাদিকের ব্যাপারে দু'জন এখনো একমত হয়নি।[১০৭]

[২.৩] সূর্যাস্তের সাথে সাথে রোযাদারের রোযা পূর্ণ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাগরিব নামায ইফতারের পূর্বে পড়ে নিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো ইফতারের ব্যাপারে সামান্য বিলম্বের অবকাশ আছে।[১০৮] [অবশ্য ইসলামী আইনের ভাষ্যকারদের মতে অন্য দলীলের ভিত্তিতে ইফতার দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত।-অনুবাদক]

৩. এমন জায়গায় রোযা রাখা উচিত নয়—যেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়

[৩.১] **আরাফাতের দিনের রোযা ঃ** হাজীদের জন্য আরাফাতের দিন রোযা রাখা শরীআহ্ সম্মত নয়। যেন এ মহান দিনে রোযা ছাড়া দুআ ও মুনাজাতের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজ্জের দিন রোযা রাখতেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জ করেছি তিনি রোযা রাখতেন না। তারপর আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও হাজ্জ আদায় করেছি কিন্তু তারা কখনো রোযা রাখতেন না। এ জন্য আমিও রোযা রাখি না। আমি না রোযা রাখার নির্দেশ দেই আর না তা থেকে বিরত রাখি।'[১০৯]

[৩.২] **দুঃখ বেদনা ও কাজের দিন রোযা রাখা ঃ** মানুষের জীবনে দুঃখ-বেদনা আসে। এমতাবস্থায় নফল রোযা না রাখা মুস্তাহাব। যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় সন্নিকটে তখন তিনি ওসিয়ত করলেন—আমার মৃতদেহ আমার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস গোসল দেবে। স্ত্রী রোযা ছিলেন তিনি তাকে রোযা খুলে ফেলতে বাধ্য করলেন এবং বললেন—'রোযা খুলে ফেললে তুমি অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে।'[১১০]

সিয়াল [صيال]—আক্রমণ

আক্রমণ করা কিংবা হুমকী দেয়াকে 'সিয়াল' বলে।

আক্রমণ করে ক্ষতি সাধন করার অপরাধ।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

সিয়াসাত [سياسة]—রাজনীতি, কার্যপ্রণালী

ইসলামে নতুন প্রবেশকারীর কার্যপ্রণালীর ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করা, যেন সে ঈমানে দৃঢ়তা লাভ করতে পারে।-['মাওত' ও 'বিদআত' শিরোনাম দেখুন]

সিরাইয়াহ্ [سراية]—অনুপ্রবেশ, সংক্রমণ

১. সংজ্ঞা

'সিরাইয়াহ্' বলা হয় ঐ শাস্তিকে যা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে প্রয়োগ করলেও শরীরের অন্যান্য অংশে তা পৌঁছে যায়।

২. সিরাইয়াহ্ ফলাফল

যদি শাস্তি প্রয়োগ সিরাইয়াহ্‌র পর্যায়ে পড়ে এবং তার এমন শাস্তি যার মধ্যে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। যেমন—হদ অথবা কিসাস প্রভৃতি—তাহলে তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। এ জন্য চুরির অপরাধে কারো হাত কেটে দেয়া হলে এবং তার পরিণতিতে যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে এজন্য কোনো রক্তপণ দিতে হবে না। হযরত আবু বকর

রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—'যে ব্যক্তি হদ প্রয়োগের কারণে মারা যাবে তার কোনো দিয়াত নেই।'[১১১]

সিলাহুন [سلاح]—অস্ত্র, হাতিয়ার

বিদ্রোহীদের ওপর বিজয় লাভ করার পর তাদের থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে নিরস্ত্র করে দেয়া।-[দেখুন-'সুলহ্' শিরোনাম]

সুকরুন [سكر]—নেশা

কোনো নির্দিষ্ট মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাওয়া কিংবা কাজকর্ম ও কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যাওয়াকে নেশা বা সুকরণ বলে।

নেশা করার শাস্তি ঃ

['খামর' শিরোনাম দেখুন]

সুজূদ [سجود]—সিজদা

১. সংজ্ঞা

বিনয় প্রকাশের নিমিত্তে সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে রাখার নাম সিজদা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো হচ্ছে—কপাল, দু' হাতের তালু, দু' হাটু এবং দু' পায়ের সামনের তালুদ্বয়।

২. নামাযে মাটিতে সিজদা দেয়া

-[দেখুন,'সালাত' শিরোনাম]

৩. সিজদা শোকর

কোনো নিয়ামত পেয়ে কিংবা কোনো মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ সিজদা করা, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাত মনে করতেন। মুরতাদদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধে, মুসলিম বাহিনীর বিজয় সংবাদ পেয়ে তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।[১১২]

৪. সিজদা তিলাওয়াত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আল কুরআনের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন সাথে সাথে সিজদা আদায় করতেন। যেমন—সূরা ইনশিকাক, সূরা আলাক প্রভৃতি সিজদার আয়াত সম্বলিত সূরা।[১১৩]

সুন্নাহ্ [سنة]—সুন্নাত, হাদীসে রাসূল

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ একত্রিত করেছিলেন।-['হাদীস' শিরোনাম দেখুন]

সফরে থাকাকালিন সময়ে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অনুমতি।-['সাফার' শিরোনাম দেখুন]

সুবহ্ [صبح]—সকাল, ভোর বেলা

ভোরের আযানের সময়।-['আযান' শিরোনাম দেখুন]

সুলব [صلب]—মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

সুলহ্ [صلح]—সন্ধি, আপোষচুক্তি

১. সংজ্ঞা

মতবিরোধ কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত দু' দলের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে সন্ধি বা সুলহ্ বলে।

২. ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার বিরোধীদের সাথে সন্ধি

ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরোধীদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করতে পারে, যাতে মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষিত এবং নিশ্চিত হয়। হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হায়রা ও আইনুত্ তামার বাসীর সাথে সন্ধি করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে জানান। তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন।[১১৪]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনী আসাদ এবং বনী গাতফানের সাথে অস্ত্র সমর্পণ ও মুসলমান থেকে লুণ্ঠিত মাল ফেরত দেয়ার শর্তে সন্ধি করেছিলেন। ইবনু কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে লিখেছেন—যখন আসাদ ও গাতফান গোত্রের প্রতিনিধি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হলো তখন তিনি তাদেরকে বহিষ্কারকারী যুদ্ধ কিংবা অপমানজনক সন্ধি এ দু'টোর একটিকে গ্রহণ করতে বললেন। তারা বললো—'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! দেশান্তরকারী যুদ্ধ তো আমরা বুঝলাম কিন্তু অপমানজনক সন্ধির অর্থ কী ? তিনি বললেন—তোমরা তোমাদের অস্ত্র এবং বাহন আমাদের কাছে অর্পণ করবে। আর কিছু লোক আমাদেরকে দেবে যারা উটগুলো চরাবে এবং দেখাশুনা করবে। যতোদিন আল্লাহ্ তাঁর নবীর খলীফা ও মুসলমানদেরকে তোমাদের ওযর কবুল করার জন্য কোনো নিদর্শন না দেখান। তাছাড়া তোমরা আমাদের থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নিয়েছ তা আমাদেরকে ফেরত দেবে। আর তোমরা সাক্ষ্য দেবে যে, আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা জান্নাতী এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা জাহান্নামী। তাছাড়া তোমরা নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত (রক্তপণ)ও আদায় করবে কিন্তু আমরা তোমাদের নিহতদের জন্য কোনো দিয়াত প্রদান করবো না।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলে ওঠলেন—'আপনি আমাদের মধ্য থেকে যারা নিহত হয়েছে তাদের রক্তপণ চেয়েছেন, তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের নিহত ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র পথে জীবন দিয়েছেন।'[১১৫]

সুহুর [سحور]—সাহ্‌রী খাওয়া

সাহ্‌রী খাওয়ার শেষ সময়।-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫০৩ ; 'ত'আম' শিরোনাম দ্রঃ।
২. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩৩।
৩. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৭০।

৪. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১৬।
৫. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১২।
৬. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৮ ; সুনানু দারিমী, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৪।
৭. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৫৭।
৮. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৩।
৯. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৪০৯ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।
১০. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৬০ ; 'যিম্মাহ্' দ্রঃ।
১১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬১।
১২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬১।
১৩. সুনানু তিরমিযি, সালাত অধ্যায় ; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-২৬৫।
১৪. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪০ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১০৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৩৮।
১৫. সুনানু নাসাঈ, চুরি অধ্যায় ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৪২।
১৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৩৬ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫৯ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ৫৩৮।
১৭. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০।
১৮. কিতাবুল খারাজ, পৃ-১৭৩।
১৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩২।
২০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮৮।
২১. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬০।
২২. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮৮ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬০।
২৩. কিতাবুল খারাজ, পৃ-১৭৪।
২৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৪৭ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৫৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬৪ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৪৬ ; তাফসীরে আল কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭২।
২৫. তাফসীর আল কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১২৭ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৬।
২৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৩৮।
২৭. কিতাবুল খারাজ, পৃ-১৭৪।
২৮. কিতাবুল খারাজ, পৃ-১৭৪।
২৯. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২০১।
৩০. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪।
৩১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১২৬ ; আল ইস্তিযকার, ১ম খণ্ড, পৃ-৫২।
৩২. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৯।
৩৩. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৮৯।
৩৪. ত্বারহুত্ তাতরীব, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫২।
কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬৯।
৩৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ–১৭৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ–৪২ ; আল মাজমু, ৪র্থ খণ্ড, পৃ–২৮২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ–২৫৭।
৩৬. সুনানু আবী দাউদ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ–৬৯।
৩৭. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৫ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৪ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫১৮।
৩৮. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫৯।
৩৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০৩ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৩৩ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২৬।

৪০. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১০৮।
৪১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৪০৩ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬১।
৪২. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯৭ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৭।
৪৩. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫১ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-২৩৯।
৪৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৮ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৫।
৪৫. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৮ ; ইস্তিযকার, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯৭।
৪৬. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৪।
৪৭. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৮।
৪৮. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১০৩ ; আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ–২৬৪।
৪৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫১ ; আল মাজমু', ২য় খণ্ড, পৃ-২৩৯।
৫০. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড,পৃ-১০৩ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৯।
৫১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৬ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৬ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৭।
৫২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৬ ; আসারু আবী ইউসুফ, নং ১০৭ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৭৭।
৫৩. আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮১ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৭।
৫৪. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৮৮ ; সুনানু দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৩ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫০ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১১৫।
৫৫. শরহে মাআনিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৯।
৫৬. আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-২৯৯।
৫৭. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১১৮।
৫৮. সুনানু বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭৯ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১১৩ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১০৪, ১০৫ ; শরহে মাআনিল আসার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১০৭।
৫৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৭ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৯০ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৯ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৪, ৩৯১।
৬০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১১০ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৭৬।
৬১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৭ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৭ ; আল মাজমু', ২য় খণ্ড, পৃ-৩৬৩ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯৬।
৬২. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৪ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৬৮।
৬৩. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৫।
৬৪. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০৫ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৬ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৩১।
৬৫. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৬ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪২ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৫৮ ; শরহে মাআনিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৯ ; আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৬ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১০৩ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৬২ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৫২ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৭।
৬৬. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৬ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৩।
৬৭. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-২৪২ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮২ ; আসারু আবী ইউসুফ, নং-১৫৬ ; শরহে মাআনিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৯ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৫৮।
৬৮. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১০৫ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৯ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৫ ; ইখতিলাফু আবী হানিফা মাআ ইবনু আবী লাইলা, পৃ-১১২।
৬৯. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১০৯ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০০ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-২০২ ; আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪১ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭৩, ৮২ ; আল

ই'তিবার ফি ন্নাসিখ ওয়াল মানসুখ মিনাল আসার, পৃ-৯২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫২ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৮৪।

৭০. প্রাগুক্ত সবগুলো।

৭১. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫০ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৮ ; 'সালাত' দ্রঃ।

৭২. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭২ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫০।

৭৩. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৭ ; সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৬ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫৯, ৩৮৬ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬৩ ; আল মাজমু', ২য় খণ্ড, পৃ-৫২১।

৭৪. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯০।

৭৫. মুসান্নাফ—ইবনু আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৮।

৭৬. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬০ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৯৫ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৫।

৭৭. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৯।

৭৮. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১২।

৭৯. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৮।

৮০. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১৯২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৭, ২০৫ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৭ ; 'সালাম' দ্রঃ।

৮১. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৮৭ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৭।

৮২. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৬।

৮৩. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৬ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬৩৬ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৭৫।

৮৪. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৮৫, ২৭৯, ২৯২ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৫ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮।

৮৫. আল মাজমু', ৫ম খণ্ড, পৃ-১৭।

৮৬. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৮৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৯৩ ; আল মাজমু', ৫ম খণ্ড, পৃ-২৩।

৮৭. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৬।

৮৮. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৮৫, ২৯২ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৩, ৯৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৩১।

৮৯. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০৮।

৯০. সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৫৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০৯।

৯১. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০৯।

৯২. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০৯ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭০।

৯৩. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫২১, ৪২৩ ; আল মাজমু', ৫ম খণ্ড, পৃ-১৬৮ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৪।

৯৪. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০৯।

৯৫. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৩৫ ; আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫০।

৯৬. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

৯৭. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-২১৮।

৯৮. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-২১৮।

৯৯. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৫৩।

১০০. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৯৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২০৫।

১০১. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৯ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৮৩ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৫।

১০২. তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-২২২।

১০৩. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৩৪ ; আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৩৯ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৭০।

১০৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৩১ ; আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–২৩২ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ–৬২৬।

১০৫. আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪৩ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৩৬।

১০৬. আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৩২।

১০৭. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৩।

১০৮. আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪১৮।

১০৯. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৮৫ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৮ ; আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৩৮ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৭৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৮।

১১০. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২১১।.

১১১. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২২ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭২৭ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭০]

১১২. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৬।

১১৩. সুনানু বাইহাকী ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৬।

১১৪. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৩৪।

১১৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৯ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-১৯৭ ; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩৫।

হ

হদ [حد]—শরীয়াহ্ নির্দিষ্ট শাস্তি

১. সংজ্ঞা

শরীয়াহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট অপরাধের বিনিময়ে নির্দিষ্ট শাস্তিকে 'হদ' বলে।

২. শরঈ শাস্তিযোগ্য অপরাধের গোপনীয়তা রক্ষা করা

শরঈ শাস্তি মূলত আল্লাহ্‌র হকের অন্যতম। তাই এরূপ অপরাধীর কল্যাণ ও সংশোধনের নিমিত্তে তাদের অপরাধকে গোপন রাখা, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে উত্তম। এজন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—'চোর, ব্যভিচারী, মাদক দ্রব্য সেবনকারীর গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে যদি আমার কাছে এ কাপড় ছাড়া আর কিছু না পাওয়া যায়, তবু আমি তাদের অপরাধকে গোপন রাখা পছন্দ করবো।[১] তিনি আরো বলেছেন—'আমি যদি কোনো মাদকদ্রব্য সেবীকে ধরেও আনি তবু আমি চাইবো আল্লাহ্ যেন তার কৃতকর্মের ওপর পর্দা ফেলে দেন।'[২] তিনি এও বলেছেন যে—'আমি যদি কোনো চোরকে ধরে আনি, তবু আমি চাবো আল্লাহ্ যেন তার অপরাধ গোপন করে রাখেন।'[৩]

মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে—বনী আসলাম গোত্রের মায়েয আসলামী নামক এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো—'আমার দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি আমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে একথা বলেছো ?' সে উত্তর দিলো—'না।' তিনি বললেন—'যাও, গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর এবং আল্লাহ্‌র গোপনীয়তার পর্দা দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নাও। অবশ্যই আল্লাহ্ তাওবা কবুল করেন।' কিন্তু তার মনে প্রশান্তি এলো না। সে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে সেসব বললো যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বলেছিলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত জবাব দিলেন। এ জবাবেও সে সান্ত্বনা পেল না। অবশেষে সে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো ---------- ।'[৪]

৩. অপরাধী গোলাম হলে তার শাস্তি অর্ধেক

যদি স্বাধীন কোনো লোক অপরাধ করে তবে তাকে শরীয়াহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পুরো শাস্তি প্রদান করতে হবে। কিন্তু কোনো গোলাম বাঁদীর দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে তাকে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক প্রদান করতে হবে। যদি শাস্তি অর্ধেক প্রদান করা সম্ভব হয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন ঃ

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

"দাসীর শাস্তি তার অর্ধেক যা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার জন্য নির্দিষ্ট।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

সুনানু বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে—'কোনো দাস যদি কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শাস্তি স্বরূপ তাকে চল্লিশ ঘা চাবুক মারতেন।[৫] কানযুল উম্মালেও বলা হয়েছে—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাসকে হদ স্বরূপ ৪০ ঘা চাবুক মারতেন।'[৬]

৪. প্রমাণ সাপেক্ষে শাস্তি প্রদান

নিম্নোক্ত ভাবে অপরাধসমূহ প্রমাণিত হয়।

[৪.১] অপরাধীর স্বীকারোক্তি ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন চোরের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার হাত কেটে দিয়েছিলেন।[৭] এমনিভাবে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ব্যভিচারের শাস্তিও তিনি প্রদান করতেন।[৮] বিচারক কিংবা আদালতের জন্য এটি জায়েয নেই যে, অপরাধীর কাছ থেকে জোরপূর্বক অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন কিংবা তার অপরাধের জন্য তাকে বাহ্‌বা দেবেন। বরং যে পর্যন্ত হয়েছে সেখানেই সমাপ্তি টানার চেষ্টা করবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চোরকে জিজ্ঞেস করতেন—'তুমি কি চুরি করেছো ? বলে দাও —'না আমি চুরি করিনি।'[৯]

তদ্রূপ যদি কেউ বুঝতে পারে যে, অপরাধী সহজেই তার অপরাধ স্বীকার করে নেবে, তার উচিত তাকে দ্রুত স্বীকার করা থেকে বিরত রাখা। কেননা আমরা এর আগে দেখেছি, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মায়েযকে বলেছেন তাওবা করো এবং আল্লাহ্‌র গোপনীয়তার পর্দা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখো, অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন।

-[আরো দেখুন,-'ইকরার' শিরোনাম]

[৪.২] সাক্ষ্য ঃ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য অপরিহার্য। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج

"আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিনী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব কর।-(সূরা আন নিসা ঃ ১৫)

হদূদের ব্যাপারে মহিলাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। চাই শুধু মহিলাগণ প্রদান করুক কিংবা মহিলাদের সাথে পুরুষও থাকুক। ইমাম যুহুরী (রহ) বলেছেন—রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পর দু' খলীফা অর্থাৎ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হদ কায়েমের ব্যাপারে মহিলাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না।[১০]

[৪.৩] বিচারক বা আদালতের জানা তথ্য ঃ বিচারক কিংবা আদালতের নিজস্ব জানা তথ্যের ভিত্তিতে শরীআহ্ নির্ধারিত শাস্তি (হদ) প্রদান করা যাবে না। যতোক্ষণ আদালত অথবা বিচারকের নিকট সাক্ষ্য কিংবা অপরাধীর স্বীকারোক্তি প্রমাণিত না হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'যদি আমার নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি (হদ)-এর ব্যাপারে অপরাধীর অপরাধ পরিষ্কার হয়ে যায় তবু আমি তার ওপর হদ জারী করবো না অথবা হদ জারীর জন্য কাউকে ডাকবো না, যতোক্ষণ আমার সাথে অন্য কেউ না থাকবে।'[১১]

৫. হদ জারীর পর অপরাধীর মৃত্যু হলে তার কোনো প্রতিকার নেই

কোনো ব্যক্তির ওপর শরীয়াহ্ নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের পর তার মৃত্যু হলে এ জন্য কোনো জরিমানা বা দিয়াত প্রদান করতে হবে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'হদ প্রদানের পর যার মৃত্যু ঘটে গেল তার কোনো দিয়াত নেই।'[১২]

৬. শাস্তি প্রদানের পর অপরাধীকে লা'নত করা

অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের পর তার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ হয়ে যায়। এ জন্য তার ওপর লা'নত করা জায়েয নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করেন। এক ব্যক্তি তার ওপর অভিসম্পাত করলে তিনি বলে ওঠলেন—'তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[১৩] সম্ভবত তিনি এ সূত্রটি মায়েয এর ঘটনা থেকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রিওয়ায়েত করেছেন—যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েযকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করেন তখন লোকজন তাকে অভিসম্পাত করা শুরু করে দেয়। তখন তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। অতপর লোকেরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে তখনো তিনি তাদেরকে বারণ করেন এবং বলেন—'এ ব্যক্তি একটি গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হয়েছে, এখন আল্লাহ্ তার হিসেব নেবেন।'[১৪]

৭. শাস্তি স্বরূপ বিকলাঙ্গ করে দেয়া

শাস্তি স্বরূপ মানুষের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি এ ধরনের কাজের মাধ্যমে অপরাধীর হদ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে জায়েয।-[দেখুন, 'মুছলাহ্' শিরোনাম]

৮. মুরতাদের শাস্তি (হদ)।-[দেখুন, 'মুরতাদ' এবং 'রিদ্দাহ্' শিরোনাম]

—যিনার শাস্তি (হদ)।-[দেখুন, 'যিনা' শিরোনাম]

—কযফের শাস্তি (হদ)।-['কাযফ' শিরোনাম দেখুন]

—মাদক দ্রব্য সেবনের শাস্তি।-[দেখুন,'খামর' শিরোনাম]

—চুরির শাস্তি (হদ)।-[দেখুন, 'সারিকাহ্' শিরোনাম]

হুযূন [حزن]—চিন্তা, শোক

০ শোক বিহ্বল দিনে নফল রোযা ছেড়ে দেয়া।-[দেখুন, 'সিয়াম' শিরোনাম]

০ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।-[দেখুন, 'মাওত' শিরোনাম]

হলফ [حلف]—শপথ, অঙ্গীকার

০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইয়ামীন, শিরোনাম।

০ নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে এই মর্মে শপথ করানো যে, তার হাতে টাকা আসামাত্র সে ঋণ পরিশোধ করে দেবে।-[দেখুন, 'দাইন' শিরোনাম]

হাইওয়ান [حيوان]—জন্তু, হিংস্র পশু

১. কোনো জন্তুকে হাটতে বাধ্য করার জন্য তাকে মারা বৈধ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উটকে দ্রুত হাটানোর জন্য বাকা মাথা বিশিষ্ট লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন।[১৫]

২. যুদ্ধের সময় কোনো জন্তুর পেট ফেঁড়ে ফেলা নিষেধ।-['জিহাদ' শিরোনাম দেখুন]

০ কোনো পশুর ক্ষতি করার অপরাধ।-['জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন]

০ কোনো পশুকে আগুনে জ্বালানো নিষেধ।-['সারিকাহ্' শিরোনাম দেখুন]

হাজ্জ [حج]—হাজ্জ

১. সংজ্ঞা

নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদনের নাম হাজ্জ।

২. হাজ্জের গুরুত্ব

সামর্থবান ব্যক্তির ওপর হাজ্জ ফরয। আল্লাহ্ জাল্লা শানহু ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

"লোকদের মধ্যে যাদের বাইতুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ আছে তাদের জন্য হাজ্জ করা ফরয।"-[সূরা আল বাকারা ঃ

ছোট ছেলেমেয়ের ওপর হাজ্জ ফরয নয়, তবে তাদেরকে হাজ্জের জন্য নিয়ে গেলে হাজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানই সম্পাদন করানো উচিত। যেমন—বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করানো, সাফা-মারওয়া সাঈ করানো, আরাফাতে অবস্থান করানো প্রভৃতি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাওয়াফ করিয়েছিলেন, তখন তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে হতো।

৩. উত্তম হাজ্জ কোন্‌টি ?

হাজ্জ মোট তিনটি পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়।

[৩.১] **ইফরাদ ঃ** হাজ্জ সম্পাদনকারী শুধু হাজ্জ আদায়ের নিয়তে ইহ্‌রাম বেধে তালবিয়া পাঠ করবে।

যতদূর জানা যায়, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইফরাদ হাজ্জকে সর্বোত্তম মনে করতেন। এজন্য তিনি যতোবার হাজ্জ করেছেন, ইফরাদ হাজ্জ করেছেন। ইমাম নখঈ (রহ) বলেন—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলেই ইফরাদ হাজ্জ আদায় করেছেন।[১৬]

[৩.২] **কিরান ঃ** হাজ্জে কিরান হচ্ছে—হাজ্জ এবং ওমরার নিয়তে একই সাথে ইহ্‌রাম বেধে হাজ্জ এবং ওমরা আদায় করা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিরান হাজ্জ আদায় করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

[৩.৩] **তামাত্তু ঃ** তামাত্তু সেই হাজ্জকে বলে, হাজ্জ সম্পাদনকারী হাজ্জের মাসে প্রথমে ওমরা করার নিয়তে ইহ্‌রাম বেধে ওমরা পালন করেন। তারপর ইহ্‌রাম খুলে মুকীম হিসেবে সেখানে অবস্থান করেন এবং হাজ্জের তারিখ সমাগত হলে পুনরায় ইহ্‌রাম বেধে হাজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন। ইবনু আবী শাইবা (রহ) আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন–হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তামাত্তু হাজ্জ করেছেন।[১৭]

৪. ইহ্‌রামের জন্য গোসল করা

যে ইহ্‌রাম বাধার ইচ্ছে করবে সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, গোসল করা তার জন্য সুন্নাত। যদি কোনো মহিলা হায়েয অথবা নিফাস অবস্থায় থাকে, সেও গোসল করবে। মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে—আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস যুল হুলাইফা নামক

স্থানে মুহাম্মদ ইবনু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রসব করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নির্দেশ দিলেন—'যাও প্রথমে গোসল কর তারপর তালবিয়া পাঠ কর।'[১৮]

৫. তালবিয়া

হাজ্জের নিয়তে ইহ্‌রাম বাধার পর থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করতে হবে এবং জুমরায়ে আতবা*-এর ওপর কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে হবে।[১৯]

৬. ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় কি কি কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে

[৬.১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম বাধা ব্যক্তির পোশাক সম্পর্কে বলেছেন—'জামা, পাগড়ী, পাজামা, লম্বা টুপি, মোজা পরতে পারবে না। তবে কারো কাছে যদি জুতা না থাকেও সে পায়ের গিটের নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে জুতার বিকল্প হিসেবে পরবে। এমন কাপড় সে পরবে না যা হলুদ রঙের কিংবা ওরস** রঞ্জিত।'[২০]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাইকৃত কিংবা রঙিন কাপড় পরা নিষিদ্ধ। সেই সাথে মোজা পরা এবং মাথা ঢেকে রাখাও নিষেধ করা হয়েছে। উপরন্তু সুগন্ধি ব্যবহার করাও [শরীরে কিংবা কাপড়ে] নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি এমন এক মাসয়ালা যে ব্যাপারে সবাই একমত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীও এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি।[২১]

[৬.২] মুহরিম ব্যক্তির শরীরের কোনো কিছুকে শরীর থেকে পৃথক করা হারাম। যেমন—চুল কাটা কিংবা নখ কাটা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ۚ

"তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো না যতোক্ষণ কুরবানীর পশু তার জায়গায় পৌঁছে না যায়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

'চুল কাটা যাবে না' একথার ওপর অন্যান্যগুলো [যেমন নখ কাটার ব্যাপারটি] কিয়াস করা হয়েছে। এ মাসায়ালার ব্যাপারেও সবাই একমত। কেউ ইখতিলাফ করেননি।

[৬.৩] মুহরিম ব্যক্তির স্ত্রী সহবাস করা হারাম। এমনকি যৌন উদ্দীপক কথাবার্তা ও কাজকর্মও হারাম। যেমন—চুমো দেয়া কিংবা যৌন উত্তেজনায় স্ত্রীর গায়ে হাত লাগানো ইত্যাদি। আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۔

"হাজ্জের সময় স্ত্রী সহবাসের অনুমতি নেই, কোনো অনাচার বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

[৬.৪] মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোনো অনাচার ও লড়াই ঝগড়া করা হারাম। ওপরের আয়াতটি তার প্রমাণ।

---

* সামান্য দূরে দূরে মিনায় ৩টি শয়তানের প্রতীক তৈরী করা হয়েছে। সেগুলোকে একত্রে জুমরাহ বলে। সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হাজ্জের অন্যতম শর্ত। তার মধ্যে প্রথম শয়তানের প্রতীককে জুমরায়ে আতবা বলে।

** ওরস্ এক ধরনের তৃণ যা দিয়ে কাপড় রাঙানো হতো।

[৬.৫] ইহ্‌রাম পরিহিত [মুহরিম] ব্যক্তির শিকার করাও হারাম। শিকার অর্থ এমন পশু হত্যা করা যা গৃহপালিত নয় বটে কিন্তু তার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। যদি মুহরিম ব্যক্তি শিকার করে তবে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার করবে তার ওপর বিনিময় ওয়াজিব হবে। এই বিনিময় শিকারকৃত পশুর সমান হবে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফায়সালা করবে। বিনিময়ের পশুটি উৎসর্গ হিসেবে কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অথবা তার ওপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব—কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে যাতে সে তার কৃতকর্মের ফল আস্বাদন করে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৫)

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললো—'আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের জন্য একটি পশু হত্যা করে ফেলেছি। আপনার দৃষ্টিতে এর জন্য কী প্রতিকার আমার করতে হবে ? উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসা ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে লক্ষ্য করে বললেন—'তুমি কী মনে কর ?' আগন্তুক বললো—'হুজুর ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূলের খলিফা ! আমি আপনার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করছি, আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন অন্যের কাছে !! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—"কেন, কি হয়েছে ? আল্লাহ্ বলেছেন—'এ ব্যাপারে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ফায়সালা করবে।' তাই আমি তাঁর সাথে পরামর্শ করছি, দু'জন একমত হয়ে তোমাকে জানিয়ে দেবো।"[২২]

৭. তাওয়াফে কুদুম

হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যখন মক্কায় পৌঁছেন তখন প্রথমেই তাকে যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে—সাতবার বাইতুল্লাহ্‌কে প্রদক্ষিণ [তাওয়াফ] করা। প্রথম তিন চক্করে রমল* এবং চাদর ডান বগল থেকে বের করে বাম কাধের ওপর রাখা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ করতেন।[২৩]

৮. মিনা, ইয়াওমুত্ তারভিয়াহ্

আরাফায় (৯ জিলহাজ্জ) উপস্থিতির আগের দিনকে ইয়াওমুত তারভিয়াহ্ বলে। এদিন হাজীগণ ফযর নামায মক্কায় আদায় করে সূর্যোদয়ের পর মিনা অভিমুখে রওয়ানা দেন। পরদিন [অর্থাৎ আরাফার দিন] সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন। এবং নামায কসর পড়বেন। অর্থাৎ চার রাকায়াত ফরযের স্থলে দু' রাকয়াত পড়বেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হাজ্জ করেছেন তখন মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত নামায কসর পড়েছেন।[২৪]

---

* এমন এক ধরনের চলাকে রমল বলে যাতে বীরত্বের প্রকাশ ঘটে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে (কসর স্বরূপ) দু' রাকায়াত করে নামায পড়েছি। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর খিলাফাতের প্রথম দিকে দু' রাকায়াত পড়তেন। পরে আর তিনি কসর পড়তেন না, পুরো নামায আদায় করেছেন।[২৫]

৯. আরাফাত

আরাফাতের দিন সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হবেন। সেখানে পৌঁছে তারা যোহর ও আসর নামায একত্রে আদায় করবেন এবং সারাক্ষণ দুআ ও ইস্তিগফারে কাটিয়ে দেবেন। এ জন্য তারা সেদিন রোযা রাখবেন না। যেন সারাদিন দুআ ও যিকিরে কাটিয়ে দেয়ার শক্তি অর্জন করতে পারেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজ্জে আরাফাতের দিন রোযা রাখেননি।[২৬] হাজীগণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবেন। সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে রওয়ানা করে মুযদালিফায় পৌঁছুবেন।

১০. মুযদালিফা

হাজীগণ সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে রওয়ানা করে মুযদালিফায় পৌঁছুবেন এবং সেখানে সারা রাত অবস্থান করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুযদালিফায় সকাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন। তারপর সেখান থেকে মিনা অভিমুখে যাত্রা করতেন। যুবাইর ইবনু হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—'আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাজাহ্ নামক পাহাড়ে [যা মুযদালিফায় অবস্থিত] দাঁড়িয়ে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি, "লোকজন ! তোমরা সাবধান হয়ে যাও।" তারপর তিনি সেখান থেকে নেমে পড়লেন। আমি তাঁর হাটু দেখতে পাচ্ছিলাম—উটের লাগাম টেনে চাবুক মারার সময় তাঁর হাটুর কাপড় সরে গিয়েছিলো।'[২৭]

১১. শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ

হাজীগণ মিনায় পৌঁছেই জুমরায়ে আতবায় পাথর নিক্ষেপ করার জন্য যান। শয়তানের আস্তানা [জুমরাতু আতবা] পর্যন্ত তারা পায়ে হেটে যাবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাথর নিক্ষেপের জন্য পায়ে হেটে যেতেন।[২৮]

১২. ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়ার প্রথম স্থান

যখন হাজীগণ 'জুমরাতুল আকাবা'য় পাথর নিক্ষেপ শেষ করবেন তখন ইহ্‌রাম খুলে ফেলার প্রথম ধাপ অতিক্রম করবেন। তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব জিনিস তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছিলো তা পুনরায় হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু আতর লাগানো এবং স্ত্রী সহবাস তখনো নিষিদ্ধ থাকবে। মাথা নেড়ে করে কিংবা চুল ছোট করে হাজ্জে কিরান অথবা হাজ্জে তামাত্তুর অবস্থায় কুরবানীর পশু যবেহ্ করবেন। গরু অথবা উট একত্রে সাতজন মিলে কুরবানী করতে পারবেন।

১৩. অতপর হাজীগণ তাওয়াফে ইফাদার* জন্য মক্কা মুকার্‌রমায় ফিরে যাবেন। মক্কা যাওয়ার পথে 'আবতাহ্' নামক স্থানে থেমে দু' রাকায়াত নামায আদায় করবেন। আবদুল্লাহ্

* তাওয়াফে ইফাদা হাজ্জের একটি অন্যতম রুকন।

ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন—'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আবতাহ্' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন।'[২৯] তারপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাদা করবেন। তাওয়াফ শেষ হওয়া মাত্র আতর ব্যবহার এবং স্ত্রী সহবাস হালাল হয়ে যাবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'হাজীদের ইহ্‌রাম ইয়াওমুন নাহর [১০ তারিখ]-এর পূর্বে খুলে ফেলা যাবে না।'[৩০]

হাজীগণ আবার মিনায় চলে আসবেন এবং রাত কাটাবেন। আর আগের দু' দিনের মতো জুমরায় পাথর নিক্ষেপ করবেন।

হাজ্‌ব [حجب]—বাধা সৃষ্টি করা

মীরাস থেকে বঞ্চিত করা কিংবা বাধার সৃষ্টি করাকে হাজ্‌ব বলে।-['ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন]

হাজর [حجر]—বিরত রাখা

১. সংজ্ঞা

কোনো শরঈ কারণে মানুষের মৌখিক লেনদেনের ব্যাপারটি কার্যকর করতে বাধা সৃষ্টি করার নাম 'হাজর'।

২. হাজরের কারণসমূহ

হাজরের একটি কারণ অসুস্থতা। অসুস্থ অবস্থায় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করা নিষেধ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'গাবা' অঞ্চলে অবস্থিত খেজুর বাগান থেকে তাঁর কন্যা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিশ ওয়াসক খেজুর দান করেছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলো তখন তাঁকে ডেকে এনে বললেন—'বেটি! আল্লাহ্‌র কসম, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেউ নেই। আর তোমার শোকে দুঃখে আমার চেয়ে ব্যথিতও আর কেউ নেই। আমি বিশ ওয়াসক* খেজুর তোমাকে দেয়ার জন্য চেয়েছিলাম। যদি সে খেজুর তুমি সংগ্রহ করে থাকো এবং স্তুপ করে রেখে থাকো সেগুলো তোমার। অন্যথায় আজ সেগুলো ওয়ারিসদের সম্পদ। সেই ওয়ারিস তোমার ভাই এবং দু' বোন। তোমরা মিলেমিশে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ভাগ করে নিও।'[৩১]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এজন্য একথা বলেছিলেন যে, তিনি মনে করতেন আয়ত্বে না নেয়া পর্যন্ত হিবা [দান] কার্যকর হয় না। যদি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা দানকৃত খেজুর নিজের সংগ্রহে নিয়ে নিতেন তবে তিনি তার মালিক হতেন। যেহেতু তিনি সেই খেজুর নিজ সংগ্রহে নিতে পারেননি, তাই পিতার অসুস্থতার পর আর তা নেয়ার কোনো রাস্তা অবশিষ্ট ছিলো না। কারণ, অসুস্থ ব্যক্তি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী দান করতে পারেন না। তাও আবার এমন ব্যক্তিকে করতে হবে যে ওয়ারিস নয়। কেননা দানের ছদ্মাবরণে তা কারো ওপর ইহ্‌সান করার নিমিত্তে ওসিয়ত। আর ওসিয়ত সর্বসাকুল্যে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ করা যেতে পারে। এজন্য তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন—"যদি তুমি সেই খেজুর সংগ্রহ করে স্তুপ করে থাক, সেগুলো তোমার। আর যদি স্তুপ করে না থাকো তবে আজ সেগুলো

* এক ওয়াসক = ৬০ সা' এবং ১ সা' = ৩.৫০ সের।

ওয়ারিসদের সম্পদ। কাজেই আমি তোমাকে সেগুলো দেয়ার ক্ষমতা রাখি না। তাই সেগুলো আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বণ্টন করে নিও।-[আরো দেখুন, 'হিবা' শিরোনাম]

হাজামাহ্ [حجامة]—শিঙ্গা লাগানো

ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পূঁজ চুষে বের করার নাম 'হাজামাহ্'। আগে শিঙ্গা লাগিয়ে চুষে রক্ত বা পূঁজ বের করা হতো।

এ ধরনের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা অপছন্দনীয়।-[দেখুন, 'কাযা' শিরোনাম]

হাদয়ুন [هدى]—কুরবানীর পশু

ঐ পশু যা হাজীগণ ইয়াওমুন নহর বা ১০ই জিলহাজ্জের দিন কুরবানী করে থাকেন তাকে 'হাদয়ুন' বলে।

তামাত্তু এবং কিরান হাজ্জ আদায়কারী জুমরায়ে আকবায় কংকর নিক্ষেপের পর নিজের কুরবানীর পশু যবাহ্ করা।-[দেখুন, 'হাজ্জ' শিরোনাম]

হাদীস [حديث]—হাদীস

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমার পিতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস একত্রিত করছিলেন। সংখ্যায় তা পাঁচ শ'র মত ছিলো। এক রাত তিনি বড়ো উদ্বেগের সাথে কাটালেন। দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম —'আপনাকে অস্থির দেখাচ্ছে, কোনো অসুবিধা হয়েছে কি? না, কারো কথায় আঘাত পেয়েছেন?' তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। যখন সকাল হলো, বললেন—'বেটি! যে হাদীসগুলো তোমার নিকট আছে তা নিয়ে এসো তো!' আমি নিয়ে এলাম। তিনি আগুন চাইলেন। তারপর সমস্ত হাদীস জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন—'আমার ভয় ছিলো তোমার নিকট হাদীসগুলো থাকাবস্থায় যেন আমার মৃত্যু না হয়ে যায়। সেখানে এমন হাদীসও ছিলো যা আমি এমন ব্যক্তির নিকট শুনেছি যাকে আমি বিশ্বস্ত মনে করি এবং আমি তা বিশ্বাসও করি। কিন্তু আমার ভয় ছিলো সে হাদীসগুলো যদি তেমনভাবে বর্ণিত না হয়ে থাকে যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন আর সেগুলো যদি আমার গলার ফাঁস হয়ে যায়।[৩২]

হামল [حمل]—গর্ভ

'হামল' এবং 'হাবল' সমার্থবোধক শব্দ। উভয় শব্দের অর্থ-গর্ভ। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .

সন্তান গর্ভে ধারণ এবং তার দুধ পান করানোর সময় সর্বসাকুল্যে আড়াই বছর।

হামীল [حميل]—সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করা

০ 'হামীল' বলা হয় ঐ বাচ্চাকে, কোনো মহিলা যাকে নিজের কাছে নিয়ে দাবী করে এটি আমার বাচ্চা। অথচ তার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

০ হামীলের মিরাস।-[দেখুন, 'ইর্‌ছ' শিরোনাম]

হায়েয [حيض]—ঋতুস্রাব

১. হায়েয ঐ রক্তকে বলে যা প্রাপ্তবয়স্কা একজন মেয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে বেরোয়। অথচ তার কোনো অসুখ নেই, সে গর্ভবতী নয় এমন কি বার্ধক্যেও* সে পৌঁছেনি।

২. প্রত্যেক মহিলার জন্য তার হায়েযের সময় নির্দিষ্ট এবং প্রতিমাসেই তার হায়েয আসে। যদি অসুখের কারণে ইস্তিহাযা** হয়, কিংবা স্রাব বন্ধ না হয় অথবা হায়েযের দিন সম্পর্কে ভুলে গিয়ে থাকে, এসব অবস্থায় হায়েযের দিনগুলোকে চান্দ্রমাসের হিসেবে গণনা করতে হবে। সে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট ক'টি দিনকে হায়েযের সময় ধরে নেবে। হায়েযের দিন নির্দিষ্ট করতে হলে সুস্থ অবস্থায় যে ক'দিন হায়েযের স্রাব হতো সেই ক'দিনকে নির্দিষ্ট করতে হবে। যখন নির্দিষ্ট দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন গোসল করে নামায রোযা করা শুরু করে দেবে।[৩৩]

৩. হায়েয অবস্থায় মহিলাগণ যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবে

হায়েয অবস্থায় মহিলাগণ নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, মসজিদে অবস্থান করা এবং স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। হায়েয অবস্থায় যৌন সম্পর্কস্থাপন করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য হারাম। এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললো—'আমি স্বপ্নে রক্তবর্ণ প্রস্রাব করতে দেখেছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'মনে হয় তুমি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস কর।' সে জবাব দিলো—হাঁ।' তিনি বললেন—'আল্লাহকে ভয় কর, ভবিষ্যতে এরূপ করো না।'[৩৪]

হিজাব [حجاب]—পর্দা

হিজাব এখানে পর্দা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বজনবিদিত কথা হচ্ছে—উম্মুল মু'মিনীন পুরুষদের থেকে পর্দা করতেন কিন্তু অমুসলিম মহিলা থেকে পর্দা করতেন না। এ জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট যাতায়াতকারী অমুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে দোষের কিছু মনে করতেন না। ইমাম বাইহাকী রিওয়ায়েত করেছেন—একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ইহুদী মহিলা বসা ছিলো। যাকে তিনি ঝাড়ফুঁক করছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আল্লাহ্ আয্‌যা ও জাল্লার কিতাবের কথা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করো।'[৩৫]

হিদানাহ্ [حضانه]—সন্তান প্রতিপালন

১.সংজ্ঞা

সন্তানের লালন পালনকে 'হিদানা' বলে।

২. সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে বেশী হক কার ?

যদি পিতামাতার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে তাহলে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব উভয়ের। যদি মা তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে সন্তান লালন-পালনের অধিকার মায়ের। পিতার কোনো অধিকার নেই। যতোদিন তালাকপ্রাপ্তা অন্যত্র বিয়ে না করে। কারণ, সন্তান যখন ছোট থাকে তখন সে তার মায়ের স্নেহ, আদর ও যত্নের মুখাপেক্ষী থাকে। এ ব্যাপারে পিতার চেয়ে

* একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছার পর মহিলাদের হায়েয বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতাও আর থাকে না।

** কোনো অসুখের কারণে যে মহিলার হায়েযের সময়ের চেয়েও বেশী স্রাব হয় তাকে মুস্তাহাযা বা প্রদরের রোগিনী বলা হয়।

মা-ই বেশী সক্ষম, তাকে স্নেহের পরশ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালনের। এ জন্য সন্তান পালনের ব্যাপারে পিতার চেয়ে মায়ের অধিকার বেশী। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'মা সবচেয়ে বেশী দয়ার্দ্রচিত্ত, বেশী কোমল আচরণের অধিকারী, বেশী স্নেহশীল, বেশী মমতাময়ী, এ জন্য সে সন্তান প্রতিপালনের অধিক হকদার। যতোদিন সে অন্যত্র বিয়ে না বসবে।'[৩৬]

যদি মা বিয়ে করে ফেলে তবে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব তার কাছ থেকে তার মায়ের (অর্থাৎ সন্তানের নানীর) কাছে চলে যাবে। পিতার নিকট যাবে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ রকম ফায়সালা দিয়েছেন। ইমাম মালিক (রহ) মুয়াত্তায় এবং ইমাম বাইহাকী (রহ) সুনানু বাইহাকীতে বর্ণনা করেছেন—ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তার গর্ভে আসিম ইবনু ওমর জন্মগ্রহণ করেন। পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তালাক দিয়ে দেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে কু'বার দিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন তার ছেলে মসজিদের চত্বরে খেলাধুলা করছে। তিনি তাকে ঝাপটে ধরে ঘোড়ার পিঠে নিজের সামনে বসালেন। এমন সময় বাচ্চার নানী সেখানে পৌঁছে ঝগড়া শুরু করে দিলো। উভয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বিচার দিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'এ আমার ছেলে।' নানী বললো—এ আমাদের ছেলে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন—'তাকে নানীর সাথে যেতে দিন।' ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিরবে তার নির্দেশ পালন করলেন। একটি কথাও আর বললেন না।[৩৭]

সুনানু বাইহাকীতে আছে–হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপরীতে এবং আসিমের নানীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। যতোদিন সে বালিগ না হয় ততোদিন প্রতিপালনের জন্য। কারণ আসিমের মা অন্যত্র বিয়ে বসেছিলো।[৩৮]

মা অথবা নানী সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিপালনের অধিকার রাখে। যখন সে বড়ো হয়ে যাবে তখন তাকে অবকাশ দেয়া হবে, সে মায়ের সাথে থাকবে নাকি পিতার সাথে থাকবে। যদি মায়ের কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সে মায়ের কাছে চলে যাবে। আর যদি পিতার কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তবে সে পিতার সাথে চলে যাবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমরের বিপক্ষে রায় দিয়ে বললেন—'আসিম এর মা তার প্রতিপালনের অধিক হকদার। যতোদিন সে অন্যত্র বিয়ে না করবে। যখন সে বড়ো হয়ে যাবে তখন নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, পিতা নাকি মায়ের কাছে থাকবে।'[৩৯]

৩. সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহ

সন্তান প্রতিপালনের যাবতীয় ব্যয় সন্তানের পিতা বহন করবে। চাই সে সন্তান মায়ের কাছে থাক অথবা নানী কিংবা পিতার কাছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসিম এর ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—সে যতোদিন বালেগ না হবে ততোদিন তার ব্যয় নির্বাহ আপনাকেই করতে হবে।'[৪০]

হিবাহ্ [هبة]—হিবা, দান করা

১. সংজ্ঞা

কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া সারা জীবনের জন্য কাউকে কোনো বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়ার নাম হিবা।

২. অপরিচিত ব্যক্তির হিবা

ইবনু হাজাম এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করে বলেন—তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তির হিবাকে বাতিল করে দিতেন।[৪১]

৩. হিবা করার ব্যাপারে সন্তানের মধ্যে সমতা বিধান না করা

সম্ভবত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ অভিমত ছিলো যে, যদি সন্তানদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির অবকাশ না থাকে তবে হিবার ব্যাপারে একজনের ওপর আরেকজনকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। এজন্যই তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিশ ওয়াসক* খেজুর হিবা করে দিয়েছিলেন।[৪২] মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এক হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গাবা অঞ্চলের খেজুর বাগান থেকে ২০ ওয়াসাক খেজুর হিবা করে দিয়েছিলেন। যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের সময় নিকটতর হলো তখন তিনি হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ডেকে বললেন—'বেটি ! আমার কাছে তোমার স্বচ্ছলতার চেয়ে আর কোনো প্রিয় বস্তু নেই। আবার তোমার অস্বচ্ছলতার চেয়ে কোনো দুঃখজনক বস্তুও আমার নিকট আর নেই। আমি তোমাকে ২০ ওয়াসক খেজুর হিবা করে দিয়েছিলাম। যদি তুমি এ খেজুর সংগ্রহ করে স্তুপ করে থাকো, সেগুলো তোমার। আর যদি এরূপ না করে থাকো তবে আজ সেগুলো ওয়ারিসদের সম্পদ। আমার ওয়ারিস তোমার দু' ভাই এবং দু' বোন। সবাই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বণ্টন করে নেবে।" হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন—"আব্বাজান ! আল্লাহ্‌র কসম, আপনার হিবাকৃত সম্পদ যদি এর চেয়ে বেশীও হতো তবু আমি তা ছেড়ে দিতাম। আব্বাজান ! আমার এক বোন তো আসমা কিন্তু অন্য বোন কে ? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন–"আমার স্ত্রী বিনতে খারিজা গর্ভবতী। আমি মনে করি সে কন্যা সন্তান প্রসব করবে।"[৪৩]

৪. হস্তগত করার মাধ্যমে হিবা সম্পন্ন হয়

হিবাকৃত বস্তু যতোক্ষণ হস্তগত করা না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত হেবা প্রত্যাহার করা জায়েয। কারণ, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে অধিগ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত হিবা বলবৎ হয় না।[৪৪] মুআম্মার থেকে বর্ণিত—"আমি যুহুরীর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে তার পিতার সাথে একত্রে কাজকর্ম করেছে এবং পিতা তাকে বলে দিয়েছে, আমাদের দু'জনের সম্মিলিত সম্পদ থেকে ১০০ দীনার তোমার। এ রকম হিবা কি বৈধ ?" ইমাম যুহুরী উত্তর দিলেন—"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন, এ হিবা ততোক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যতোক্ষণ উভয়ের সম্পদ পৃথক করে না নেয়।"[৪৫] আমরা হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হিবাকৃত খেজুর সম্পর্কে ওপরে আলোচনা করেছি। সেখানে দেখেছি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ২০ ওয়াসাক খেজুর সম্পর্কে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি খেজুর সংগ্রহ করে জমা করে নিয়েছেন কিনা। না হয় তা ওয়ারিসদের সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য ছিলো, যদি তিনি গ্রহণ করে থাকেন তবে সে খেজুর তাঁর। আর যদি গ্রহণ না করে থাকেন, তবে সে সম্পদের মালিক হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই। এবং সেই কারণে সেগুলো ওয়ারিসদের হক।

* এক ওয়াসাক = ৬০ সা', আর এক সা' = তিন সের।

৫. অসুস্থ ব্যক্তির হিবা

অসুস্থতার কারণে যদি মৃত্যুর আশংকা হয় (অর্থাৎ মারজুল মাওত) তবে অসুস্থ ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হিবা করার ওসিয়ত করে যেতে পারেন। এক-তৃতীয়াংশের বেশী হিবা করা জায়েয নেই। কারণ, প্রত্যেক হিবা ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত। ২০ ওয়াসাক খেজুরের ব্যাপারে আমরা দেখেছি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কন্যা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন—যদি তুমি তা গ্রহণ করে না থাক তবে সেগুলো ওয়ারিসদের সম্পদ। যদি 'মারজুল মাওত'* এর সময় হিবা করা বৈধ হতো তবে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে হিবা করা হয়েছিলো তার পুনরাবৃত্তি করা হতো। আতা এবং ইবনু সীরীন উভয়ে বর্ণনা করেন—হযরত সা'দ ইবুন ওবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সমস্ত সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যু সময় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন যার খবর তিনি জানতেন না। স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নবজাতকের অংশের প্রশ্নে সংবাদ পাঠান। প্রতি উত্তরে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে তাঁর সম্পদ বণ্টন ও কার্যকরী করে গেছেন, আমি তো তার পরিবর্তন করতে পারি না। নবজাতককে আমার অংশ দিয়ে দেবো।[৪৬] এ ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বণ্টনকে পরিবর্তন করে নতুনভাবে সম্পদ বণ্টন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, উক্ত বণ্টন হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু মারজুল মাওতের সময় করেছিলেন।

হিমা [حمى]—সরকারী চারণ ভূমি

হিমা ঐ জায়গাকে বলা হয়—খলীফা মুসলমানদের কল্যাণার্থে যে জায়গার সংরক্ষণ করে থাকেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়ার চারণ ভূমি হিসেবে নকী' এলাকার একটি জায়গা সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি এ জায়গাটি ছাড়া আর কোনো জায়গা কোথাও সংরক্ষণ করেছিলেন কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে—'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নকী' এলাকার জমি ছাড়া আর কোনো জমি সংরক্ষণ করেননি।' তিনি বলতেন—'আমি এ জায়গাটুকু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংরক্ষণ করতে দেখেছি।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ জায়গাটিকে জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। যদি যাকাতের উট দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা করতেন তাহলে তিনি সেগুলো রাবজায় এবং তার আশপাশের এলাকায় চড়ানোর জন্য পাঠাতেন। তিনি উটের জন্য কোনো জায়গাকে সংরক্ষণ করেননি।[৪৭]

হিরয্ [حرز]—সংরক্ষিত জায়গা

ঐ বস্তু, যার মধ্যে জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয়। যেমন—সিন্ধুক, আলমারী প্রভৃতি।

চুরির শাস্তি স্বরূপ চোরের হাত কাটার জন্য চুরি যাওয়া মাল সংরক্ষিত স্থানে থাকা শর্ত।-[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'সারিকাহ্' শিরোনাম]

---

* যে অসুস্থতায় মানুষ মৃত্যুবরণ করে সেই অসুস্থাবস্থাকে মারজুল মাওত বলে।-অনুবাদক

হিয়াযাহ্ [حيازة]—করায়ত্ত করা

০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'কাবয' শিরোনাম।

০ দান, হিবা ইত্যাদির জন্য করায়ত্বে নেয়া শর্ত।

-[আরো দেখুন, 'হাজর' এবং 'হিবা' শিরোনাম]

তথ্যসূত্র

১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।
২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৩।
৩. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৩ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৯৯ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪৭।
৪. মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৮৩০ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৪।
৫. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫১।
৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬১।
৭. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৪০।
৮. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৫ ; ৮ম খণ্ড, পৃ-২২২ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০৪, ২১১ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৩ ; মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৮২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১১।
৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩ ; মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৮২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১১।
১০. কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪১ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১ ; সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৮।
১১. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২২।
১২. আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ-২২, আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, কানযুল উম্মাল, ৫ম ও ৭ম খণ্ড।
১৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৯।
১৪. সুনানু আবী দাউদ, হদূদ অধ্যায়।
১৫. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৯।
১৬. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮২ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৫৮।
১৭. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৪ ; সুনানু তিরমিযি, হাজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ সুনানু নাসাঈ, হাজ্জ অধ্যায়, তামাত্তু অনুচ্ছেদ।
১৮. মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৩৬।
১৯. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৩৬]
২০. সহীহ আল বুখারী ; সহীহ মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়।
২১. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১৭।
২২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৪।
২৩. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭, ২৭৩।
২৪. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৭।
২৫. মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২-৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৫৬।
২৬. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৯।

২৭. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৯৮ ; কানযুল উম্মার, ৫ম খণ্ড, পৃ-২১১।
২৮. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৪।
২৯. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৮ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৫৭।
৩০. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৭৯।
৩১. মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-১ ; আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৫৩ ; সুনানু বাইহাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭০, ২৫৮, আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০১ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯২।
৩২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৮৫।
৩৩. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-২২৪।
৩৪. মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৮ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড।
৩৫. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৪৯ ; আল মাজমু', ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৫ ; ২য় খণ্ড, পৃ-৯৪৩।
৩৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৭৬ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৫ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৪ ; ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৩ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, এবং ৯ম খণ্ড, পৃ-১৩৩।
৩৭. মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫।
৩৮. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫।
৩৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১মখণ্ড, পৃ–২৫৫ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩২৭ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ–১৫৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ–৫৭৬।
৪০. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৭৭।
৪১. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।
৪২. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪০৬, ৫৬৪।
৪৩. আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৫২ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-১০১ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭০, ২৫৮ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০১, আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯২ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬৫০।
৪৪. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯৪।
৪৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৫২ ; মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-১০৭ ; মুসান্নাফ—ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭৩ ; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩০।
৪৬. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৯৯ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৪২ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১১৬ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৩ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৮।
৪৭. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬১৭।

সমাপ্ত

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।